সম্রাট জাহাঙ্গীরের আত্মজীবনী

অনুবাদ

বোরহানউদ্দীন খান জাহাঙ্গীর

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

সম্রাট জাহাঙ্গীরের আত্মজীবনী

বোরহানউদ্দিন খান জাহাঙ্গীর
অনূদিত

অনন্যা
৩৮/২ বাংলাবাজার, ঢাকা-১১০০
anannyadhaka@gmail.com

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

প্রকাশক ❑ মনিরুল হক
অনন্যা
৩৮/২ বাংলাবাজার ঢাকা

প্রথম প্রকাশ ❑ ফেব্রুয়ারি ২০১৫

© ২০১৫ অনুবাদক

প্রচ্ছদ ❑ ধ্রুব এষ

কম্পোজ ❑ তন্বী কম্পিউটার
৩৮/৪ বাংলাবাজার, ঢাকা-১১০০

মুদ্রণ ❑ পাণিনি প্রিন্টার্স
১৪/১ তনুগঞ্জ লেন, সুত্রাপুর, ঢাকা

দাম ❑ ২০০.০০ টাকা

ISBN 978 984 91193 7 1

Memoirs of the Emperor Jahangueir
Translated by Borhanuddin Khan Jahangir
Published By : Monirul Hoque, Ananya, 38/2 Banglabazar, Dhaka-1100
First Published : February 2015, Cover Design : Dhrubo Esh
Price : 200.00 Taka Only

U.K Distributor ❑ **Sangeeta Limited**
22 Brick Lane, London

U.S.A. Distributor ❑ **Muktadhara**
37-69, 74 St. 2nd Floor, Jackson Heights, N.Y. 11372

Canada Distributor ❑ **Anyamela**
300 Danforth Ave., Toronto (1st floor) suite-202

Kolkata Distributor ❑ **Naya Udyog**
206, Bidhan Sarani, Kolkata-700006, India

ঘরে বসে **অনন্যা**'র বই কিনতে ভিজিট করুন
http://rokomari.com/ananya

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

প্রসঙ্গ কথা

সম্রাট জাহাঙ্গীরের আত্মকথা পাক-ভারত উপমহাদেশের ইতিহাসে এক অমূল্য সংযোজন। অপূর্ব সরল এবং অকুণ্ঠ মনোভাব নিয়ে সম্রাট তাঁর রাজ্যশাসন সংক্রান্ত ঘটনাবলী লিপিবদ্ধ করেছেন।

১৬০৫ খ্রীস্টাব্দের ১০ই অক্টোবর সেলিম সিংহাসনে আরোহণ করেই 'জাহাঙ্গীর' বা জগজ্জয়ী উপাধি ধারণ করেন। প্রবল পরাক্রান্ত তুর্কী সম্রাটদের সঙ্গে নিজেকে এক পর্যায়ভুক্ত করার বাসনা ছিল তাঁর। শুধু তাই নয়, আলেকজান্ডারের মত দিগ্‌বিজয়ী হবার আকাঙ্ক্ষাও তাঁর ছিল, কেননা যথেষ্ট বিনয় সহকারে হলেও তিনি ঘোষণা করেছিলেন–'সর্বশক্তিমানের অপার অনুগ্রহে যদি দীর্ঘজীবন পাই এবং ভাগ্য সুপ্রসন্ন হয়, তবে আমার নামের সার্থকতা আমি প্রমাণ করে যাব।'

তারিখ-ই-সেলিম-শাহী, তারিখ-ই-জাহাঙ্গীরনামা-সেলিমী, জাহাঙ্গীরনামা, তুজাক-ই-জাহাঙ্গিরী, দোয়াজদা-সালা-জাহাঙ্গিরী, ওয়াকিয়াত-ই-জাহাঙ্গিরী, ইকবালনামা ইত্যাদি বিভিন্ন নামে বহু বই জাহাঙ্গীরের আত্মজীবনী বলে চালানো হয়েছে। এগুলোর প্রামাণিকতা নিয়ে মতভেদ এবং বিতর্কের অবকাশ রয়েছে প্রচুর। এর কোনটাতেই পুরো রাজত্বকালের বিবরণ পাওয়া যায় না। যতদূর জানা যায় সম্রাট জাহাঙ্গীর নিজেই তাঁর আত্মজীবনী কিছুকাল পর্যন্ত লিখেছেন, পরে অন্য লোককে মৌখিক নির্দেশ দিয়ে সেটা শেষ করবার জন্য বলেছিলেন। রাজত্বকালের বারো বছরের বিবরণ সম্বলিত আত্মকথা 'দোয়াজদা-সালা-জাহাঙ্গিরী' নামে পুস্তকাকারে প্রকাশিত হবার পর সম্রাটের নির্দেশে বিতরিত হয়।

'দোয়াজদা-সালা-জাহাঙ্গিরী' বইখানি মূল ফার্সী পাণ্ডুলিপি থেকে ইংরেজীতে অনুবাদ করেন মেজর ডেভিড্ প্রাইস (মেম্বার, 'রয়্যাল এসিয়াটিক সোসাইটি', ওরিয়েন্টাল ট্রানশ্লেশন কমিটি)। 'ওরিয়েন্টাল ট্রানশ্লেশন কমিটি' কর্তৃক বইখানি লন্ডনে প্রথম প্রকাশিত হয় ১৮২৯ সালে। বর্তমান গ্রন্থখানি তারই অনুবাদ। কাজেই এটাকে সম্রাটের নিজের লেখা বলে মনে করবার যথেষ্ট কারণ রয়েছে।

এ ধরনের আত্মজীবনীর ঐতিহাসিক মূল্য পুনরুল্লেখের প্রয়োজন রাখে না। অন্তর্নিহিত স্বকীয় বৈশিষ্ট্যের গুণেই এর আবেদন সর্বকালের জন্য।

সৈয়দ আলী আহসান

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

তাঁকে–যাঁর নাম সমস্ত অস্তিত্বের উপর লেখা, যাঁর যশোগাথা বিশ্বের সব দেয়াল ও তোরণে উৎকীর্ণ, সেই চিরন্তন উদ্ভাবককে, যিনি একটি কথায় শূন্য থেকে আকাশপুঞ্জ ও পৃথিবীর সবকিছু সৃষ্টি করেছেন; সেই শক্তিমান স্থপতিকে, যিনি আমাদের উপর নক্ষত্রপুঞ্জ ছড়িয়ে দিয়েছেন এবং তার ক্ষমতার উজ্জ্বল দীপ্তি দিয়ে পৃথিবীকে সজ্জিত করেছেন : তাঁকে সব অনিঃশেষ প্রশংসা ও তাঁকে নিবেদিত অনন্ত কৃতজ্ঞতা; এবং আমাদের নবী মুহম্মদ (দ.)-এর উদ্দেশে হাযারও সালাম, যিনি সৃষ্টির সর্বোত্তম, যিনি মানুষকে ভ্রান্তির গোলকধাঁধা থেকে মুক্ত করে সত্য ও কর্তব্যের মহান পথে পরিচালিত করেছেন : যাঁকে আল্লাহ্ পার্থিব সব ব্যাপারে ক্ষমতাবান করেছেন এবং অন্যান্য নবীদের চেয়ে সম্মনিত করেছেন; স্বয়ং যীশু যাঁর শুভ আগমনবার্তা এনেছেন; যাঁর দীপ্তিতে ইসরাঈলের সেই মহান আইনপ্রণেতা, আল্লাহ-বিঘোষিত-নবী, স্বর্গীয় আলোকের ছটায় নিজেকে ধন্য করতে চেয়েছেন।

AMARBOI.COM

আমার জীবনের সহিত বহু ঘটনার মালা থেকে কালের বুকে স্বাক্ষর রাখার জন্য আমি ছোট একটি অংশের বর্ণনা করব বলে ঠিক করেছি। হিজরী ১০১৪ সালের জামাদিউসসানী মাসের দশ তারিখ বুধবার সকাল বেলায় আগ্রা নগরীতে আমি সম্রাটের পদে সমাসীন হলাম। শ্রদ্ধা ও প্রশংসা-মুখরিত পরিবেশের মধ্যে আটত্রিশ বৎসর বয়সে আমি আমার কাঙ্ক্ষিত সিংহাসনে উপবেশন করলাম। পৃথিবী যে মায়াময় তাই আমার মনে এল, এতে কারুর যেন হাসির উদ্রেক না করে। আমি কি সুলাইমানের চেয়ে ক্ষমতাবান, যিনি বায়ুতে তাঁর বালিশ রেখেছিলেন? যেইমাত্র আমি সিংহাসনে বসেছি, তক্ষণি দিগন্ত থেকে সূর্য উঠে এল। আমি তা বিজয়ের এবং স্থায়ী ও সমৃদ্ধিশালী রাজত্বের ইঙ্গিত হিসাবে গ্রহণ করলাম। তার দরুন আমি জাহাঙ্গীর বাদশাহ্ ও জাহাঙ্গীর শাহ্ উপাধি গ্রহণ করলাম। জাহাঙ্গীর বাদশাহের অর্থ পৃথিবী-পদানতকারী সম্রাট; আর জাহাঙ্গীর শাহের অর্থ পৃথিবী-পদানতকারী রাজা। 'শাহানশাহ্ আকবরের পুত্র, বিশ্বাসের প্রতীক জাহাঙ্গীর, বিশ্বের প্রতিরক্ষক খসরু কর্তৃক আগ্রায় তৈরী'–এই কথাগুলো সাম্রাজ্যের মুদ্রায় উৎকীর্ণ করবার জন্য আমি ফরমান জারী করলাম।

এই উপলক্ষে আমার পিতা যে সিংহাসন বানিয়েছিলেন তার ব্যবহার করলাম। সূর্য মেষ-রাশিতে প্রবেশ করায় নওরোয উৎসব উদযাপন করবার জন্য বহু অর্থ বিনিময়ে ঐ সিংহাসন আমি নতুনভাবে সজ্জিত করলাম। সিংহাসনের জালি মণিমাণিক্য দিয়ে তৈরী করতে ব্যয় হয়েছে দশ কোটি আশরফির মত। এক

একটি আশরফি পাঁচ মিসকাল ওজনের। এক কোটি হচ্ছে একশো লক্ষে, এক লক্ষ হচ্ছে একশো হাযারে। তার বাদেও নকশা ও কারুকার্যে হিন্দুস্তানী ও জনমতে তিনশো মণ সোনা লেগেছে। হিন্দুস্তানে এক মণ ইরাকের দশ মণের সমান। স্থান থেকে স্থানান্তরে নিয়ে চলাফেরার সুবিধার জন্য সিংহাসনটি এমনভাবে বানান হয়েছে যে ইচ্ছামত খণ্ড খণ্ড করে খুলে নিয়ে ঘুরে বেড়ান যায় এবং পরে জোড়া লাগান যায়। সিংহাসনের পায়া ও পিঠের মধ্যে পঞ্চাশ মণ মৃগনাভি ভরে দেওয়া হয়েছে। তার দরুন যে-কোন জায়গার দরবারে সুগন্ধের দরকার হয় না।

এ-ভাবে আমার প্রত্যাশিত ও কাঙ্ক্ষিত সিংহাসনে বসে রাজকীয় মুকুট আনার জন্য হুকুম দিলাম। আমার পিতা মুকুটটি ইরানের মহান নৃপতিদের মুকুটের অনুকরণে বানিয়েছিলেন। তারপর সমবেত আমীরদের সামনে মুকুটটি আমি আমার ভ্রূর উপর পুরা এক ঘণ্টার জন্য স্থাপন করলাম, এর মানে হচ্ছে আমার রাজত্বকালের স্থায়ী সমৃদ্ধির লক্ষণ। মুকুটে বারটি কোণ, প্রতি কোণে একটি করে রত্ন বসান, তার দাম এক লক্ষ আশরফি, আর এই আশরফি পাঁচ মিসকাল পরিমাণের। পুরা মুকুটটিই আমার পিতা তাঁর কালীন সরকারী সঞ্চয় থেকে কিনেছিলেন, পূর্ববর্তীদের কাছ থেকে প্রাপ্ত ওয়ারিশসূত্রে প্রাপ্ত অর্থ থেকে নয়। মুকুটটির চূড়ার কেন্দ্রে একটি চার মিসকালের মুক্তা বসান, তার দাম এক লক্ষ আশরফি, আর নানা জায়গায় বসান দুশো রুবী, প্রতি রুবী এক মিসকাল পরিমাণের, প্রতিটির দাম দু'হাজার টাকা।

চল্লিশ দিন চল্লিশ রাত নাকাড়া অর্থাৎ রাজকীয় বিশাল জয়ঢাক এক নাগাড়ে বাজাবার হুকুম দিলাম। সে নাকাড়ায় বাজতে লাগল আনন্দ ও বিজয়োল্লাসের ধ্বনি; আর আমার সিংহাসনের চারপাশের পঞ্চাশ গজ পরিমিত জায়গা আমার নির্দেশ অনুযায়ী মূল্যবান কিংখাব ও সোনার কারুকার্য করা কার্পেটে ঢেকে দেওয়া হল। চারদিকে সোনা ও রূপার ধূপাধার পাঠান হল সুগন্ধি পোড়াবার জন্য। প্রায় তিন সহস্র কর্পূরবাতি, তিন ফুট লম্বা, তাতে রূপা ও সোনার ডালপালা, মৃগনাভির গন্ধ ভরা, সারারাত ধরে সেই জায়গা উদ্ভাসিত করে রাখল। দামী পোশাক পরিহিত, অগণিত তরুণ, সারিবদ্ধ ভাবে আমার হুকুমের অপেক্ষায় শ্রদ্ধাবনত ভাবে দাঁড়িয়ে। তাদের পোশাক সিল্ক ও সোনায় বানান, তাদের কোমরবন্ধ ও কবচ থেকে হীরা, পান্না, নীলকান্ত মণি ও চুনির দ্যুতি বিচ্ছুরিত হচ্ছিল। তাদের দেখাচ্ছিল মিসরের প্যাভিলিয়নে তরুণ ইউসুফের মত; আর ছিল সাম্রাজ্যের আমীরবৃন্দ, ন'জনের অধিনায়ক সহ, তাদের ভেতর ছিল পাঁচশো, অশ্বের নায়ক থেকে পাঁচহাযারী মনসবদার, তাদের সবারই মাথা থেকে পা পর্যন্ত সোনা ও রত্ন-ভূষণে আচ্ছাদিত, কাঁধে কাঁধ মিলিয়ে ব্যূহ রচনা করে তারা তাদের সম্রাটের আদেশের জন্য দাঁড়িয়ে। চল্লিশ দিন চল্লিশ রাত ধরে এই উল্লাস সমারোহের দৃশ্য আমি সবার জন্য উন্মুক্ত রেখে দিয়েছিলাম। পৃথিবীতে রাজকীয় ঐশ্বর্য ও সমারোহের এমন নযীর পাওয়া ভার।

AMARBOI.COM

আমার পিতার বয়স আটাশ না হওয়ার পূর্বে তাঁর কোন সন্তানই এক ঘণ্টার বেশী জন্মের পর বাঁচেনি। এ ঘটনা তাঁর গভীর মনোবেদনার কারণ হয়েছিল। তাঁর মনোবাঞ্ছা পূরণ করার জন্য তিনি আল্লাহ্‌র দরবারে আকুল আবেগে হাযার প্রার্থনা জানিয়েছিলেন। তিনি যখন মনের দুঃখে এভাবে দিনযাপন করছিলেন, তখন তাঁর জনৈক আমীর, দরবেশদের প্রতি তাঁর অপরিসীম শ্রদ্ধা ও তাদের প্রভাবের উপর তাঁর বিশ্বাসের কথা জেনে তাঁকে বলেন যে আজমীরের শ্রদ্ধেয় মঈনউদ্দীন চিশতী (রহ.)-র মাযারে একজন দরবেশ আছেন। ঐ দরবেশের পবিত্র জীবনযাপন ও ব্যবহারের দরুন কেবল হিন্দুস্তানে নয়, সারা পৃথিবীতে তাঁর সমকক্ষ কেউ নেই। আশায় উদ্দীপিত হয়ে আমার পিতা শপথ করলেন যে যদি আল্লাহর ইচ্ছায় তাঁর কোন সন্তান হয় ও বেঁচে থাকে, তাহলে তিনি পায়ে হেঁটে শহর আগ্রা থেকে আজমীর যাবেন। আগ্রা থেকে আজমীরের দূরত্ব একশো চল্লিশ ক্রোশের কম নয়। তাঁর একমাত্র উদ্দেশ্য মাযারশরীফে গিয়ে তাঁর হৃদয়ের শ্রদ্ধাঞ্জলি জ্ঞাপন করা। হৃদয়ের গভীর থেকে আমার পিতার কামনা উৎসারিত হয়েছিল বলে আমার শিশুভ্রাতার মৃত্যুর ঠিক ছ'মাস পরে হিজরী ৯৭৮ সনের রবিউল আউয়াল মাসের বুধবার দিনের সাত প্রহরে সেই পরম শক্তিমান আল্লাহ এই দীন ঘটনাপঞ্জি লেখককে পৃথিবীতে প্রেরণ করেন। সূর্য তখন তুলা-রাশির চব্বিশ ডিগ্রী কোণে অবস্থান করছিল।

সংকল্প অনুযায়ী আমার পিতা, যিনি এখন স্বর্গলোকে আছেন, তাঁর সভার বিশিষ্ট ক'জন আমীরকে সঙ্গে করে পদব্রজে আগ্রা থেকে রওয়ানা হলেন। দিনে তাঁরা পাঁচ ক্রোশ পথ অতিক্রম করতেন। এভাবে তিনি আজমীরে মঈনউদ্দীন (রহ.)-এর মাযারে উপস্থিত হলেন। মাযারশরীফে তাঁর শ্রদ্ধাঞ্জলি নিবেদন করে তিনি ছুটলেন দরবেশের খোঁজে, যাঁর পবিত্র প্রভাবের দরুন তাঁর উদ্বিগ্ন হৃদয়ের আকাঙ্ক্ষা পূরণ হয়েছে। পুণ্যাত্মা দরবেশের নাম শেখ সেলিম। আমার পিতা সেই দরবেশের ভবনে উপস্থিত হয়ে তাঁর কোলে আমাকে তুলে দিয়ে নিবেদিত কণ্ঠে, আল্লাহর কাছে তাঁর শিশুসন্তানের নিরাপত্তার জন্য দোআ করতে বললেন শুধু তাই নয়। আমার পিতা সেই সাক্ষাৎকারের সময় দরবেশকে শুধিয়েছিলেন আল্লাহ তাঁকে ক'জন সন্তান দেবেন তা তিনি বলতে পারেন কি না। শাহী মেহমানের উপস্থিতিতে গর্ববোধ করে দরবেশ দ্বিধাহীন কণ্ঠে আমার পিতাকে বললেন যে, আল্লাহ তাঁকে তিনটি সন্তান দেবেন। এ-কথা শুনে দীপ্ত কণ্ঠে আমার পিতা বলে উঠলেন, 'তাদের ভেতর প্রথম সন্তানটি আপনার কোলে তুলে দিলাম।' দরবেশ বললেন, শিশুর মঙ্গল হোক। আপনি যখন শিশুটি আমার কোলে তুলে দিয়েছেন, তার নাম আমি মুহম্মদ সেলিম রাখলাম।' দরবেশের অমন প্রীতিময় ব্যবহার কল্যাণকর মনে করে আমার পিতা রাজধানীতে ফিরে এলেন। তারপর, চৌদ্দ বছর অবধি তিনি এই পুণ্যাত্মার সঙ্গে নিবিড় সংযোগ রক্ষা করে চলেছিলেন।[১]

---

১. পাণ্ডুলিপির এ জায়গায় কিছু বাদ গেছে বলে মনে হয়। কারণ সম্রাট হঠাৎ শিকরী গ্রামের কথা উল্লেখ করেছেন। গুজরাট বিজয়ের স্মারক হিসাবে তাঁর পিতা গ্রামটির নাম ফতেহপুর রাখেন বলে তিনি উল্লেখ করেছেন–নিকোপোলিস।

একথা উল্লেখ করতেই হয় যে আমার পিতা আমাকে কখনও মুহম্মদ সেলিম নামে ডাকেননি। বাবা বলেই তিনি আমাকে ডাকতেন। কেননা, ঐ শব্দে পিতৃহৃদয়ের সব স্নেহ ঝরে পড়ত। শেষ পর্যন্ত বোধ হয় আমি সুলতান সেলিম এই উপাধি নিয়েই সন্তুষ্ট থাকতাম; কিন্তু তুর্ক সম্রাটদের সমকক্ষ মনে করায় এবং পৃথিবী বিজয় সার্বভৌম শাসকদের কর্তব্য বিবেচনা করার দরুন, সিংহাসনে উপবেশন করে জাহাঙ্গীর বাদশাহ উপাধি ধারণ করা অপরিহার্য মনে করলাম, তার কারণ ঐ উপাধি আমার চরিত্রানুগ এবং আমার বিশ্বাস দৈব অনুগ্রহে দীর্ঘায়ু জীবন পেলে, নিয়তি নক্ষত্রের শুভ আনুকূল্য লাভ করে আমি আমার পদবীর যোগ্য হতে সক্ষম হব।

পূর্বপুরুষের সিংহাসনে উপবেশন করে যে-নির্দেশ আমি জারী করলাম তা ন্যায় শৃঙ্খলের সঙ্গে জড়িত। ঐ শৃঙ্খলের এক প্রান্ত আগ্রা দুর্গের সচ্ছিদ্র প্রাচীরের সঙ্গে বেঁধে দেওয়া হল, অন্য প্রান্ত যমুনা নদীর পাড়ে একটি প্রস্তর স্তম্ভের সঙ্গে। আমার সাম্রাজ্যের কোন অংশের বিচারকগণ যদি সুবিচার করতে অসমর্থ কিংবা ব্যর্থ হন, তবে ফরিয়াদী ন্যায় বিচারের জন্য এই শৃঙ্খল ধরে টানলেই সুবিচার পাওয়ার পথ পাবে। শৃঙ্খলটি সোনার তৈরী, একশো চল্লিশ গজ লম্বা, তার বিভিন্ন জায়গায় আশিটি ক্ষুদ্র ঘণ্টা বেঁধে দেওয়া হয়েছে, শৃঙ্খলটির হিন্দুস্তানী মানে ষাট মণ ওজন, ইরাকের ছয়শো মণের সমান।

আমি বারটি বিশেষ বিধি জারী করলাম। এই বিধিগুলো সাম্রাজ্যের বিভিন্ন কর্মচারিগণ তাঁদের আচরণ-বিধি হিসাবে পালন করবে। তার অন্যথা কিছুতেই হতে দেওয়া হবে না।

এক–আমি আমার প্রজাদের তিন প্রকার কর থেকে অব্যাহতি দিলাম। সে কর হচ্ছে যাকাত, সাবমোহরী ও তমগা। আমার পিতার কোষাগারে ঐ করগুলি থেকে ষোল শো মণ হিন্দুস্তানী ওজনের সোনা আসত। সে সোনা ইরাকের ষোল হাযার মণের সমান।

দুই–আমি আদেশ জারী করলাম যে আমার শাসনভুক্ত অঞ্চলের কোন ব্যক্তির সম্পত্তি যদি কেড়ে নেওয়া হয়, সে ডাকাতি কিংবা যে-কোন হিংসাত্মক কাজের মাধ্যমে হোক না, ঐ জেলার অধিবাসীদের হয় সম্পত্তি ফেরৎ দিতে বাধ্য করা হবে, নয়তো লুণ্ঠনকারীকে হাযির করতে হবে। আমি নির্দেশ দিলাম যে, যদি কোন জেলা পতিত কিংবা জনবসতি বিরল হয়ে উঠে, তাহলে সেখানে শহর তৈরী করতে হবে, জনসাধারণকে তালিকাভুক্ত করতে হবে এবং সমস্ত রকম পন্থা অবলম্বন করতে হবে যাতে করে প্রজাদের নিরাপত্তা নিশ্চিত হতে পারে। আমি জায়গীরদারদের আদেশ দিলাম তারা যেন এইরূপ জনবিরল অঞ্চলে মসজিদ নির্মাণ করে এবং যাত্রীদের থাকবার জন্য সরাইখানা তৈরী করে। এ ভাবেই জেলাটি পুনর্বার জনবসতিতে পূর্ণ হয়ে উঠবে এবং ভ্রমণকারীরা শঙ্কাহীন চিত্তে আনাগোনা করতে পারবে। এই উদ্দেশ্যে যে-সব জেলা শাহী এখতিয়ারভুক্ত, সেখানকার কর্মচারী 'ক্রোড়ী'কে শাহী তহবিল থেকে এই সব কাজ করবার জন্য আমি আদেশ প্রদান করলাম।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

তিন–দেশের ভিতর যে-সব বণিক ঘুরে বেড়াচ্ছে, তাদের সম্মতি ছাড়া তাদের বাক্সপেটারা কিংবা বস্তা যেন না খোলা হয়; কিন্তু যেক্ষেত্রে তারা পণ্য বিক্রী করতে উৎসুক, সেক্ষেত্রে খরিদ্দারগণ কোন জোরজবরদস্তি না করে তাদের সঙ্গে দরাদরি করতে পারবে।

চার–সরকারী কর্মচারী নয় এমন কোন ব্যক্তি যদি সন্তানসন্ততি রেখে মারা যায়, সেক্ষেত্রে কাউকে তার সম্পত্তিতে হস্তক্ষেপ কিংবা তার সন্তান-সন্ততিদের উপর জবরদস্তি করতে দেওয়া হবে না; কিন্তু যদি সন্তান-সন্ততি কিংবা কোন ওয়ারিশ না থাকে, সে ক্ষেত্রে সেই সম্পত্তি মসজিদ ও পুকুরের রক্ষণাবেক্ষণের জন্য উৎসর্গ করে দেওয়া হবে, যাতে করে মৃত ব্যক্তির আত্মার চিরস্থায়ী সদগতির ব্যবস্থা হয়।

পাঁচ–কোন ব্যক্তিকে মদ অথবা মাদকদ্রব্য তৈরী কিংবা বিক্রীর অনুমতি দেওয়া হবে না। আমি নিজেই এই আদেশ জারী করলাম, যদিও ষোল বছর বয়স থেকে আমি অত্যধিক মদ্যাসক্ত। সত্যি কথা বলতে কি, তরুণ পার্শ্বচরদের সহচারিতা ও নমনীয় পরিবেশে দিনযাপন-বৃহৎ ও সুসজ্জিত কামরা, চিত্র ও ভাস্কর্যে সুশোভিত, মেঝেয় বিছান সিল্ক ও সোনার মূল্যবান কার্পেট-সেই পরিবেশে থেকে চিত্ত-উৎফুল্লকারী পানীয় প্রত্যাখ্যান করা বোকামির লক্ষণ হত না কি? আর দ্রাক্ষা-রসের মত পানীয় আর কি-ই বা আছে? পানীয় অথবা অহিফেনে যেন আসক্তি না দেখা দেয়। অমন হলে আল্লাহ না করুন, মানুষ তার স্বভাবদত্ত ক্ষমতা হারিয়ে বসে; আর এ কথা স্বীকার করতেই হয় অমন পানাসক্তি ও অত্যধিক অহিফেন-প্রীতি মানুষকে দুর্বল করে ফেলে, তার প্রকৃতিতে শৌর্যবীর্য নাজুক করে দেয় ও বিকৃত কামনা উন্মীলিত করে। উত্তেজক দ্রব্যের তালিকাভুক্ত সব কিছুর গুণাবলী ঐ ধরনের। সেই সঙ্গে এ কথাও মনে না রেখে পারি না যে, কেলুরিকা হচ্ছে থিরাবুকের ভাই-পো।

নিজের কথা বলতে গেলে এ স্বীকার করতেই হয় যে আমার আসক্তির পরিমাণ এত বাড়িয়ে দিয়েছিলাম যে প্রতিদিন বিশ পেয়ালা, কখনও বা বিশ পেয়ালারও বেশী পান করতাম। প্রতি পেয়ালায় ধরতো আধ সের করে; আর আট পেয়ালা হচ্ছে ইরাকের এক মণের সমান। ক্ষতির মাত্রা এতদূর গড়িয়েছিল যে এক ঘণ্টা মদ ছাড়া থাকলে আমার হাত কাঁপতে শুরু করত, আর আমি অস্থির হয়ে উঠতাম। এইসব লক্ষণের দরুন আমার মনে হল যে এ অভ্যাস যদি পোক্ত হয়ে যায় তাহলে আমার দুর্গতির পরিসীমা থাকবে না। তার দরুন ঐ ক্ষতিকর প্রভাব থেকে মুক্তির উপায় সম্বন্ধে আমি চিন্তা করলাম এবং ছ'মাসের মধ্যে আস্তে আস্তে বিশ পেয়ালা থেকে দিনে পাঁচ পেয়ালায় মাত্রা কমিয়ে আনতে সফল হলাম। অবশ্য আমোদ জলসায় দুই-এক পেয়ালা বেশী আমি পান করতাম। প্রায় ক্ষেত্রে আমি নিয়ম করে ফেললাম যে সূর্য ডোবার দু'ঘণ্টা আগে থেকে আমি পানীয় গ্রহণ করব না; কিন্তু এখন সাম্রাজ্যের নানা কাজের চাপ আমার উপর বলে আমার পানক্রিয়া শুরু হয় মাগরিবের নামাযের এক ঘণ্টা বাদে, তাও কখনও পাঁচ

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

পেয়ালার বেশী নয়; তাছাড়া, ঐ মাত্রার বেশী হলে আমার সহ্যও হত না। দিনে একবার করে আমি নিয়মিত আহার করি, মদের খিদেও দিনে একবার করে মেটালেই আমার চলে; কিন্তু মানুষের জীবনধারণের পক্ষে মাংসের চেয়ে মদ কম দরকারী নয় বলে মদ খাওয়া একেবারে ছেড়ে দেওয়া অসাধ্য মনে না হলেও আমার পক্ষে দুঃসাধ্য মনে হয়। তবু আমার মনে হয়, আল্লাহর ইচ্ছায়, আমার পিতামহ হুমায়ূনের মত, পঁয়তাল্লিশের আগেই যিনি এই অভ্যাস ছেড়ে দিতে পেরেছিলেন, আমিও একদিন অমন ক্ষতিকর অভ্যাস ত্যাগ করতে পারব, আমার সংকল্পে তাঁর উদাহরণের সমর্থন মিলে। যে বিষয়ে আল্লাহ তাঁর অনীহা ঘোষণা করেছেন, সে বিষয়ে সৃষ্টজীব যদি সামান্যতম সংশোধনের চেষ্টা করে, তাহলে তা থেকেই মোক্ষলাভের উপায় বেরিয়ে আসবে।'

ছয়–আমার সাম্রাজ্যের কোন প্রজার বাসভবনে কোন ব্যক্তির জোর প্রবেশ করা চলবে না। সেনাবাহিনীর লোকেরা যদি কোন শহরে আগমন করে এবং জোরজবরদস্তি ছাড়া ভাড়া দিয়ে কোন থাকবার জায়গা পায়, তা প্রশংসা-যোগ্য। তা না হলে তাঁদের তাঁবু খাটিয়ে থাকবার ব্যবস্থা করে নিতে হবে। প্রজার পক্ষে এই অভিযোগের চেয়ে বিরক্তিকর আর কিছুই নেই, যখন সে দেখে অজানা একজন লোক জোর করে তার বাড়িতে ঢুকে সবচেয়ে ভাল জায়গাটির দখলি নিয়ে নেয়, তার সন্তানসন্ততি পরিবার-পরিজনদের তখন মাথা গুঁজবার ঠাঁই পর্যন্ত থাকে না।

সাত–যে অপরাধই হোক না কেন, কোন ব্যক্তির নাক কিংবা কান কাটা চলবে না। যদি চুরি করা অপরাধ হয়, তাহলে দোষীকে কাঁটায় ক্ষত-বিক্ষত করতে হবে, নয়ত কোরান হাতে শপথ করতে হবে ভবিষ্যতে সে যেন আর চুরি না করে[২]।

আট–প্রজাদের জমি জোর দখল না করার জন্য ক্রোড়ী ও জায়গীরদারদের নিষেধ করে দেওয়া হয়েছে, তারা ঐ-সব জমি নিজেদের চাষেও আনতে পারবে না। জায়গীরদার কিংবা জেলার কোন ইজারাদার (Feudatory) নিজেদের ক্ষমতায় সীমা লঙ্ঘন করতে পারবে না। অন্য জেলাভুক্ত মানুষ অথবা পশু প্রাণীকে জোর করে নিজের জেলাভুক্ত করতে পারবে না; বরং যে-জেলার ভার তার উপর সেই জেলার চাষাবাদের উন্নতির দিকেই তার সমগ্র শক্তি নিয়োজিত করতে হবে।

নয়–পাণ্ডুলিপিতে এই ধারাটি সম্পূর্ণ দুর্বোধ্য; তবে মনে হয় ধারাটিতে প্রতিষেধক কিংবা অহিফেন-এর অবৈধ প্রয়োগের উপর বিধিনিষেধ আরোপের কথা উল্লেখ আছে, অথবা খুব সম্ভব ঐ বিধিনিষেধ কিভাবে প্রয়োগ করা হবে তার নিদান আছে।

দশ–সকল বড় শহরের গবর্নরদের নির্দেশ দেওয়া হল যে তাঁরা যেন পীড়িতদের চিকিৎসার সুবন্দোবস্তের জন্য হাসপাতাল কিংবা আরোগ্যালয়

---

২. পাণ্ডুলিপির ত্রুটির দরুন এখানেও অন্যান্য জায়গায় অনুমানের উপর নির্ভর করতে হয়েছে।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

প্রতিষ্ঠিত করেন। অসুখ হলে তাদের এখানে স্থানান্তরিত করতে হবে। রোগী সুস্থ না হওয়া অবধি সব খরচপত্র সরকারী খাজাঞ্চীখানা থেকে দেওয়া হবে। সুস্থ হয়ে উঠলে সঙ্কটকালের জন্য প্রয়োজনীয় অর্থ দিয়ে তাকে বিদায় দিতে হবে।

এগার–আমার জন্মমাস রবিউল আউয়ালে গ্রামে নগরে গোশ্‌ত খাদ্য হিসাবে ব্যবহার করা নিষিদ্ধ করে দেওয়া হল এবং বৎসরে সমতা রেখে একদিন নির্ধারিত হল, সেইদিন পশু জবেহ একেবারে নিষিদ্ধ হল। সপ্তাহে, বৃহস্পতিবার, সেদিন আমি সিংহাসনে আরোহণ করেছিলাম বলে, গোশ্‌ত গ্রহণ নিষিদ্ধ করে দেওয়া হল; আর রবিবার, পৃথিবী সৃষ্টির সম্মানিত দিন বলে, পশুজবেহ্‌ সঙ্গত নয়। এগার বছরেরও বেশী আমার পিতা আহারে এই সংযম পালন করে এসেছিলেন। ঐ সময়ে রবিবারে তিনি কোন মতেই গোশ্‌ত গ্রহণে রাযী হতেন না। এই কারণেই, ঐদিন আমার রাজ্য জুড়ে অমন খাদ্যগ্রহণ নিষেধ করে দেওয়া আমি সঙ্গত মনে করেছিলাম।

বার–আমার পিতার শাসনকালে যে-সব আমীর ওমরাহ্‌ সম্মান ও শিরোপা পেতেন, সে-সব আমি অব্যাহত রাখার জন্য নির্দেশ জারী করলাম এবং যে সব ক্ষেত্রে যোগ্যতা পরিলক্ষিত হল সে সব ক্ষেত্রে বিভিন্ন পর্যায়ে পদোন্নতির আদেশ দিলাম। দশ ঘোড়ার মালিককে পনের ঘোড়ার মালিকানা দিলাম এবং এ ভাবে সমতা বজায় রেখে সাম্রাজ্যের উচ্চতম আমীরদের সম্মানে ভূষিত করলাম।

এই ক্ষেত্রে না বলে পারছি না যে আল্লাহর গযব সেইসব অকৃতজ্ঞ কর্মচারীর উপর পড়ুক, যারা অবিরল এই শিরোপা বিতরণের মূল্য বুঝে উঠতে পারেনি। মানুষী স্বভাবের বিকৃতি এমন যে আমি মন্তব্য না করে থাকতে পারছি না যে, তাদের মধ্যে এমন সব লোকও আছে, যাঁরা আমার প্রতি আনুগত্য প্রদর্শন করতেও কুণ্ঠাবোধ করে। তাদের অনিচ্ছা সত্ত্বেও, এ জন্য তাদের কষ্ট করে নিয়ে আসতে হয়। এই সব ঔদ্ধত্যপরায়ণ ব্যক্তির সঙ্গে কোনমতেই রফা করা উচিত নয়, কেননা তাদের মতামত থেকে রাষ্ট্রে উপপ্লবের সঞ্চার হয়। তাদের অবিরাম প্রার্থনা বিরোধ ও গৃহবিবাদ দেখা দেওয়ার জন্য, এইভাবে তারা তাদের হীন ও কুৎসিত উচ্চাকাঙ্ক্ষার পরিকল্পনা সফল করার চেষ্টা করে; কিন্তু তারা ভুলে যায় যে তারাই হচ্ছে সেই চরিত্রের লোক যাদের ঝঞ্ঝা সবার আগে উৎখাত করে দেয়।

ইরানের মরহুম শাহ্‌ তামাস্পের একটি মন্তব্যের উল্লেখ এ-ক্ষেত্রে আমি না করে পারছি না। তাঁর কোন একটি প্রাসাদের নিকটে দীর্ঘিকা খননের কাজ শেষ হওয়ার পর তিনি তাঁর পারিষদদের জিজ্ঞাসা করলেন, পানি ছাড়া আর কি দিয়ে দীঘিটি ভর্তি করা যায়? একজন পারিষদ সোনা দিয়ে ভর্তি করার কথা বলল। নৃপতি উত্তর দিলেন, 'ভালই বলেছ তুমি। দেখা যাচ্ছে লোভ তোমার স্বভাবজাত প্রবণতা।' অন্য একজন বলল, বরফ মেশান শরবত, চিনি ও গোলাপ-পানিতে সে ভর্তি দেখতে উৎসুক। শাহ্‌ মন্তব্য করলেন, 'মনে হচ্ছে তুমি আফিংখোর। তোমার নেশার নির্দেশটা সঠিকভাবে করেছ তুমি'। স্ব স্ব ধারণা অনুযায়ী নানা জনে নানা মত দিল; কিন্তু শাহ্‌ তামাস্প শেষকথা উচ্চারণ করলেন এই বলে যে, তাদের

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

মতামতের সঙ্গে তাঁর মতের কোথাও মিল নেই। তাঁর মতে, অবাধ্য ও ঔদ্ধত্যপরায়ণ ব্যক্তিদের রক্তে, যারা হচ্ছে গোলযোগ ও উপপ্লবের দূত, দীঘিটি ভর্তি করাই সবচেয়ে ভাল[৩]। সত্যি কথা বলতে কি আমার পিতার মৃত্যুর পর প্রচুর অভিজ্ঞতার মধ্যে দিয়ে জেনেছি যে বিশ্বস্ত ও রাজভক্ত লোকের সংখ্যা কত অল্প। এক লক্ষে একজনের বেশী অমন লোকের দেখা পাওয়া ভার।

যখন আমি শাহ্যাদা ছিলাম তখন এ কথা বর্ণিত হতে শুনেছি যে, শাহ্ আব্বাসের সঙ্গে ফরহাদ খান নামক জনৈক মন্ত্রীর সম্পর্ক অত্যন্ত ঘনিষ্ঠ ছিল। একবার ঐ মন্ত্রী পীড়িত হয়ে পড়েন তাঁর ক্ষতের দরুন। সম্রাট প্রায় ভোরেই তাঁকে দেখতে যেতেন। তিনি নিজের জিভ দিয়ে ঐ ক্ষত চেটে দিতেন। তাঁর প্রভু তাঁকে পারস্য সাম্রাজ্যের সর্বোচ্চ আসনে সমাসীন করেছিলেন; তবুও নৃপতি তাঁর একান্ত ঘনিষ্ঠ ঐ ব্যক্তির প্রাণ নিতে বাধ্য হয়েছিলেন। শাহের অমন কাজ করার পেছনে যে যথেষ্ট যুক্তি আছে সে বিষয়ে আমার কোন সন্দেহ নেই। বহুদিনের অভিজ্ঞতায় আমার এই ধারণা জন্মেছে যে, বিশ্বাসঘাতক অকৃতজ্ঞের শাস্তি না দেওয়াই হচ্ছে সবচেয়ে বড় বোকামি। তবু বহু পরীক্ষিত সত্ত্বেও সৎ ও বিশ্বস্ত ভৃত্যকে খুব বেশী লাই দেওয়া উচিত নয়। বারবার এ-কথা না বললেও চলে যে, যে-দুর্বৃত্তের কর্মক্ষমতা অর্থলালসায় পিচ্ছিল, তাকে আর পরীক্ষা না করলেও হয়। সে রাজদ্রোহী দুশ্চরিত্র ব্যক্তি ছাড়া অন্য কিছু নয়।

সরকারের বেতনভুক কর্মচারীদের ভাতার পরিমাণ বাড়িয়ে দিলাম। যে-ব্যক্তি দশ পায় তাকে আমি পনের টাকা বরাদ্দ করলাম। তেজারতের শিক্ষানবিশী ও বিভিন্ন অস্ত্রশস্ত্রের কারখানায় নিযুক্ত কারিগরদের ভাতার পরিমাণ সর্বসাকুল্যে দশ থেকে বারতে দিলাম বাড়িয়ে। আমার পিতার হারেমের অন্তঃপুরিকাদের ভাতা বাড়ালাম। হারেমে তাদের সংখ্যা ছিল প্রায় সাত হাযার। প্রতিদিনের জন্য তাদের ভাতা দুই থেকে চার আশরফিতে গেল বেড়ে। আশরফির পরিমাণ পাঁচ মিসকাল[৪]। বাৎসরিক উৎসবাদি ও আনন্দ মুখরিত দিনে যে-সব রাজকীয় যৌতুক তাদের দিয়ে থাকি, সে-সব কিন্তু আলাদা।

আমার পিতার শাসনকালে ধর্মপ্রচারকগণ এবং আইন ও সাহিত্যের ছাত্রবৃন্দ (সাম্রাজ্যের প্রধান প্রধান নগরে তাদের সংখ্যায় তারা হবেন পাঁচ হাযার) সরকারী পেনশন ভোগ করতেন। আমার পিতাপর অনুশাসনাবলীর সঙ্গে সঙ্গতি রেখে আমি মীরন সদর জাহানকে যিনি ছিলেন হিরাট নগরীর শ্রেষ্ঠ সৈয়দ-কুলোদ্ভবদের একজন, তাঁদের অবস্থানুযায়ী জীবন নির্বাহের ভাতা বরাদ্দ করে দেওয়ার জন্য নির্দেশ প্রদান করলাম। এই ভাতা আমার সাম্রাজ্যভুক্ত প্রজাদের শুধু নয়, পারস্য, রোম, বোখারা ও আজারবাইজান থেকে আগত বিদেশীদের জন্যও বরাদ্দ থাকল।

---

৩. যদি পাণ্ডুলিপির শব্দটি কিলিকচি (Keliktchee) হয়, তাহলে তার মানে উপপ্লবের দূত।

৪. আশরফির হিসাব পনের টাকা ধরলে গড়ে বিয়াল্লিশ হাযার পাউন্ড দৈনিক অথবা বার লক্ষ ষাট হাযার পাউন্ড মাসে এবং এক কোটি একান্ন লক্ষ কুড়ি হাযার পাউন্ড খরচ পড়ে বৎসরে।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

নির্দেশ থাকল এই শ্রেণীর ব্যক্তিরা যেন কোন রকম অভাব অথবা অসুবিধার সম্মুখীন না হয়, ঐশ্বর্য আল্লাহ্র–সব ক্ষমতা তাঁর থেকে উৎসারিত–এবং এঁরা হচ্ছে তাঁর সেবক। যেহেতু তাঁর ইচ্ছাক্রমে অগণিত মনুষ্যের মধ্যে তিনি আমাকে বিশাল এক সাম্রাজ্যের সম্রাট হিসাবে বেছে নিয়ে শাসনভার অর্পণ করেছেন, সেজন্য তাঁরই সেবায় নিবেদিত-প্রাণ ব্যক্তিদের দুঃখ-দুর্দশা আমি মেনে নিতে পারিনে অথবা তাঁদের অভাব সম্পর্কেও অমনোযোগী থাকতে পারিনে। সেই কারণেই তাঁদেরকে আমার বিশেষ দায়িত্বের অন্তর্ভুক্ত করে নিলাম। এখানে যে কথা উল্লিখিত হল তার অন্যথা যদি আমার আচরণ হয়, তাহলে শেষ বিচারের দিনে আমার দায়িত্বের ভার কি ভয়াবহ হবে।

এর পরেই আমি সাধারণ মার্জনা ঘোষণা ও সাম্রাজ্যভুক্ত বন্দীদের দণ্ডাদেশ মওকুপ করার নির্দেশ জ্ঞাপন করলাম। তার দরুন এক গোয়ালিয়র দুর্গ থেকে সাত হাযার ব্যক্তি মুক্তি পেল। তাদের ভেতর কারো কারো বন্দী-দশা চল্লিশ বছরের। এ সময় যাদের মুক্তি দেওয়া হল, তাদের সঠিক সংখ্যা ধারণা করা যেতে পারে হিন্দুস্তানের মোট দুর্গ সংখ্যা থেকে। হিন্দুস্তানের সীমার মধ্যে দুহাযার চারশো শক্তিশালী দুর্গ আছে। অবশ্য বাঙলা মুলুকের দুর্গের সংখ্যা বাদ দিয়ে, সেখানে দুর্গের সংখ্যার লেখাজোখা নেই; তার কারণ রাজা মানসিংহের কমপক্ষে দুশো আশিটি ছেলে ছিল, তাদের সবাই, কোন না কোন সময়ে তাদের পিতার বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করেছে, সেই বিদ্রোহকালে তাদেরকে পাহাড়ের চূড়ায় চূড়ায় দুর্গ তৈরী করতে হয়েছে পিতার বিরুদ্ধে বিদ্রোহের শাস্তি থেকে অব্যাহতি লাভের জন্য এবং এটা কি বিশ্বাসযোগ্য বলে মনে হবে যে চার বছরের অনধিক কালের ভেতর আমার পিতা ঐ দেশটি, সহস্র যোজন বিস্তৃত ও অগণিত দুর্গ সত্ত্বেও, করায়ত্ব করেছিলেন। রাজার সব পুত্রই একে একে বিনাশ প্রাপ্ত হয়েছিল, রাজা স্বয়ং তাঁর শত্রুর হাতে পতিত হয়ে বিজয়ীর কাছে চূড়ান্ত ভাবে আত্মসমর্পণ করেছিলেন।

আমার প্রাথমিক অনুশাসনাবলীর মধ্যে ছিল যেসব মূল্যবান ধাতুদ্রব্য সাম্রাজ্যের মুদ্রামালার অন্তর্ভুক্ত, সেগুলোর নতুন নামকরণ হবে আমার নিজের শাহী নামে; প্রতিটি মুদ্রার পরিবর্তিত নামকরণ হল : যথা দু'হাযার তোলার স্বর্ণমুদ্রার আমি নাম দিলাম নূরে শাহী, রাজ্যের আলো; এক হাযার তোলার স্বর্ণমোহরের নূরজাহান, পৃথিবীর আলো; পাঁচশো তোলার স্বর্ণমোহরের নূরে দৌলত, রাষ্ট্রের আলো; একশো তোলার স্বর্ণমোহরের নূরে মেহের, সূর্যের আলো এবং এক তোলার স্বর্ণমোহরের আমি নাম দিলাম নূরউদ্দীন মুহম্মদ জাহাঙ্গীর বাদশাহ, মুহম্মদী ধর্মের আলো সম্রাট জাহাঙ্গীর। এক তোলার স্বর্ণমোহর স্বর্ণ রূপিয়ার বদলে চালু করা হয়েছিল। তাছাড়া, সোনার প্রতিটি মুদ্রার প্রতিমানে আমি রূপার মুদ্রা উৎকীর্ণ করেছিলাম। তাদের এক পিঠে লেখা থাকত আমার রাজত্বকালের বছর, অন্য পিঠে আমাদের ধর্মের স্মারক-লা ইলাহা ইল্লাল্লা মুহম্মাদুর রসূলুল্লাহ্-আল্লাহ্ ছাড়া অন্য কোন উপাস্য নাই এবং মুহম্মদ তাঁর প্রেরিত পুরুষ।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

বলাই বাহুল্য, আগ্রা হিন্দুস্তানের বৃহত্তম নগরীগুলির অন্যতম। নগরীটি বহু প্রাচীন দুর্গ দ্বারা সুরক্ষিত ছিল। আমার পিতা পুরান দুর্গ ভেঙ্গে ফেলে পাথরের নতুন দুর্গ নির্মাণ করেন। এ বিষয়ে অন্যত্র উল্লেখ আছে। আমি শুধু এখানে এটুকু মাত্র বলব যে, শহরটি যমুনা নদীর দুই তীরে ছড়ান। পশ্চিম পাড়ের অংশটি প্রস্থে চার ক্রোশ ও পরিধিতে দশ ক্রোশ। অন্য পাড়ের অংশটি প্রস্থে দুই ক্রোশের বেশী নয় ও পরিধিতে তিন ক্রোশ। নদীর দুই তীরের সুমনোহর সৌধমালা ইরাক, খুরাশান ও জেহুনের পরপারের বিখ্যাত ভূভাগের নগরীগুলির সঙ্গে তুলনীয়। সেই ভবনরাজির মধ্যে আছে বিশালকায় মস্‌জিদ, স্নানাগার, বিস্তৃত সরাইখানা, জমকালো প্রাসাদসমূহ। নগরীর সাধারণ বাসিন্দাদের ঘরবাড়ি, অধিকাংশ ক্ষেত্রে তিন কি চারতলা উঁচু। জনসংখ্যা এতই অপরিমেয় যে মাগরিবের নামায থেকে রাতের প্রথম প্রহর পর্যন্ত রাস্তায় ভীড়ের জন্য লোকের পক্ষে পথচলা সত্যিই কষ্টসাধ্য হয়ে উঠে।

জনসংখ্যার পরিমাণ জরিপ করার জন্য আমি শহর কোতোয়াল মালিক আলীকে শহরে সফর করবার জন্য একটি নির্দেশ দিয়েছিলাম। তাকে বলেছিলাম বিভিন্ন রঙ্গালয়ে সমবেত ব্যক্তিদের গণনা করবার জন্য। আলী তার রিপোর্টে উল্লেখ করেছে যে এই সব জায়গায় সে কমপক্ষে দুই হাযার থেকে তিন হাযার লোক দেখেছে। অবশ্য ঐ দিনটি নওরোয ছিল না বা উৎসব-মুখর কোন পর্বের দিনও ছিল না যে-সব দিনে সচরাচর মানুষ ফুর্তি ও হল্লা করতে রাস্তায় ভীড় জমায়। এর থেকে ধারণা করা যেতে পারে যে শহরের নানা মহল্লায় বিপুল জনসংখ্যা। এই প্রসঙ্গে উল্লেখ করা যায় যে, বছরের প্রতিদিন যমুনা দিয়ে নৌকাযোগে কমপক্ষে দশ হাযার বোঝা জ্বালানি আসে। তবু চাহিদা এত বেশী যে এক দিরহামেও একটিমাত্র ডাল কেনাও কষ্টসাধ্য। তাছাড়া, শীতের মওসুমে প্রায় আট মাস ধরে অথবা বর্ষার অন্তর্বর্তী পর্যায়ে, কাবুল ও তৎসন্নিহিত অঞ্চল থেকে কমপক্ষে পাঁচ হাযার থেকে ছয় হাযার ঘোড়া দিনে বিক্রীর জন্য শহরে আসে। এত তাড়াতাড়ি বিক্রয় হয়ে যায় যে পরদিন কেনার মত একটি ঘোড়াও থাকে না। মোদ্দা কথা, সারা দুনিয়ায় জনসংখ্যার বৈচিত্র্যও বিপুলতার দিক থেকে আগ্রা নগরীর সমকক্ষ অন্য কোন শহর আছে বলেও আমার জানা নেই।

অবস্থানের দিক থেকে, শহরটি সপ্ত-ঋতুর দ্বিতীয় ভাগে, পূর্বে তার কনৌজ, পশ্চিমে নাগর, উত্তরে সম্বল এবং দক্ষিণে চান্দেরী। (জাহাঙ্গীর এখানে শিরাজের কবি কারুফীর কবিতা উদ্ধৃত করেছেন। কবিতাটি আকবরের সময়কার আগ্রা নিয়ে লেখা। সুলতান খুররম, যিনি পরে সম্রাট শাহজাহান হয়েছিলেন, তাঁর প্রাসাদের উপর কবিতাটি লেখা। ক্লান্তিকর ও নিরর্থক বলে, তার উল্লেখ এখানে করা হল না।)

আফগান রাজত্বের আগে থেকেই আগ্রা গুরুত্বপূর্ণ শহর ছিল। সবুক্তগীনের দ্বাদশ বংশধর ইব্রাহীমের পুত্র মাসউদের সময়কার গজনীর জনৈক কবি আগ্রার প্রশস্তি গেয়েছেন। হিন্দুদের লেখা থেকে জানা যায় যমুনা নদীর উৎস এইসব

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

পর্বতে; পর্বতগুলি তুহিনাচ্ছন্ন, তার দরুন মানুষের অগম্য। উত্তর পশ্চিমের হাসিরাবাদের কাছে নদীটির স্রোত এত প্রবল যে হাতীও ভেসে যায় খড়কুটার মত। আগ্রা দুর্গের পাদদেশ থেকেই নদীটি বাঁক নিয়েছে বাংলা দেশ বরাবর।

আবার সিকান্দর লোদী যখন দিল্লী থেকে গালিমের বিরুদ্ধে অভিযানে বেরিয়েছিলেন, তখন তিনি আগ্রাতে আসেন। দিল্লী সে সময় ভারতীয় সুলতানাতের রাজধানী। আগ্রাতে তিনি তক্ষুণি রাজধানী আনেন সরিয়ে এবং সবশেষে ঘটনাবলীর নিয়ন্তা সর্বশক্তিমান আল্লাহ্ তায়ালা আমাদের কীর্তি-উজ্জ্বল বংশে হিন্দুস্তানের সাম্রাজ্য সমর্পণের অভিপ্রায় করেন। আমার পূর্বপুরুষ সম্রাট বাবর সিকান্দার লোদীর পুত্র ইব্রাহীমকে পরাজিত করে দিল্লী করায়ত্ত ও বাংলার শক্তি পর্যুদস্ত করার পর, আগ্রার প্রতি তাঁর ঔৎসুক্যের নযীর রেখে যান তাজা হাওয়ায় ছাওয়া যমুনার অপর পাড়ে বিস্তৃত ও সুন্দর এক বাগান তৈরী করে। বাগানের এক অংশে সবুজ মার্বেলের চারতলা এক প্যাভিলিয়ন নির্মাণ করেন, তার উপর বিশ গজ পরিমিত এক গম্বুজ[৫] চারপাশে তার গ্যালারী ঘেরা, গ্যালারীর খিলানগুলি মসৃণ মার্বেলের, ছাদে সোনা ও লাপিস-লাজুলির কারুকার্য; শিল্পকর্মের প্রকৃষ্ট উদাহরণ এটি। তাছাড়া, বাগানের ভেতর তিনি দুই ক্রোশ লম্বা সুপারি গাছের সারি বানিয়েছিলেন। প্রতিটি সুপারি গাছ বিরানব্বই ফুট উঁচু'; আর গাছের ডালপালা ছাতার মত ছড়ান। কার্যত অমন ছায়াবীথি রচনার জন্য এইসব দীর্ঘ ও সুঠাম গাছ ছাড়া আর কিছুই মানানসই হত না। বাগানের মধ্যখানে তিনি এক ক্রোশ পরিধি জুড়ে চৌবাচ্চা নির্মাণ করেছিলেন, তার পাড়ি খণ্ডখণ্ড পাথরে বাঁধান, আর চৌবাচ্চার মধ্যখানে তিনি আরও একটি দোতলা প্যাভিলিয়ন তুলেছিলেন, তাতে দরকার মত দুশো লোক বসতে পারে। প্যাভিলিয়নটির দরজা ও দেওয়ালগুলি নমনীয় নকশার কারুকার্যে মণ্ডিত, আর পাথরের বাঁকা সিঁড়ি বেয়ে প্যাভিলিয়নে আসার ব্যবস্থা করা। বাগানটি আড়াই শত জিরিবস[৬] জায়গা জুড়ে বিস্তৃত। বাগানটির নাম দেওয়া হয়েছিল বেজুগে-গুলফে-শান–গোলাপ ছড়ান। বাগানের এক কোণে তিনি একটি বড় আকারের মসজিদও নির্মাণ করেছিলেন, সঙ্গে ছাদে ঢাকা একটি কুয়া। এই বিখ্যাত নৃপতির রাজত্বকালে হিন্দুস্তানের আবহাওয়ার উপযোগী বহু বিদেশী ফলের গাছও বাগানে লাগান হয়েছিল। আমি একটি ফলের কথা বিশেষভাবে উল্লেখ করব। সেটি আনারস। ফিরিঙ্গীদের (অথবা পর্তুগীজ) দ্বীপের সবচেয়ে সুস্বাদু ফল এটি। এই বাগানেই এক মওসুমে এক লক্ষ আনারসের উৎপাদন হয়েছিল।

আর যে-সব ফল বহু ভাবে উৎপাদিত হত, তাদের ভেতর আছে ভাল জাতের সুস্বাদু আঙুর, কয়েক জাতের আপেল, সুলাইমান ও আব্বাস অঞ্চলের এপ্রিকট, বে-আলু, কাবুল ও পশ্চিম দেশের আরও নানা জাতের ফলপাকড়। হিন্দুস্তানের

---

৫. প্রায় সাঁইত্রিশ কোটি।
৬. আড়াই শো একরের কিছু কম।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

আবহাওয়ায় আগে যে সব ফল জন্মাত না, সেই সব ফলের চাষই এখন সাফল্যের সঙ্গে করা হচ্ছে। এই বাগানেই রোপণ করা হয়েছিল চন্দন বৃক্ষ, যে-বৃক্ষ জীর দ্বীপে শুধু পাওয়া যেত; আর হিন্দুস্তানী ফলপাকড় নানা ধরনের ছিল, তার বর্ণনা করা ক্লান্তিকর; আর ফুলের ভেতর ছিল সব জাতের গোলাপ, বিশেষ উল্লেখযোগ্য মুষ্ক ও দামিশকের গোলাপ, আরও ছিল যুঁই ও গুলচামেলী। গুলচামেলী ভারতীয় ফুলের সেরা। মোট কথা, গুলফাসান বাগানে ফুল ও ফুলের-গাছের অশেষ বৈচিত্র্যের উল্লেখ বর্ণনার অতীত।

পূর্বোল্লিখিত আগ্রা দুর্গটি আমার পিতা পুনর্নিমাণ করেছিলেন। দুর্গটির ভিত্তিভূমিতে ছিল লাল পাথর, চারটি ছিল বড় ফটক এবং দুইটি সৈন্যনির্গমন পথ। দুর্গটি, ছিল বস্তুত তাঁর ক্ষমতার মিনার বিশেষ, আর নির্মাণও করা হয়েছিল এমন নিপুণভাবে যে কারও পক্ষে বলে উঠা বিচিত্র নয় যে একটি মাত্র প্রস্তর থেকেই ভাগ্য-স্থপতি দুর্গটি গড়ে তুলেছেন। তাতে ব্যয় হয়েছিল কম করেও একশো ছিয়াশি লক্ষ আশরফি, প্রতি আশরফি পাঁচ মিসকাল পরিমাণের[৭]।

একই সঙ্গে তাঁদের নৃপতির অনুসরণে রাজসভার প্রতিটি পারিষদ ও সাম্রাজ্যের প্রজারা, নিজের নিজের ক্ষমতানুযায়ী শহর ও শহরতলীতে প্রাসাদোপম বাড়িঘর নির্মাণে তৎপর হয়ে উঠল, সেই সঙ্গে সুন্দর সুন্দর বাগান; ফলে, জায়গাটি হয়ে উঠল সবার প্রশংসা ও আনন্দের বস্তু। সত্যি কথা বলতে কি, আগ্রা আশ্চর্য সুন্দর শহর! তার দরুন মানুষের চোখে আগ্রা গোয়ালিয়র ও মথুরার সঙ্গে স্থান পেয়েছে। অবশ্য এতে আশ্চর্যের কিছু নেই। মথুরা হচ্ছে কৃষ্ণের জন্মস্থান, কৃষ্ণকে ভারতীয়রা তাদের অজ্ঞতার দরুন ঈশ্বর বলে সম্মান করে। তারাই তাদের শ্রেষ্ঠ প্রশংসাসূচক বাক্য উচ্চারণ কালে এই তিনটি শহরকে চেনা পৃথিবীর সবচেয়ে বড় বলে অভিহিত করে।

আমি এখানে বর্ণনা করতে চাই যে বানারস শহরে রাজা মানসিংহ ছত্রিশ লক্ষ আশরফি ব্যয় করে একটি মন্দির তৈরী করেছিলেন। প্রতিটি আশরফি পাঁচ মিসকাল পরিমাণের[৮]। মন্দিরের প্রধান মূর্তির মাথায় ছিল একটি টায়রা বা টুপি, তা ঘিরে যে অলঙ্কার ছিল তার পরিমাণ তিন লক্ষ আশরফি। তাছাড়া মন্দিরের প্রধান প্রতিমাটির সহযোগী ও সেবক হিসাবে চারটি মূর্তি ছিল। মূর্তি ক'টি আগাগোড়া সোনায় তৈরী। প্রতিটির মাথায় একটি করে টায়রা বসান, দুর্লভ সব পাথরে গাঁথা। এই সকল জাহান্নামীদের ধারণা মরা হিন্দু বেঁচে উঠবে এই প্রতিমার সামনে রেখে দিলে, অবশ্য ঐ লোকটি যদি জীবিত কালে ঐ প্রতিমার উপাসনা করে থাকে। আমি এই কথায় প্রত্যয় আনতে পারিনি বলেই একজন বিশ্বাসভাজন লোককে নিয়োগ করলাম সত্যাসত্য যাচাই করার জন্য। আমি যা ভেবেছিলাম তা-ই, সমস্তটাই বুজরুকী মাত্র। এই সত্য জানার পর বুজরুকীর

---

৭. ছাব্বিশ কোটি পঞ্চাশ লক্ষ টাকা; এক আশরফি পনের টাকা হিসাবে।

৮. পাঁচ কোটি চল্লিশ লক্ষ টাকা।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

ক্ষেত্র ঐ মন্দিরটি ধূলিসাৎ করার সংকল্প গ্রহণ করলাম এবং ঐ জায়গায় ঐ মাল-মশলা দিয়েই তৈরী করলাম বিশালকায় মসজিদ, তার কারণ বানারসে ইসলামের নাম উচ্চারণই ছিল বুঝি নিষিদ্ধ। আমি যদি বেঁচে থাকি, আল্লাহ চাহেত, পুরা শহরটাই আমি মুসলমানে ভরে দিতে চাই।

এই প্রসঙ্গে আমার বলা উচিত যে একবার আমার পিতাকে আমি জিজ্ঞাসা করেছিলাম কেন তিনি ব্যুৎপুরস্তির এইসব আড্ডাখানা নির্মাণে হস্তক্ষেপ করতে বারণ করেন। তার জবাবে তিনি বলেছিলেন, 'বৎস, আমি ধর্মভীরু বাদশাহ, আল্লাহর প্রতিচ্ছায়া পৃথিবীতে, আল্লাহর আশীর্বাদ তাঁর সৃষ্ট সব জীবের উপর সমভাবে আছে, আমি তা দেখেছি। আমাকে যদি আমার মহান পদের দায়িত্ব পালন করতে হয়, তাহলে কি আমার পক্ষে উচিত হবে আমার দায়িত্বের পরিধির ভেতর যারা আছে তাদের থেকে করুণা ও দয়া প্রত্যাহার করা? সব রকম মানুষ, আল্লাহর সৃষ্ট সব জীবের সঙ্গে আমার মৈত্রী; যদি তা-ই হয়, তাহলে কেন আমি শুধু শুধু এঁদের কারো উপর জবরদস্তি করব ও হামলা করার দায়ে দায়ী হব? তাছাড়া মনুষ্যজাতির ছয় ভাগের পাঁচ ভাগই কি হিন্দু অথবা বিধর্মী দ্বারা অধ্যুষিত নয়? তোমার প্রশ্নের ভেতর যে-ইঙ্গিত লুকান, তার অনুসরণ করলে তাদের হত্যা করা ছাড়া গত্যন্তর থাকে না। বিচার বিবেচনা করে দেখেছি তাদের শান্তিতে থাকতে দেওয়াই শ্রেয়ঃ। এ কথাও ভোলা উচিত নয় যাদের সম্পর্কে তুমি বলছ, আগ্রার অন্যান্য বাসিন্দাদের সঙ্গে তারা নানা দরকারী পেশায় রত, হয় তারা বিজ্ঞান কি কলা-শাস্ত্রের চর্চা করছে, নয়তো তারা মনুষ্যজাতির উন্নতি বিধানে নিযুক্ত। প্রায় ক্ষেত্রেই তারা রাষ্ট্রীয় কার্যকলাপে উচ্চতম সম্মান লাভ করেছে। বস্তুত : এই শহরে নানা জাত ও নানা ধর্মের লোকের সাক্ষাৎ মেলে।'

আমার জ্যেষ্ঠপুত্র খসরুকে আগ্রাদুর্গের শাহী মিনারের উচ্চতম অংশে বন্দী করে রাখতে আমি বাধ্য হয়েছিলাম। তার একগুঁয়ে ও অকর্তব্যবুদ্ধির যথেষ্ট প্রমাণ থাকা সত্ত্বেও, আমি মাসে একবার তার সঙ্গে কয়েদঘরে দেখা করতে যেতাম। তাছাড়া তার খরচ চালাবার জন্য মাসে তাকে আমি তিন লক্ষ আশরফি ভাতা প্রদান করতাম। তার সন্তানদেরও তার সঙ্গে সপ্তাহে একবার করে দেখা করবার অনুমতি দিয়েছিলাম।

পুরুষানুক্রমে আমার পিতার কাজকর্মের সঙ্গে যারা জড়িত, সৈয়দ খান তাদের অন্যতম। আমি তাকে পদোন্নতি করে পাঞ্জাবের শাসনকর্তা ও লাহোর সেনাবাহিনীর অধিনায়কের পদে বসাই। এই উপলক্ষে আমার পক্ষ থেকে সে পেয়েছিল একটি হাতী ও মর্যাদাসম্পন্ন পোশাক। পোশাকটি আমার তোষাখানার। সেই সঙ্গে একটি কোমরবন্দ ও খঞ্জর কিংবা কিরিচ। খঞ্জরটি মণিমাণিক্য-গাঁথা; আরও দিয়েছিলাম একটি ঘোড়া ও ঘোড়ার সাজসজ্জা এবং পাগড়িতে পরার জন্য মণিমুক্তা। ঘোড়ার সাজসজ্জা ও পাগড়িটি দামী মণিমুক্তায় কাজ করা। এই নায়কটি মোগল বংশোদ্ভূত। তার পূর্বপুরুষেরাও আমাদের কাজ করে এসেছে। আমার দরবার ছেড়ে চলে যাবার পর তার গন্তব্যের দিকে বেশ এগিয়ে যাওয়ার

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

পর, আমার গুটিকয়েক লোক আমাকে এসে জানাল যে, ঐ নায়কটির দলে এমন ক'টি লোক আছে যারা নির্মম ও নিষ্ঠুর প্রকৃতির, গরীবদের উপর জুলুম করার ব্যাপারে তাদের প্রসিদ্ধি আছে। দেরি না করে মুহম্মদ ইয়াহইয়ার পুত্র খোজা সাদেককে তার কাছে পাঠালাম এই বলার জন্য যে ছোট বড় সবাই আমার চোখে সমান, অতএব আমার ন্যায়প্রীতি ব্যক্তি-বিশেষের জুলমত উপেক্ষা করে যেতে পারে না। 'সুলাইমানের খ্যাতি কি পৃথিবীর সব রাজাদের ছাড়িয়ে নয়? তাঁর দৃঢ় ন্যায়প্রীতিই তাঁর অমন খ্যাতির উৎস।' বার্তাবাহককে বলে দেওয়া হয়েছিল যে তার লোকজনের মধ্যে জবরদস্তির কোন নযীর পাওয়া গেলে তার শাস্তি হবে চরম। যেই-মাত্র এই বার্তা সৈয়দ খানের কাছে পৌছল, খোজা সাদেকের হাতে সে লিখে পাঠাল, যদি কখনও সে নিজে কিংবা তার আজ্ঞাবাহী কোন ব্যক্তি জুলুমি অথবা অবিচার করে, তাহলে তার মাথা কাটা যাবে। এই অনুজ্ঞাপত্র লিখে খোজার হাতে দিয়ে সে আমার কাছে পাঠিয়ে দিল।

ভারবাহী পশুদের নিয়মিত দানাপানি দেওয়ার জন্য আমি একজন ফৌজদার নিয়োগ করলাম। আমার তাবে হাযার হাতী আছে সেই হাতীর প্রতিটি ডিভিসনের জন্য একজন করে ফৌজদার। আমি দেখেছি যে আমার সরকারের অধীনে যত হাতী আছে তা গণনা করা সহজ নয়; কিন্তু যুদ্ধক্ষেত্রে দুশমনের বিরুদ্ধে লড়াই করার উপযোগী মাত্র বার হাযার হাতী আছে। এর সঙ্গে আছে ছোট আকারের এক হাযার হাতী, সেগুলি বড় হাতীদের দানা সরবরাহে দরকার লাগে। এদের বাদে আছে এক লক্ষ হাতী, এগুলো আমহারা বহন করে থাকে, আমহারা হচ্ছে আচ্ছাদিত পাল্কীর মত, শাহী পরিবারের মহিলাদের বহনে এদের দরকার। আর নয়তো শাহী মালপত্র এইসব হাতী বহন করে। শাহী মালপত্রের মধ্যে আছে রূপার হাড়িপাতিল, কার্পেট, শাহী বালাখানার আরও নানারকম জিনিসপত্র। এই প্রসঙ্গে আমার আরও কিছু বলবার আছে, সে হচ্ছে এই পিলখানা সংরক্ষণের জন্য বৎসরে ব্যয়ের পরিমাণ কমপক্ষে চারশো ষাট লক্ষ আশরফি[৯], অবশ্য তাদের তদারকের জন্য লোকজনের খরচ বাদে। প্রতিটি হাতীর তদারকের জন্য দরকার পনের জন লোকের; আর হাযার হাতীর পিলখানার জন্য এক হাযার প্রহরী।

এই প্রসঙ্গে আর একটি ঘটনার উল্লেখ করে আমি প্রসঙ্গটিতে যবনিকা টানব। একদিন আমার পিলখানার জনৈক ফৌজদার আমাকে এসে বলল আহম্মদী

---

৯. এটা অত্যুক্তি ছাড়া আর কিছুই নয়, তার কারণ এই অঙ্ক উনষাট মিলিয়ন স্টার্লিং-এর সমান। আমরা ধরে নিয়েছিলাম আশরফি পনের টাকার সমান; কিন্তু আশরফির ক্ষুদ্রমান আরও নীচু। আবুল ফজল তার ইতিহাসের এক জায়গায় উল্লেখ করেছেন, আশরফি নয় টাকার সমান। তাহলেও অঙ্কের পরিমাণ দাঁড়ায় গিয়ে সতের মিলিয়ন স্টার্লিং। যদি ধরে নেওয়া যায় কম করেও হাতী-পিছু মাসে খরচ পড়ে তিরিশ টাকা, তাহলে বার হাযার হাতীর খরচ পড়বে তিন লক্ষ ষাট হাযার টাকা। মোটকথা হাতীর বর্ণনা কালে নয়তো তাদের লালনপালনের অঙ্ক বর্ণনায়, অতিরঞ্জন এসে গেছে। তার জন্য দায়ী খুব সম্ভব পাণ্ডুলিপি নকল-নবিশ।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

হোসেনী বেগের পুত্র সুলতান আহমদ একটি প্রথম শ্রেণীর হাতী জীয়নখান কোকার পুত্র সুক্কুর আল্লা বেগের কাছে ষাট হাজার আশরফিতে বিক্রী করেছে। এই খবর শুনে আমি প্রথম ভেবেছিলাম সুলতান আহমদকে হাতীর পায়ের নীচে পিষে মেরে ফেলার কথা। তার কারণ বিশেষ এক অনুশাসনে আমি নির্দেশ দিয়েছিলাম যে অমন শ্রেণীর হাতী রাষ্ট্রের প্রয়োজন ছাড়া বিক্রী অথবা ক্রয় করা চলবে না। এ ধরনের কোন ঘটনায় আল্লাহর বান্দাকে মৃত্যুদণ্ড দেওয়ায় ঘৃণাবোধ হওয়ায়, দোষ আমি মার্জনা করে দিলাম এবং ভাবলাম লোকটি আসলে ভালই করেছে, কারণ ব্যক্তি মাত্রেরই তার সম্পত্তির মালিক হওয়া উচিত। আমার উদ্দেশ্য ছিল যে, এই ধরনের খবর যেন আমার কাছে উপস্থাপিত না করা হয়। তার দরুন আমি ফৌজদারকে নিন্দুক বলে ভর্ৎসনা করলাম এবং বললাম ভবিষ্যতে আমার কাছে সে যদি ঐ ধরনের কোন বিষয় উপস্থাপিত করে, তাহলে তাকে আমি সমুচিত দণ্ড প্রদান করব।

আমার পিতার শাসনকালে বোখারাবাসী শেখ ফরিদ মীর বখশীর কাজ করতেন। তার নিযুক্তি আমার অনুমোদন পেল। প্রথামত তাকে আমি সম্মানসূচক পোশাক ও মণিমাণিক্যের কাজ করা তরবারি দানে ভূষিত করলাম। তার গুণাবলী সম্পর্কে আমি যে উঁচু ধারণা পোষণ করি, তার নযীর হিসাবে তাকে লেখনী কিংবা অস্ত্র চালনায় সমভাবে দক্ষ বলে করেছিলাম অভিহিত। মকিম খানকে উযীর খান উপাধি দেওয়া হয়েছিল, আমি তা অনুমোদন করে উযীরের কার্যাবলীর ভার তাকে সমর্পণ করেছিলাম। আমার পিতা অবশ্য উযীর খান উপাধি তাকে দান করেছিলেন। খাজুকী ফতেউল্লাকে আমার গৃহের খাদ্যাদি তদবিরের গোমস্তা নিযুক্ত করলাম। আবদুর রাজ্জাক মানমুরীকে (স্থপতি) যে কিনা আগে আমার চাকরি ছেড়ে আমার পিতার আশ্রয় ভিক্ষা করেছিল এবং যাকে আমার পিতা বখশীর পদে উন্নীত করেছিলেন, তাকে আমার সেনাবাহিনীতে একই পদমর্যাদা দিলাম, সেই সঙ্গে তাকে খিলাৎ দানে ভূষিত করেছিলাম। মোটকথা, রাজবাড়ির ভিতরে কিংবা বাইরে যারা আমার পিতার রাজদরবারে বিশ্বস্ত অথবা সম্মানের পদমর্যাদায় বরিত ছিলেন, তাদের সবার চাকরি শুধু আমি অক্ষুণ্ন রাখলাম তাই নয়, তাদের পদমর্যাদাও বৃদ্ধি করে দিলাম।

আবদুল হামিদ মেওর ছিলেন প্রতিকৃতিচিত্রক। তাঁর পুত্র শরীফ খান ছেলেবেলা থেকে আমার সঙ্গে বড় হয়েছে। শাহযাদা থাকা কালীন তাকে আমি খান উপাধি দিয়েছিলাম। সেই শরীফ খানকে সাম্রাজ্যের প্রধান উযীর আমীর-উল-উমরাহা মর্যাদায় করলাম ভূষিত। আমার প্রতি তার ঐকান্তিক অনুরাগই তার কারণ। সেই অনুরাগও মাত্রাহীন। তার দরুন আমি বুঝে উঠতে পারি না তাকে ভাই, বন্ধু, পুত্র কিংবা সঙ্গী অথবা ইয়ার দোস্ত, কি হিসাবে দেখব না তা নয়, আমার শরীরের যেকোন অঙ্গের মত সে আমার প্রিয়। মোটকথা, আমার বিচারে, আমার বিশাল সাম্রাজ্যের সেনাবাহিনীতে কি প্রতিভায় কি অভিজ্ঞতায় তার সমকক্ষ আমার চোখেত পড়ে না। তবুও আমি বলছি, তার গুণপনা সম্পর্কে

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

আমার যা ধারণা সেই অনুরূপ পদমর্যাদা, সম্মান, কোনকিছুই বহুদিন ভেবেও আমি ঠিক করে উঠতে পারিনি। এখানে উল্লেখ্য যে আমার পিতার শাসনকালে সবচেয়ে বড় আমীরকেও পাঁচ হাযার অশ্বারোহীর বেশি অধিনায়ক করার নিয়ম ছিল না। তার কারণ, সেই ব্যক্তি অত লোক-লস্কর দেখে সম্রাটের দুর্বলতার সুযোগ নিয়ে বিশ্বাসঘাতক বনে যেতে পারে ও বিদ্রোহের নিশান উত্তোলিত করতে পারে। আমার পিতার শাসনব্যবস্থার এই বিধিটি অটুট রাখা সঙ্গত বিবেচনা করে তার পদোন্নতি পাঁচহাযারীতে সীমাবদ্ধ করে দিলাম। তবু আমার মনে হল সাম্রাজ্যের প্রথম মন্ত্রীর পদমর্যাদার সঙ্গে পাঁচহাযারী অধিনায়কত্ব কেমন যেন মানান সই নয়। তাই তাকে জানালাম, আমার যা আছে সবকিছুই তার; আর পদমর্যাদা সম্পর্কে আমি খুশী হয়ে তাকে যে সম্মানে ভূষিত করেছি, তা নিয়ে সে সন্তুষ্ট থাকল। তাছাড়া, সে বারবারই আমাকে আশ্বাস দিল যে সরকারী চাকরি করা কালীন সে আমার কাছ থেকে পাঁচ হাযারের বেশী পদমর্যাদা কিছুতেই গ্রহণ করবে না। তার এই কথা আমি অনিচ্ছায় মেনে নিলাম।

এই প্রসঙ্গে আমি আরও বলতে চাই যে, সিংহাসন নিয়ে সেই সংকট কালে যখন আমি এলাহাবাদ থেকে আমার পিতার এলাকায় ফিরে আসি, যে সকল আমীর সঙ্গে ছিল, তাদের ভেতর শরীফ খানের বিশ্বস্ততা সম্পর্কে আমি ছিলাম একেবারেই নিশ্চিত। সিংহাসনে আরোহণ করার ষোল দিন পরে সে যখন তার আনুগত্য নিবেদন করতে এল, সত্যি কথা বলতে কি, যেদিন সে আমার সামনে এসে হাজির হল, মনে হল আল্লাহ্ যেন আমাকে পুনর্জীবন দান করেছেন। আমার বোধ হল ভাগ্য আমার সুপ্রসন্ন। আমার মনে হতে লাগল আমীর-উল-উমরাহের সান্নিধ্য লাভ করে যথার্থই আমি যেন আমার প্রজাকূলের সম্রাট হতে পেরেছি; যদিও সে সময় কোন সন্দেহ কিংবা বিপদাশংকা আমার মনে জাগেনি, তবু এই বিশ্বাস ছিল জীবন বিপন্ন করেও শরীফ খান আমাকে রক্ষা করবে। আল্লাহ অবশ্য তাঁর সৃষ্ট জীবের রক্ষাকর্তা; তবু বাদশাহদের জন্য আত্মজ্ঞানই সবচেয়ে দরকারী। আমীর-উল-উমরাহের আমার সম্পর্কে অনুরাগের শুদ্ধতা সম্বন্ধে আমি এতই নিশ্চিত ছিলাম যে, যেদিন তাকে বাংলাদেশের শাসনকর্তা করে পাঁচহাযারী অধিনায়কত্ব ও বিশাল জয়ঢাক ও পতাকা দিয়ে আমার সম্মুখ থেকে বিদায় দিলাম, সেদিনটি আমার জীবনের সবচেয়ে শোকের। এই প্রসঙ্গে এটুকু শুধুমাত্র উল্লেখ করব যে শরীফ খানের পিতা শিরাজের অধিবাসী এবং তার পিতামহ ছিলেন নিযাম-উল-মুলক; যিনি ছিলেন শিরাজের বাদশাহ শাহ্ সুজার উযীর। তাঁর পিতা ছিলেন আমার পিতামহ হুমায়ূনের ঘনিষ্ঠ সহচর, তাছাড়া তিনি আমার পিতার দরবারের বেশ কয়েকটি উচ্চ পদে অধিষ্ঠিত ছিলেন। তিনি তাঁর মাতার দিক থেকে ছিলেন রসূল করীম (দঃ)-এর বংশধর। এই সবের বিশদ বর্ণনা অবশ্য জাফরনামা ও মুতলা-উল-সাদিন-এ পাওয়া যাবে।

কতগুলি দিক বিবেচনা করে, কিছুদিন পর আমি রাজা মানসিংহকে পুনরায় বাংলার সুবাদার নিযুক্ত করলাম। যদিও আমার কাছ থেকে অমন অনুগ্রহ লাভ

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

করা তার পক্ষে আশার অতীত। সেইসঙ্গে তাকে আমি খেলাৎ দিলাম এবং মণিমুক্তা বসান ছুরি আর খোকপারা নামক ঘোড়া তাকে দিলাম উপহার। ঐ ঘোড়াটি আমার সহস্র-আশরফি আস্তাবলের সবচেয়ে উত্তম। আমার পিতার সরকারের ঘনিষ্ঠ সান্নিধ্যে যে সব রাজপুত নায়করা আসেন, তাদের প্রথম হচ্ছেন ভারমল, রাজা মানসিংহের তিনি ছিলেন পিতামহ, শৌর্যে, বিশ্বস্ততায় ও সত্যবাদিতায় ছিলেন তার গোত্রে খ্যাতিমান। প্রগাঢ় অনুগ্রহের নিদর্শন হিসাবে আমার পিতা রাজা ভারমলের কন্যাকে তাঁর প্রাসাদে পালনের জন্য নিয়ে আসেন। পরে সেই কন্যার সঙ্গে আমার বিবাহ দেওয়া হয়। এই রাজকুমারীর গর্ভে আমার পুত্র খসরুর জন্ম হয়। তখন আমার বয়স মাত্র সতের। তার বয়স এখন কুড়ি। আল্লাহ্ করুন তার সহস্র বছর পরমায়ু হোক। তার চালচলনে এখন পর্যন্ত আমি সন্তুষ্ট। আমার বিশ্বাস আছে ভবিষ্যতেও তার ব্যবহার অমন থাকবে আজ পর্যন্ত তার কাছ থেকে গভীরতম বিশ্বস্ততা ও সহবৎ ছাড়া আর কিছু পাইনি[১০]। আমার প্রথম সন্তান অবশ্য খসরুর এক বোন, তাদের একই জননী, সে খসরুর এক বছরের বড়।

খসরুর জন্মের পর কাসবারের শাহযাদা সুলতান সুরঙ্গের পুত্র সাঈদ খানের কন্যার গর্ভে আমার এক কন্যাসন্তান জন্মে, যার নাম আমরা রেখেছিলাম ওফাত বানু বেগম। তিন বছর বয়সে মেয়েটি মারা যায়। সেই কন্যার পর জীন খান কোকার ভাইঝি সাহেব জামালের গর্ভে কাবুলে আমার এক পুত্রসন্তান জন্মে, আমার পিতা তার নামকরণ করেছিলেন পারভেজ। আল্লাহর কাছে একটি প্রার্থনা, তার যেন দীর্ঘ পরমায়ু হয়। তার কাজের ঐকান্তিকতা ও চরিত্রের দৃঢ়তার জন্য তার কাছ থেকে আমার প্রত্যাশা অপরিসীম। যে কাজে আমি প্রথম তাকে পাঠাই সে হচ্ছে উদয়পুরের রানার বিরুদ্ধে এবং কাজের ধরনটি ধর্মভিত্তিক। দু'বছর হল তাকে সেখানে পাঠান হয়েছে। এটা সত্যিই সন্তোষজনক যে, যে সব আমীরদের তার কর্মাধীন করে পাঠান হয়েছিল তারা সবাই তার ব্যবহারে সন্তুষ্টি প্রকাশ করেছে। তার সঙ্গে আছে প্রায় বিশ হাযার অশ্বারোহী। তাদের প্রত্যেককে দেওয়া হয়েছে অতিরিক্ত তিনটি ঘোড়া।

এরপর লাহোরের কাছাকাছি পার্বত্য অঞ্চলের শক্তিশালী রাজা দীরাকুমের দুহিতার গর্ভে আমার এক কন্যাসন্তান জন্মগ্রহণ করে। তার নামকরণ আমি করেছিলাম দৌলতুন্নিসা বেগম। মেয়েটি মাত্র সাত মাসে মারা যায়। রায়পুর পরিবারের বিবি করিমতির গর্ভে আমার আর একটি কন্যাসন্তান জন্মে, যার নাম আমি রেখেছিলাম বাহার বানু বেগম। মেয়েটি মাত্র দু'মাস বেঁচেছিল। পরের সন্তানটি জন্মে জগৎ গোস্বামীর গর্ভে। তিনি রাজা অধিসিংহের কন্যা। রাজা অধিসিংহের

---

১০. ছ'মাস না ফুরুতেই আমরা দেখব লেখকের বিরুদ্ধে তাকে বিদ্রোহ করতে।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

ছিল আশি হাযার ঘোড়া। হিন্দুস্তানের রাজাদের মধ্যে তাঁর মত ক্ষমতাবান খুব কমই ছিল। তাঁর বনিতার গর্ভে আমার আর একটি কন্যাসন্তান জন্মগ্রহণ করে। তার নাম বেগম সুলতান কিন্তু এক বছর না হতেই মেয়েটি মারা যায়। সাহেব জামাল লক্ষ্ণৌর রাজার মেয়ে। তার গর্ভে আমি একটি কন্যাসন্তানও লাভ করি। কন্যাসন্তানটি মাত্র সাতদিন বেঁচে ছিল। মোটা রাজার[১১] মেয়ে জগৎ গোস্বামী। তার গর্ভে আমার পুত্র খুর্‌রম[১২] জন্মগ্রহণ করে। খুররম বুদ্ধিদীপ্ত, তার সম্পর্কে আমার আশা অনেক উঁচু। আল্লাহ্ চাহেত আমার এই পুত্রটি তার গুণাবলীর দরুন প্রগতিশীল মনোভঙ্গীর অধিকারী হবে, তার কারণ সব ব্যাপারেই সে সুবিবেচক। আমার পিতার যত্ন ও মনোযোগের দিক থেকে আমার সব ছেলেকে সে গিয়েছিল ছাড়িয়ে। তার দরুন তিনিও তাকে সবার চেয়ে বেশী ভাল বাসতেন। আমার পিতা প্রায়ই আমাকে বলতেন যে ছেলেটির ভিতর তিনি এমন সব গুণাবলীর লক্ষণ দেখেছেন যা কিনা আমার অন্যান্য সন্তানে নেই। সম্ভবত সবার ছোট বলে সবারই আদরের পাত্র সে হয়ে উঠেছিল।

খুররমের পর কাশ্মীরের যুবরাজার মেয়ের গর্ভে আমার আর একটি কন্যাসন্তান জন্মে। যুবরাজ ছিলেন যোগী সম্প্রদায়ভুক্ত। কন্যাসন্তানটি এক বছর বয়সে মারা যায়। তারপর, ইব্রাহীম হোসেন মীর্জার মেয়ে শাহী বেগমের গর্ভে আমার আর একটি কন্যাসন্তান জন্মে। সন্তানটি আট মাসেই মারা যায়। ইব্রাহীম হোসেন মীর্জা ছিলেন মীর্জা কামরুনের জনৈকা কন্যার পক্ষের নাতি। ফের পারভেজের মা সাহেব জামালের গর্ভে আর একটি কন্যাসন্তান হয়। সন্তানটি পাঁচ মাসে মারা যায়। সেই মেয়ের পর, খুররমের মা জগৎ গোস্বামীর গর্ভে আমার যে কন্যাসন্তান হয়, তার নাম আমি রেখেছিলাম, লজ্জাতুন্নিসা বেগম; কিন্তু মেয়েটি মাত্র পাঁচ বছর বয়সে মারা যায়। ফের পারভেজের মার গর্ভে আমার আর একটি পুত্রসন্তান জন্মগ্রহণ করে। আমার সিংহাসনে উপবেশনের পর তার নাম দেওয়া হয়েছিল জাহানদার। সবশেষে, খুররমের মার গর্ভে আমার আর একটি পুত্র সন্তান জন্ম নেয়, যার নামকরণ করা হয়েছিল শাহরিয়ার। দুটি সন্তানই একই মাসে ভূমিষ্ট হয়েছিল।

আগেই উল্লেখ করা হয়েছে, বৈবাহিক[১৩] সূত্রে রাজা মানসিংহের প্রভাব অত্যন্ত বৃদ্ধি পেয়েছিল। আমার পিতার সরকারে তাঁর প্রতিপত্তি এত বৃদ্ধি পেয়েছিল যে তাকে ছয় মাস দরবারে, ছয় মাস তার জায়গীরে থাকার অনুমতি দেওয়া হয়েছিল। তার ঐশ্বর্যের প্রাচুর্যের নযীর হিসাবে এটুকু উল্লেখ যথেষ্ট হবে যে, যখনই তিনি আমার পিতার সামনে হাযির হতেন, তখন নযরানা হিসাবে তিনি

---

১১. মোটা রাজা অধিংসিহের পদবী।

১২. পরে ইনি সম্রাট শাহজাহান নাম নিয়ে সিংহাসনে বসেছিলেন।

১৩. খুব সম্ভব রাজা ভারমলের কন্যা তাঁর বোন। তিনি জাহাঙ্গীরের জ্যেষ্ঠ পুত্র খসরুর জননী।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

যে অর্থ ভোট দিতেন তার পরিমাণ কখনও দু'লক্ষ আশরফির কম হত না এবং প্রতিটি আশরফি পাঁচ মিসকাল পরিমাণের[১৪]। পিতামহ ভারমলের কীর্তি ছাড়িয়ে যাওয়ার দরুন, হিন্দুস্তানের নৃপতিদের মধ্যে রাজা মানসিংহের সাথে তুলনা করার মত আর কেউ নেই।

আর একটি প্রসঙ্গের উল্লেখ না করা অনুচিত হবে বলে আমি মনে করি। পাঞ্জাবের শাসনকর্তা সাঈয়িদ খান ছোট একটি চিরকুটে এই অনুরোধ করে পাঠালেন যে, মীর্জা জান বেগের ছেলে গৌস বেগকে তার কাছে সত্বর আমি যেন চলে আসার অনুমতি প্রদান করি, কারণ সাইয়িদ খান তাকে পোষ্যপুত্র বলে গ্রহণ করেছে। আমি তাকে লিখে পাঠালাম যে, আমার পিতা আকবর গৌস বেগের সঙ্গে বৈবাহিক সম্পর্ক স্থাপন বিষয়ে প্রাথমিক কথাবার্তা চালিয়েছিলেন, যাতে করে তার বোনের সঙ্গে আমার পুত্র খসরুর বিয়ে হয়। কথাবার্তা স্থিরীকৃত হলে তাকে চলে যাওয়ার অনুমতি প্রদান করা হবে। যার প্রসঙ্গ এখানে উল্লেখ করা হয়েছে, সেই সম্পর্কে আমার ব্যাখ্যা করা উচিত বলে মনে করি। মীর্জা জান অথবা জানি বেগ হচ্ছে ফাহিন্দা মুহম্মদের পুত্র। ফাহিন্দা মুহম্মদ মীর্জা বাকীর পুত্র, মীর্জা বাকী মীর্জা আবীর পুত্র এবং মীর্জা আবী আবদুল আলী তেরখানের পুত্র। সুলতান মীর্জার সময়ে আবদুল আলী ছিলেন বোখারার শাহযাদা। তার অধীনস্থ অসংখ্য রাজার মধ্যে ছিলেন উজবুকদের নৃপতি বিখ্যাত শাহী বেগ খান এবং তার বহু আত্মীয়বর্গ। আবদুল আলী তেরখান, তাছাড়া শুকী বেগ তেরখানের বংশধর। শুকী বেগ যখন নিতান্তই শিশু, তখন তাকে অজেয় তৈমুর এই উপাধি দানে ভূষিত করেন। তক্তমেশ খানের সঙ্গে যুদ্ধে নিহত হয়েছিলেন তৈমুরের পিতা ইগু তৈমুর। তারা আরগুন খান গোত্রের লোক। সেজন্যই তাদের পদবী তেরখান ও আরগুন।

রাজা মকসুদ খানের পক্ষ থেকে আমার কাছে একখানি নিবেদনপত্র উপস্থাপিত করা হয়েছিল। মকসুদ খান মকসুস খানের পুত্র। বাংলা ও বিহারের বিদ্রোহে মকসুদ খান এতদিন লিপ্ত ছিলেন। আমি সেই পত্রের জবাব এভাবে দিতে বললাম যে, আমার সন্তোষ লাভ করার মত মানসিক অবস্থা যখন তার নেই, তখন তাকে স্বাধীন শাসক হিসাবে মেনে নেওয়া অথবা সে ব্যাপারে উৎসাহিত করা সম্ভব নয়।

ধর্মজ্ঞ লোকদের এক কমিশন বসিয়ে তাদের আমি নির্দেশ দিয়েছিলাম তারা যেন আমার জন্য আল্লাহ্‌র নামাবলী সংকলন করে দেন। যতটুকু সম্ভব চেষ্টা করে তারা আমাকে পাঁচশো বাইশটি নামের এক তালিকা প্রস্তুত করে দিয়েছিল। ঐ তালিকাটি আমার মহান পিতার পবিত্র তসবীহ্‌ মালার ঠিক দ্বিগুণ। বিশটি আবজেদে অর্থাৎ বর্ণানুক্রামক সূচীতে তারা এ নামাবলী ভাগ করে দেন। আমার

১৪. আশরফির মূল্যমান খুবই গোলমেলে বলে সঠিক ভাবে কিছু বলা এখনও সম্ভব নয়। আবুল ফজলের ইতিহাসের দ্বিতীয় খণ্ডে আশরফির মূল্যমান নয় টাকার সমান বলে উল্লেখ করা হয়েছে। এ প্রসঙ্গে উল্লিখিত অর্থের পরিমাণ আঠার লক্ষ টাকা।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

অঙ্গাবরণে ঐ নামাবলী আমি উৎকীর্ণ করিয়ে নেই। প্রতি শুক্রবার আমি বিজ্ঞ, পুণ্য ও ধর্মজ্ঞ ব্যক্তিদের সান্নিধে কাটাতাম। সিংহাসনে আরোহণ করার ঠিক এক বছর আগে আমি এই ব্রত গ্রহণ করেছিলাম যে, বিকালে, কখনই, আমি পানীয় কিংবা কোন উত্তেজক কিছু গ্রহণ করব না। আল্লাহ্ করুন যাতে করে আমি জীবনের শেষদিন পর্যন্ত এমন কি রোযকেয়ামত তক, এই ব্রতে অবিচল থাকতে পারি। এখন পর্যন্ত আল্লাহর ইচ্ছায় আমি ব্রতে অটল আছি। জীবনের অন্তিম অবধি তাঁর ইচ্ছায় আমি যেন অটল থাকতে পারি।

আমি আমার নিকটতম পার্শ্বচরদের বলে দিলাম যে, যদি কখনও তারা দেখে তাদের ভাতা মর্যাদানুযায়ী হচ্ছে না এবং তা আমার দৃষ্টি এড়িয়ে গেছে, সেক্ষেত্রে তারা যেন তাদের অসুবিধা আমাকে জ্ঞাপন করে যাতে করে প্রয়োজন অনুযায়ী তাদের ভাতা বাড়িয়ে দেওয়া হয়। আমি আদেশ জারী করলাম এই বলে যে, যতদিন পর্যন্ত আমার পিতার শোক-সময় অতিক্রান্ত না হচ্ছে, ততদিন জনসাধারণ যেন সূফীদের মত জীবনযাপন করে। আমি আরও নির্দেশ দিলাম, ঐ সময়ের আমার রাজ্যে আদি অনুষ্ঠানে কোন প্রকার ঢাক-ঢোল কিংবা কোন প্রকার সঙ্গীতের আয়োজন না করা হয়। যদি কেউ অন্যথা করে, তাহলে চরম শাস্তি তাকে দেওয়া হবে।

এই নির্দেশনামা বলবৎ থাকা কালে আমি খবর পেলাম যে, জনৈক হাকিম আলী তার পুত্রের বিবাহ অনুষ্ঠানের আয়োজন করেছে এবং সেই অনুষ্ঠানে কাযীর উপস্থিতিতে তার বাড়িতে কিলিজী খান্দের বাদক দলকে ডেকে এনেছে। বস্তুত সারা শহরে কোলাহল ধ্বনিত হচ্ছে। মুহম্মদ তকীকে তার কাছে এই কথা স্মরণ করিয়ে দেবার জন্য পাঠালাম যে, আমার পিতার বদান্যতার ঋণ তার অসীম বলে স্বভাবতই আশা করা গিয়েছিল যে অন্য সবার চেয়ে দুঃখ, শোক ও লজ্জায় সে অভিভূত হয়ে যাবে। তার পুত্রের বিবাহ ও উৎসবের আয়োজন করার আর কি কোন সময় সে খুঁজে পেল না? যখন বার্তাবাহক গিয়ে উপস্থিত হল তখন সবাই হর্ষ ও উল্লাসে মত্ত। কৌতুকপ্রদ ব্যাপার এই যে যেইমাত্র বার্তা পেশ করা হল তখনই দেখা গেল উদ্‌ভ্রান্তি ও হতাশার পটপরিবর্তন। ভাবনাহীন অমন উল্লাসের দরুন দারুণ অনুতপ্ত হয়ে সেই হাকিম আলী এক লক্ষ টাকা মূল্যের মুক্তার একখানি মালা ভেট দেয়। সেই মুহূর্তে আমি মালা গ্রহণ করতে রাজী হলাম; কিন্তু কয়েকদিন বাদে তাকে আমি ডেকে এনে তার গলায় মালা ছুড়ে দিলাম। সত্য কথা বলতে কি, কোন প্রজার কাছ থেকে উপঢৌকন নেওয়া আমার পক্ষে সম্মানজনক নয়; বরং তাদের চোখ সব সময় আমার হাতের দিকে থাকা উচিত এবং যতক্ষণ পর্যন্ত আমার সামর্থ আছে, ততক্ষণ পর্যন্ত প্রত্যেকের গুণানুযায়ী পুরস্কার ও অনুগ্রহ আমারই বিতরণ করা প্রয়োজন।

আমি মুহম্মদ খানকে সবেমাত্র পাঞ্জাবের শাসনকর্তা হিসাবে নিযুক্ত করেছি। এক লক্ষ টাকা সেই সঙ্গে বহুমূল্য হীরক ও মণিমাণিক্যখচিত পোশাক, তরবারি, কোমরবন্ধ এবং ছুরি দান করলাম। এই নায়কটি ফেরা অঞ্চলের খান বংশের।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

প্রায় একই সময়ে আমি মুহম্মদ রেজাকে পঞ্চাশ হাযার টাকা দিয়ে দিল্লী ও নিকটস্থ পবিত্র এলাকার গরীব বাশিন্দাদের ভিতর বিতরণের জন্য পাঠিয়েছিলাম। আমি উযীর খানকে সাম্রাজ্যের উযীর পদে নিযুক্ত করলাম, যদিও রক্তের দিক থেকে সে শাহাযাদা পর্যায়ে পড়ে, যদিও তাকে উযীর-উল-মুলক পদবিতে আগেই ভূষিত করেছি এবং তাকে এক শত অশ্বারোহীর অধিনায়কত্ব থেকে পাঁচহাযারীতে উন্নীত করেছি।

এ কথা মনে রাখা দরকার শেখ ফরিদ বোখারী শেখ জালালের বংশধর। শেখ জালাল ছিলেন মুলতানের শেখ বাহাউদ্দীন জাকারিয়ার একজন বিখ্যাত শিষ্য। শেখ ফরিদের উর্ধ্বতন চতুর্থ পুরুষ হচ্ছেন দিল্লীর সৈয়দ আবদুল গফুর। তিনি তাঁর সন্তানদের বলে গিয়েছিলেন যে তারা যেন কখনও সরকারী চাকরী গ্রহণ না করে। কঠোর সামরিক জীবনই যেন তাদের লক্ষ্য হয়। বোখারার সৈয়দদের ভিতর তারা খুবই নামী। শেখ ফরিদ পূর্বে চারহাযারী মনসবদার ছিলেন; কিন্তু তাঁকে বাদ্য ও পতাকাসহ পাঁচহাযারী মনসবদারে আমি উন্নীত করে দিলাম।

মীর্জা সুলতান হোসেনীর পুত্র কান্দাহারের শাসনকর্তা মীর্জা রুস্তম, বৈরাম খান খিজিলবাসের (লাল টুপি)[১৫] পুত্র আবদুর রহীম খান, যার পদবী খানখানান এবং আবদুর রহীম খানের দুই পুত্র ইরিজ ও দারাব। মীর্জা আলী বেগ আকবর শাহী পরিবারের শের খোজাকে তাদের পদমর্যাদা অনুযায়ী খিলাৎ, মণিমুক্তা খচিত তরবারি ও সুসজ্জিত অশ্ব উপঢৌকন দিয়েছিলাম। অন্যদিকে আবদুর রহমান বেগের পুত্র বিনা অনুমতিতে উপস্থিত হওয়ার দরুন আমি রুষ্ট হয়ে তাকে ফিরে যাওয়ার আদেশ দিলাম। কারণ উৎসাহের বড় লক্ষণ চাটুকারিতা নয়, আনুগত্য।

কাবুলবাসী লালা বেগ আমার সিংহাসনে আরোহণের আগেই আমার কাছ থেকে বজবাহাদুর উপাধি পেয়েছিল; কিন্তু সিংহাসনে আরোহণের মাসখানেক পর নযরানা জানাতে এলে তাকে আমি একহাযারী থেকে দুহাযারী মনসবদার পদে উন্নীত করে দিলাম এবং তাকে বাহার অঞ্চলের শাসনকর্তা নিযুক্ত করলাম। সেইসঙ্গে তাকে এক লক্ষ টাকা উপঢৌকন দিলাম। তার এলাকাভুক্ত সবাইকে জানিয়ে দেওয়া হল যে যদি কেউ তাকে অমান্য কিংবা তার ক্ষমতার বিরুদ্ধাচরণ করে, তাহলে বজবাহাদুর তাকে মৃত্যুদণ্ডে দণ্ডিত করতে পারবে। তার অধীনস্থ কর্মচারীদের তুলনায় তার জায়গীরের আয় যাতে বেশী হয় তার ব্যবস্থা করে দিলাম; কারণ এ কথা আমি কিছুতেই ভুলে যেতে পারি না যে সে সেই সৈনিক গোত্রভুক্ত যারা আমার পরিবারের কাছে সবচেয়ে বেশী বিশ্বস্ত। আমার একথা উল্লেখ করা উচিত যে তার পিতার পদবী ছিল নিযাম-ই-কাবাব। তিনি ছিলেন আমার চাচার চিরাগচী।

কাবুলের পরলোকগত মুহম্মদ হাকিম মীর্জার একমাত্র পুত্রকে আমি একহাযারী মনসবদার পদে উন্নীত করে দিলাম। পূর্বে সে পাঁচ শত অশ্বারোহীর

---

১৫. আকবরের প্রথম মন্ত্রী : উক্তিটি ফারসী ভাষায় যে-কোন লোকের জন্য প্রযোজ্য।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

অধিনায়ক ছিল। কাঞ্চন নামক জনৈক রাজপুত মারাঠাবাসীকে আমার প্রতি ঐকান্তিক আনুগত্যের দরুন তাকে আট শত থেকে পনের শত অশ্বারোহীর অধিনায়কত্বে উন্নীত করে দিলাম।

মীরন সদরউদ্দীন, যে আগে মাত্র তিন শত অশ্বারোহীর অধিনায়ক ছিল, তাকে একহাযারীতে উন্নীত করে দিয়েছিলাম। এই ব্যক্তিটি আমার পিতার আজ্ঞাবহদের অন্যতম প্রবীণ। যখন শেখ আবদুল নবী আমাকে 'চল্লিশ তরিকা' বিষয়ে শিক্ষা দিচ্ছিলেন, তখন ঐ ব্যক্তিটিকে রাজকীয় গ্রন্থাগারে নিয়োগ করা হলো। একথা বেশ জোরের সঙ্গেই বলতে পারি যে আমি তাকে ওস্তাদ হিসাবেই মান্য করতাম; কিন্তু আমার পিতার কাছে আমার শিক্ষক আবদুল নবীর স্থান ছিল, সবার উপরে। মখদু-মুল-মুলক, যাঁর আসল নাম শেখ আবদুল্লাহ, বিজ্ঞান, নীতিকথা ও কথকতায় তাঁর সমকক্ষ সে যুগে আর কেউ ছিল না। তিনি তখন বয়সে যথেষ্ট প্রবীণ। শের খান আফগান ও তাঁর পুত্র সেলিম খানের উপর তাঁর অসীম প্রভাব প্রথম জীবন থেকেই ছিল। তাছাড়া জ্যোতির্বিজ্ঞানে তাঁর সমকক্ষ কেউ ছিল না। তবুও আমার পিতার কাছে তাঁর নিয়তিনক্ষত্র উদ্ভাসিত হয়ে উঠতে পারেনি। শেষ-পর্যন্ত, শেখ আবদুল নবীরই কপালে শিকে ছিঁড়েছিল।

যখন হাকীম হাম্মামকে ট্রান্সসেক্সোনিয়ায় দৌত্য কাজে নিয়োগ করা হল, তখন মীরন সদর জাহানকে (যাকে পূর্বে সদরউদ্দীন বলে অভিহিত করা হয়েছে) উজবেকদের নৃপতি আবদুল্লাহ খানের পিতৃবিয়োগে শোকবহনকারী বার্তা নিয়ে পাঠান হয়েছিল। তিন বছর বাদে ফিরে এলে পর আমার পিতা তাকে সামরিক কাজে নিয়োগের যোগ্য বলে বিবেচনা করলেন। বিভিন্ন সময়ে তার পদোন্নতির দরুন দুহাযারী অধিনায়কত্বে সে এসে পৌঁছেছিল। সদরের বিশ্বস্ত কাজের ভারও তার উপর অর্পণ করা হয়েছিল। যতই পট পরিবর্তন হোক না কেন, শেষ অবধি আমি এই কথাই বলব মীরন সদর জাহান সবসময় আমার স্বার্থে নিবেদিত প্রাণ, শৌর্যবীর্যে সে কিছুতেই খাটো নয় এবং এ কথা যথার্থই বলা যায়, তার শৈশব থেকেই আমার জন্য তার হৃদয়ে অনুরাগের উৎসারণ ঘটেছিল। কৃতজ্ঞতা ও আনুগত্যের দাবী সে ঐকান্তিক ভাবেই পালন করে চলেছিল। শাহযাদা থাকাকালীন আমি তার দরকার মত যে-কোন পদে উন্নীত করার ব্যাপারে খোলাখুলি ভাবে সক্রিয় ছিলাম, ঋণ করলে, তার পরিমাণ যতই হোক না কেন, আমি পরিশোধ করে দিতাম। আল্লাহর ইচ্ছায় আমি সিংহাসনে আরোহণ করার পর, কথামত তাকে বলে পাঠালাম যে তার যে কোন একটি ইচ্ছা পূরণ করতে আমি প্রস্তুত আছি। সদর থেকে জবাব আসার পর, আমার সভার বখশীরা জানাল যে, যদি চারহাযারীর অধিনায়কত্ব তাকে দেওয়া হয়, তাহলে তার নিজের আয় থেকে তার পক্ষে ঋণ শোধ করা সম্ভব হবে।

অনুরোধ মত তাকে আমি চারহাযারী পদে উন্নীত করে দিলাম, যদিও এটা আমার নিজের তৈরী আইন-বিরুদ্ধ। কারণ, প্রথম পর্যায়ে কাউকেই এক শতের চেয়ে বেশী উচ্চতর পদে উন্নীত করা হবে না বলে ঠিক হয়েছিল। সত্যি কথা

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

বলতে কি, হৃদয় হচ্ছে নিবেদিত প্রাণতার উৎস, সেইজন্য অমন একটি বিশ্বস্ত হৃদয়ের অনুরাগ লাভ করা সৌভাগ্যজনক বলে আমি মনে করি যে হৃদয়ের মূল্য সহস্র তীর্থ দর্শনের চেয়েও অনেক বেশী। কোন ব্যক্তির সে মুসলমান কিংবা বিধর্মী যাই হোক না কেন, যথাযথ প্রত্যাশা পূরণে আমি কখনই উদাসীন হব না। অবশ্য তা যদি আমার সাধ্যে কুলায়। এই পৃথিবীর কালসমুদ্রের অতলে আমার মত হাযার হাযার লোক হারিয়ে গেছে। তাহলে এই অনতিক্রান্ত বর্তমানে কিছু ভাল কাজ করে যাওয়ার চেয়ে আর কি কাম্য হতে পারে, যার পুণ্য মৃত্যুর পর চিরদিন ধরে আমি যা ভোগ করে চলব? এই পৃথিবীতে মহৎ কাজ করে মানুষের যে প্রীতি লাভ করা যায়, তার মূল্য অপরিময়ে। নিজের কথা বলতে গেলে অকর্মণ্য উত্তরাধিকারীর হাতে মণিমুক্তাও অপরিমিত স্বর্ণের অপচয়ের চেয়ে কোন একজন ব্যক্তির হৃদয়ে হর্ষ সঞ্চার করা আমি বড় বলে মনে করি।

মনে রেখ আমার পুত্র, এই পৃথিবী স্থায়ী সম্পদ নয়। প্রত্যাশা কিংবা নির্ভরতার নিকেতন এটি নয়। তুমি কি শোননি যে, কি করে সুলাইমানের সিংহাসন বিচূর্ণিত হয়ে গিয়েছিল, সেই সুলাইমান সব যুগের আশীর্বাদ যার উপর। সেই অমিত সুখী যার জীবন জ্ঞান আহরণ ও ন্যায়ের চর্চায় কেটেছে, যার সব প্রয়াসই মানুষের আরামের জন্য উদ্যত, সেই কর্তব্য পরায়ণতার সম্মান তাঁর প্রাপ্য। বুদ্ধিমান লোকের সব উদ্যোগেই তাঁর ধর্মের প্রতি কর্তব্য পালনে নিয়োজিত; কিন্তু তুমি যত যাই কর না কেন, পৃথিবী তোমার মুঠি থেকে কেবলি সরে সরে যাচ্ছে। যা কিছু তুমি সঞ্চয় করেছ, যে-সব তোমাকে ফেলে চলে যেতে হবে, সে সব নয়, সেই সবই কাজে লাগবে যেগুলি তুমি কবরে নিয়ে যেতে পারবে। তোমার সব কাজেই যেন অভিজ্ঞ লোকের অনুমোদন লাভ করে, তার কারণ শিকারীর যেমন দক্ষতা আছে, তেমনি আছে বুড়া নেকড়ের চালাকিপনা। প্রতিদ্বন্দ্বীর সঙ্গে যদি তোমার বিরোধিতা করতেই হয়, তাহলে সাহসের সাথে তার বিরোধিতা কর, কারণ বাঘই একমাত্র সিংহের সঙ্গে লড়াইতে উপযুক্ত। তরুণ সৈনিককে ভয় কর না, যতই তার তরবারি তীক্ষ্ণ হোক না; বরং সতর্ক থেকে অভিজ্ঞ সৈনিক সম্পর্কে, তার দক্ষতা যুদ্ধক্ষেত্রে বহুবার প্রমাণিত। তরুণের হয়ত সিংহ অথবা হাতীর সঙ্গে লড়াইয়ের শক্তি থাকতে পারে, কিন্তু কোথায় তার সেই শৃগালসম চতুরতার অভিজ্ঞতা? পৃথিবীকে দেখে দেখেই মানুষ বিজ্ঞ হয়, গরম ও ঠাণ্ডা পর্যায়ক্রমে অনুভব করে করেই। যদি তুমি তোমার দেশকে সুখী ও সমৃদ্ধিশালী দেখতে চাও, তাহলে গুরুত্বপূর্ণ কাজের ভার হঠাৎ নবাবদের হাতে অর্পণ কর না। যেখানে বিপদের আশঙ্কা আছে সেখানে রণক্ষেত্রে পরীক্ষিত সৈনিকদের নিয়োগ কর। ঠিক ভাবে তালিম দেওয়া শিকারী কুকুর বাঘের সামনে লেজ গুটায় না, যেখানে সিংহ নেই সেখানে শৃগালও লড়াই করতে উদ্যত হবে। তোমার পুত্রকে মৃগয়ায় শিক্ষিত করে তুল, তাহলে যুদ্ধের সময় এলে ভয়কে সে কাবু করতে পারবে। সাহসী লোকও, বিলাসী জীবনে অভ্যস্ত হয়ে উঠলে, যুদ্ধের কথায় তার কাঁপুনি শুরু হয়ে যায়। দু'ধরনের লোকদের কিছুতেই যুদ্ধক্ষেত্রে

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

ঘোড়ার পিঠে আমাদের চড়তে দেওয়া উচিত নয়, যাদেরকে শিশুও বধ করতে উদ্যত হবে। সেই ধরনের লোকদের মধ্যে রয়েছে তারা, যাদেরকে তুমি যুদ্ধক্ষেত্রে পিছনে দেখেছ। দুশমনের হাত থেকে যদি তারা বেঁচেও যায়, তোমার নিজের উচিত হবে তাদের হত্যা করা। যে-সৈনিক যুদ্ধক্ষেত্রে মেয়েদের মত মাথা নিচু করে পালায়, তার চেয়ে সেও ভাল যে তার ভীরুতা স্বীকার করে নেয়।

মীর্জা গিয়াস বেগকে প্রশংসা করার মত ভাষা আমি খুঁজে পাচ্ছি না। আমার পিতার কালে গৃহাধ্যক্ষের উচ্চ পদের সঙ্গে তিনি একহাযারী মনসবদারে সম্মানও ভোগ করতেন। সিংহাসনে আরোহণের কিছুদিন বাদে তাঁকে আমি উজীরখানের জায়গায় দিওয়ানের পদে নিয়োগ করলাম, সেই সঙ্গে তাঁকে সাতহাযারী অধিনায়কত্ব, ইতমদ্দৌলা পদবী ও বিশাল ড্রাম এবং পতাকার স্মারক প্রদান করলাম। অঙ্কশাস্ত্রে এই যুগে তাঁর সমকক্ষ কেউ নেই। রচনা ও স্টাইলের উৎকর্ষতার দিক থেকে তিনি তুলনাবিহীন। সমালোচনায় তাঁর জ্ঞান, পূর্বতন যুগের নানারীতির কবিতার সঙ্গে তাঁর যোগাযোগ এবং এ সব কবিতা থেকে অবাধ উন্নতির ব্যাপারে তাঁর কোন প্রতিযোগী নেই। প্রায় সব দিওয়ানই তিনি সুন্দরভাবে লিখিয়ে সংরক্ষণ করেছেন; কিন্তু যে জিনিসটি বিশেষভাবে লক্ষণীয় ছিল তা হচ্ছে কবিতা আবৃত্তিকালে তাঁর মুখে হাসি প্রস্ফুটিত হয়ে উঠত। সে হাসির বিকিরণ সহস্র ইয়াকুতীর চেয়ে উজ্জ্বল। আমি শুধুই এটুকু উল্লেখ করতে চাই যে, যে সব রাষ্ট্রীয় কাজ তার অনুমোদন লাভ করেনি, তার ব্যর্থতা অনিবার্য। বিধিব্যবস্থার গোলমালের দরুন রাষ্ট্রীয় রেকর্ডে তাই সেগুলির নযীর থাকবে না[১৬]।

বলাই বাহুল্য, ইতমদ্দৌলাহ্ আমার স্ত্রী নূরজাহান বেগম ও আসফ খানের পিতা। পাঁচহাযারী মনসবদারী দিয়ে আসফ খানকে আমি লেফটেনান্ট জেনারেলের পদে নিয়োগ করেছিলাম। আমার হারেমের চারশো বাশিন্দাদের ভেতর নূরজাহান সবার সেরা। তাঁকে আমি ত্রিশ সহস্রের পদমর্যাদায় ভূষিত করেছিলাম। সাম্রাজ্যের এমন কোন শহর নেই যেখানে এই রাজপুত্রী তাঁর রুচি ও বদান্যতার স্বাক্ষর হিসাবে বিশালকায় ভবন কি বিস্তৃত বাগান তৈরী করেননি। বিয়ে করার ইচ্ছা না থাকার দরুন, তিনি আমাদের পরিবারভুক্ত প্রথমে হতে পারেননি; বরং আমার পিতার আমলে শের আফগানের সঙ্গে তাঁর বিয়ে হয়ে গিয়েছিল; কিন্তু যখন সেই নায়ক মারা গেল, তখন কাজী ডাকিয়ে তাঁকে আমি যথারীতি বিয়ে করে নিলাম এবং মোহরাণা হিসাবে তাঁকে দিয়েছিলাম আশি লক্ষ আশরফি[১৭]। প্রতিটি আশরফি পাঁচ মিসকাল পরিমাণের। এই অর্থ তাঁর গহনা কেনার জন্য একান্ত দরকার বলে তিনি অনুরোধ করেছিলেন দ্বিরুক্তি না করে আমি সেই অর্থ মঞ্জুর করে দিয়েছিলাম। তাছাড়া আমি তাঁকে চল্লিশ দানার একটি মুক্তার

---

১৬. এরপর ইতমদ্দৌলার প্রশস্তিসূচক পাঁচটি শ্লোক আছে। ক্লান্তিকর বলে তার উল্লেখ করা হল না।

১৭. সাত কোটি বিশ লক্ষ টাকা।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

নেকলেস উপঢৌকন দিয়েছিলাম। প্রতিটি দানার মূল্য চল্লিশ হাযার টাকা[১৮]। যে সময়ে এই স্মরণী লেখা হয়, তখন আমার গৃহের সম্পত্তি সোনা কিংবা হীরজহরৎ, সবকিছুই তার সম্পূর্ণ কর্তৃত্বাধীনে[১৯]। আমার সবকিছুই এই রাজকন্যার কতৃত্বাধীনে এবং এ কথা বলা আমার ভুল হবে না যে আমার সমগ্র সাম্রাজ্যের সবকিছুই গুণবান এই পরিবারটির হাতে, পিতা আমার দেওয়ান, পুত্র অসীম ক্ষমতা সম্পন্ন আমার সেনানায়ক এবং কন্যা আমার সর্বক্ষণের সঙ্গী।

এরপর আমি রাজা বিক্রমজিতের পুত্রকে, যার পদবী রায় রায়ান, আমার গোলন্দাজ বাহিনীর সুপারিনটেনডেন্ট পদে নিযুক্ত করেছিলাম এবং নির্দেশ দিয়েছিলাম, সাম্রাজ্যের বিভিন্ন স্থানে যে সব কামান কিংবা গোলন্দাজ ছড়িয়ে ছিটিয়ে আছে, সেইসব বাদে এই বিভাগে সর্বক্ষণের জন্য ষাট হাযার উষ্ট্রবাহিত কামান তৈরী থাকবে। বিশ বার দাগাবার জন্য প্রতিটি কামানের দশ সের বারুদ এবং বিশ হাযার আনুষাঙ্গিক জিনিসপত্র থাকবে। এই বিভাগের ব্যয় নির্বাহের জন্য পনেরটি পরগণা অথবা শহরের রাজস্ব আলাদা করে দিয়েছিলাম। ঐ রাজস্বের পরিমাণ এক লক্ষ টাকা। রাজকীয় শিবির যখন যেখানে থাকবে, এই জিনিসপত্র সেই শিবিরের সঙ্গে যাবে।

রায় রায়ান আমার পিতা আকবরের কালে কিছুদিনের জন্য দিওয়ানের পদে অধিষ্ঠিত ছিলেন। তাঁর পুরান অনুচরদের মধ্যে তিনি অন্যতম। তাঁর এখন বয়স হয়েছে, সেই অনুপাতে অভিজ্ঞতাও, বেসামরিক বিধিবিধানে যত না, তার চেয়ে বেশী সামরিক বিষয়ে। এ সব ব্যাপারে তাঁকে ওস্তাদ বলা যেতে পারে। অভিজ্ঞতার সঙ্গেই আমার পিতার আমলে তিনি প্রচুর স্বর্ণসম্পদের অধিকারী হয়েছিলেন। এত ধনসম্পদ তাঁর ছিল যে স্বশ্রেণীর হিন্দুদের ভিতরেও তাঁর সমকক্ষ কেউ ছিল না। যে সময়ে আমি লিখছি সেই সময়ে সবাই জানত যে তাঁর গোত্রভুক্ত শহরের গুটিকয় বণিকদের কাছে তাঁর দশ কোটি আশরফি[২০] গচ্ছিত আছে। পিলখানার অধ্যক্ষ থেকে তিনি এখন আমীর-উল-উমরাহ পদে ভূষিত হয়েছেন।

বোখারাবাসী সৈয়দ চাঁদের পুত্র সৈয়দ কামালের পদোন্নতি করার সুযোগ পেয়ে তাঁকে সাতশো থেকে একহাযারী মনসবদার করে দিলাম। হিন্দুস্তানের প্রাচীন রাজন্যবর্গের রাজধানী দিল্লী নগরী তাঁর জায়গীর বলে নির্ধারিত করে দিলাম। আফগানদের সঙ্গে যুদ্ধে পেশোয়ারে সৈয়দ কামালের পিতা মারা গিয়েছিলেন। খেরুন-ই-আজীমের পুত্র মীর্জা খোরেমকে আমি দুহাযারী থেকে তিনহাযারী অশ্বারোহীর অধিনায়ক পদে উন্নীত করে দিয়েছিলাম।

---

১৮. ষোল লক্ষ টাকা।

১৯. এর পরে আট কি নয় শব্দে যা লেখা আছে তার পাঠোদ্ধার কষ্টসাধ্য। তবে মনে হয় আফিং কিংবা বিক্রী বিষয়ক রাজস্ব প্রসঙ্গ ওখানে উল্লিখিত হয়েছে।

২০. নব্বই কোটি টাকা।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

হিন্দু বিধবাদের মধ্যে স্বামীর চিতায় সহমরণের যে প্রথা প্রচলিত আছে, সে সম্পর্কে আমি আগেই নির্দেশ দিয়েছিলাম যে, রাজী থাকলেও যে রমণী সন্তানের জননী তাকে আত্মোৎসর্গ করতে দেওয়া চলবে না। এখন আমি আরও নির্দেশ দিলাম, মানুষ যাই বলুক না কেন যে-ক্ষেত্রে সামান্যতম জোরজবরদস্তি প্রয়োগ হবে সে-ক্ষেত্রে এই প্রথা কিছুতেই চলতে দেওয়া হবে না। এ ছাড়া, ধর্মাচরণের অন্যান্য ক্ষেত্রে তাদের উপর জুলুম কেউ করতে পারবে না। যখন আমি ভাবি, আল্লাহ আমাকে তাঁর করুণাপুঞ্জের ছায়া করে পাঠিয়েছেন, তাঁর অসীম দয়া পৃথিবীর সব জীবের উপর সমভাবে ছড়ান, তখন মুহূর্তের জন্যও বিশাল জনসমষ্টিকে জবাই করার কথা ভাবা আল্লাহর করুণাপুঞ্জের বিরোধী বলে আমি মনে করি। তার কারণ, দুঃখজনক হলেও হিন্দুস্তানের জনসমষ্টির পাঁচ ষষ্ঠাংশ হিন্দু-ধর্মাবলম্বী, প্রতীক-পূজারী। ব্যবসায়-বাণিজ্য, তাঁত বোনা এবং অন্যান্য অর্থকরী শিল্প, সবই এই শ্রেণীর লোকদের হাতে। যদি কখনও তাদেরকে সত্য ধর্মে দীক্ষিত করার চিন্তা আমার মনে জাগেও, তাহলে তা অসম্ভব, কেননা তা করতে হলে সহস্র সহস্র লোকদের হত্যা করতে হবে। তারা তাদের ধর্মে এতই অনুরক্ত যে তাদের রচিত জালে তারা নিজেরাই জড়িয়ে থাকবে; পরকালের শাস্তির হাত থেকে তাদের মুক্তির উপায় নেই; কিন্তু বিশাল জনসমষ্টিকে হত্যা করা, আর যাই হোক, আমার কাজ নয়।

অন্যান্য ছোটখাট বিধিনিষেধের মধ্যে একটি হচ্ছে এই যে, রাষ্ট্রের কাজে নিযুক্ত শরীফ ঘরের কোন ব্যক্তি যদি তার জন্মভূমি যেতে চায়, তাহলে মীর বখশী শেখ ফরিদের মাধ্যমে আবেদনপত্র পাঠাতে হবে। এরূপ করলেই অনুমতি পেতে দেরি হবে না।

জায়গীরদানের সনদপত্র সিঁদুর বর্ণে লিখে পাঠানোর প্রথা ছিল। ভবিষ্যতে সোনালী বর্ণে লিখে পাঠানর নির্দেশ আমি দিয়েছিলাম।

আমি উজীর খানকে বাংলাদেশের দেওয়ান করে পাঠিয়েছিলাম। তাকে দেওয়া হয়েছিল অসীম ক্ষমতা। ঐ প্রদেশে তাকে পাঠিয়ে দিলাম রাজস্ব সংক্রান্ত বিষয় তদন্ত করবার জন্য। কারণ গত দশ বছর ধরে রাজস্বের কোন সঠিক খবর পাওয়া যায়নি।

বাদাকশানের রাজপুত্র মীর্জা শাহরুখের পুত্র মীর্জা সুলতানকে সাম্রাজ্যের উচ্চতম পদমর্যাদা আমীর-উল-উমরাহে ভূষিত করেছিলাম। মীর্জা সুলতান তাঁর পিতার সবচেয়ে যোগ্য পুত্র। তাকে আমি নিজ পুত্র বলে মনে করেই ঐ পদ মর্যাদায় বরিত করেছিলাম। খানে আজমের পুত্র মীর্জা শামসীর দাবীদাওয়া সম্পর্কে তদন্ত করে সত্যাসত্য নিরূপণের জন্য বজবাহাদুরকে নির্দেশ দিয়েছিলাম। রাজা মানসিংহের ইচ্ছা পুরণার্থে আমি তাঁর পুত্র বাহুসিংহকে পনের শত অশ্বারোহীর মনসবদারী দান করেছিলাম। বাহু সিংহ হচ্ছে তাঁর একমাত্র পুত্র। অবশ্য রাজা মানসিংহের পনের শত পত্নী আছে বলে সবাই জানে। প্রতি পত্নীর দুই কি তিনটি করে সন্তানও হয়েছিল; কিন্তু এটি বাদে আর সবাই মারা

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

গেছে। তাঁর পিতার উত্তরাধিকারী হওয়ার মত যোগ্যতা তার নেই। তবু এক্ষেত্রে তাকে পদোন্নতি করতে আমি প্ররোচিত হয়েছিলাম। আমার পিতার দরবারে সে ছিল পাঁচশো অশ্বারোহীর অধিনায়ক।

কাবুলবাসী গহর বেগের পুত্র জমানা বেগ শৈশব থেকে আমার কাজে নিযুক্ত আছে। সিংহাসনে আরোহণ করার আগে তাকে আমি পাঁচশো অশ্বারোহীর অধিনায়কত্বে বরিত করেছিলাম। তাকে আমি এখন মহব্বত খান পদবীতে ভূষিত করলাম, পনের শত অশ্বারোহীর অধিনায়ক শ্রেণীতে উন্নীত করলাম। কারিগরী কর্মের শিক্ষানবিশীদের পরিচালক বা শাগরীদ বিশার উযীর পদে তাকে নিযুক্ত করলাম। কাজভীবাসী জিয়াউদ্দীনকেও একহাযারী মনসবদারী দিলাম।

বিকিনদাস রাজকীয় অশ্বশালার রক্ষক। তাকে আমি নির্দেশ দিয়েছিলাম রোজ যেন সে দুশো ঘোড়া আমার সামনে হাযির করে। সেই সব ঘোড়া আমার পার্শ্বচরদের ভিতর বিতরণ করা হবে। পঙ্গু বা বুড়া কিংবা মেহনতে কাতর ঘোড়া পোষার কোন অর্থ হয় না।

১০১৯ হিজরীর শাবান মাসের এগার তারিখ (১৬১০ খ্রীস্টাব্দের ১৮ই সেপ্টেম্বর) আমি বাহরাম মীর্জার নাতি মীর্জা রুস্তমের কন্যার সঙ্গে আমার প্রিয়পুত্র পারভেজের বিয়ে দিয়ে মেয়েটিকে মোহরানার অংশ হিসাবে এক লক্ষ আশরফি যৌতুক দিয়েছিলাম। ঐ উপলক্ষে যে আনন্দ উৎসবের আয়োজন করা হয়েছিল, সেখানে আমীরদের ও যাদের উপস্থিত থাকবার অনুমতি দেওয়া হয়েছিল তাদের মধ্যে মহার্ঘ পোশাক-পরিচ্ছদ বিতরণ করা হয়েছিল এবং প্রায় একশো মন হিন্দী ধূনা, চন্দন, মৃগনাভি, এম্বারগ্রিস ও অন্যান্য সুগন্ধি দ্রব্য উৎসব উপলক্ষে খরচ করা হয়েছিল। অন্যান্য দ্রব্যাদি কি পরিমাণ ব্যবহৃত হয়েছিল ঐ বক্তব্য থেকেই তা হয়ত বোঝা যেতে পারে। বিকেলে কনেকে রাজপ্রাসাদে আনা হলে, আমি তাকে ষাটমুক্তার একটি নেকলেস উপঢৌকন দিয়েছিলাম। প্রতিটি মুক্তার জন্য আমার পিতাকে দশ হাযার টাকা দিতে হয়েছিল। তাছাড়া বরকনেকে আমি একটি রুবী দিয়েছিলাম উপহার। রুবীটির দাম দুলক্ষ পঞ্চাশ হাযার টাকা। তার সম্বৎসরের খরচ মেটানোর জন্য আমি তিন লক্ষ টাকা বরাদ্দ করে দিলাম। সুরাটবাসী একশো কুমারীকে গৃহে তার খেদমতের জন্যে পরিচারিকা নিযুক্ত করে দিলাম।

মীর্জা আলী আকবর শাহীকে চারহাযারী মনসবদারীতে উন্নীত করে তাকে আমি কাশ্মীর সীমান্তের অধিনায়ক করে পাঠিয়েছিলাম। সেই সঙ্গে তাকে আমি উপঢৌকন হিসাবে দিয়েছিলাম এক লক্ষ টাকা, দামী একটি ঘোড়া ও মণিমুক্তা বসান পাদানি, রত্নভূষিত কোমরবন্ধ ও ছুরিকা এবং পাগড়ির জন্য একটি জিগাহ।

বকর খান নজুমসানী আমার পিতার আমলে সামান্য তিনশো মনসবদারীতে অধিষ্ঠিত ছিল। তাকে আস্তে আস্তে আমি দুহাযারী মসনবদারীতে উন্নীত করে দিয়ে মুলতানের শাসনকর্তা করে পাঠালাম। আলী খানকে নদীর সামরিক অধিনায়কত্ব ও নদী সংলগ্ন জেলাগুলির ফৌজদারী ক্ষমতা অর্পন করলাম।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

তাছাড়া, নূরজাহান বেগমের বোনের মেয়ের সঙ্গে তার বিয়ে দিয়ে তাকে আমি পুত্রের মর্যাদায় বরণ করে নিলাম। তার নিয়োগপত্রে ঐ কথা লিপিবদ্ধ করে দিয়েছিলাম। সৈনিক হিসাবে সাহস ও বীরত্বের জন্য সে খ্যাতিমান, সেই কথা মনে রেখে সুযোগ পেলেই তাকে চাকরি ক্ষেত্রে বড় পদে উন্নীত করে দিতাম।

তিন হাযার টাকা মাসহারা দিয়ে রাণা সিংহকে আমার পিতার সমাধিসৌধের রক্ষক পদে আমি নিয়োগ করেছিলাম। সমাধিসৌধটি আগ্রা শহর[২১] থেকে পশ্চিম দিকে তিন ক্রোশ দূরে। যে-স্তরের আমীরই হোক না কেন, আমার দরবারে আসতে হলে তাকে সবার আগে ঐ পবিত্র স্থান জেয়ারত করতে হবে। তারপর তার আমার সম্মুখে আসার অনুমতি মিলবে।

আমীর-উল-উমরাহের কাছ থেকে একদিন আভাস পেয়ে, যা আমার মনের সঙ্গে মিলে গিয়েছিল, আমি একটি বিধি প্রণয়ন করেছিলাম। সে বিধিটি হচ্ছে এই; আমার সরকারের কোন পদে কাউকে নিয়োগ করার আগে তার অভিজ্ঞতা সম্পর্কে অবহিত হতে হবে। তার কারণ, কাজটা কতটুকু সে সুচারু ভাবে সম্পন্ন করতে পারে তার একটি ধারণা ঐ ভাবে করা সম্ভব। গুরুত্বপূর্ণ কাজ কখনই বোকার হাতে সফল হতে পারে না। অন্যপক্ষে দক্ষ লোককে সামান্য কাজে নিয়োগ করার মানে বাজপাখি দিয়ে মশা মারা। এইসব ব্যাপার সম্পর্কে সচেতন না হলে যে-কোন রাষ্ট্রের কাজে গোলযোগ দেখা দেওয়া অনিবার্য। প্রত্যেক সরকারের শুভাশুভ ও নিয়মানুবর্তিতা সম্রাটের পার্শ্বচরদের চরিত্রের উপর অনেকাংশে নির্ভরশীল। (এর পরে চারটি ছোট কবিতা আছে। কিন্তু পাণ্ডুলিপির লেখা এত খারাপ যে বুঝে উঠা যায় না।)

যে-সময়ে আমি এই স্মরণী লিখছি, সে-সময়ে আমার কাছে খবর এসে পৌঁছল যে, উজবেকবাসী বাকী খানের ক্ষমতাধীনস্থ সমরকন্দ ওয়ালী খান নামক জনৈক নায়কের আনুগত্য মেনে নিয়েছে। তার ক্ষমতার সবে শুরু বলে আমার মনে হল সে বোধ হয় আমার বিরুদ্ধাচারণ করতে পারে। সেক্ষেত্রে আমি প্রথম ঠিক করেছিলাম আমার পুত্র পারভেজকে তার বিরুদ্ধে পাঠাব। উদ্দেশ্য ছিল আল্লাহ যদি করেন ভবিষ্যতে আমি নিজেই ট্রান্সক্সিয়ানা অভিমুখে রওয়ানা হব, অবশ্য দক্ষিণ-ভারত আক্রমণের আমার যে পরিকল্পনা আছে তার পরেই। বহুদিন ধরে আমি ভেবে রেখেছি ঐ সব প্রদেশে জয়ের পতাকা তুলে ধরব। ঐ অঞ্চলে আমার পরিকল্পনা সফল হলে সমরখন্দ অভিমুখে আমার বিজয়ী-বাহিনীকে পরিচালিত করব। এই সংকল্প আমার পিতার কাছ থেকে পাওয়া, তাঁর সবসময়ের স্বপ্ন ছিল পূর্বপুরুষদের বাসভূমি জয় করে নেওয়ার; কিন্তু অরক্ষিত অবস্থায় শাসনভার কোন এক ছেলের হাতে রেখে হিন্দুস্তান ছেড়ে যাওয়া খুব যুক্তিসঙ্গত নয় বলে আমি উদয়পুরের রানার বিরুদ্ধে পারভেজকে যুদ্ধে অবতীর্ণ করানোর সংকল্প গ্রহণ করলাম। ঐ অঞ্চল তাকে জায়গীর হিসাবে দিয়ে মুলতান ও আগ্রা

---

২১. সেকেন্দ্রা।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

অন্যদের কাছে হস্তান্তরিত করে দিলাম। এভাবে, যদি আল্লাহর ইচ্ছায় আমার চিন্তাক্লিষ্টতা থেকে মুক্তি পাই, তাহলে এই বছরেই আমি দাক্ষিণাত্যে অভিযান পরিচালনা করব। অন্যপক্ষে, রানার যদি দুর্মতি হয় এবং ফের উত্যক্ত করে, তাহলে আমার সাক্ষাৎ অধীনে যে বাহিনী আছে, সেই শক্তি দিয়ে তাকে আমি সমূলে ধ্বংস করে দেব।

পারভেজের সঙ্গে যে-সব আমীর আমি দিয়েছি তাদের মধ্যে আসফ খান সর্বোত্তম। আমার পিতার আমলে আসফ খান তাঁর উযীর ছিলেন। তাঁকে আমি পাঁচহাযারী মনসবদারীতে উন্নীত করে পতাকা ও নাকাড়ার তকমায় ভূষিত করেছিলাম। সেই সঙ্গে তাঁকে আমি উপঢৌকন হিসাবে দিয়েছিলাম হীরকখচিত একটি ছুরিকা, একটি যুদ্ধ হস্তী এবং একটি সুসজ্জিত অশ্ব। এই উপলক্ষে তাঁকে আমি আমার পুত্রের গবর্নর হিসাবে নিয়োগ করেছিলাম। আসফ খানের আসল নাম জাফর বেগ। তিনি কাসভীনের বাশিন্দা বদিউজ্জামানের পুত্র। বদিউজ্জামান আগাবেলালের পুত্র। আগাবেলাল ছিলেন ইরানের পরলোকগত শাহ্ তামাস্পের উযীরদের একজন। আমার পিতা তাঁকে আসফ খান পদবীতে ভূষিত করেছিলেন। তিনি প্রথমে ছিলেন মীর বখশী; কিন্তু তাঁর অসামান্য দক্ষতা ও অভিজ্ঞতার দরুন তিনি খুব তাড়াতাড়িই উযীর পদে উন্নীত হয়েছিলেন। ঐ পদে তিনি দুবছর অসীম প্রতাপের সঙ্গে অধিষ্ঠিত ছিলেন। তাঁর অপরিসীম বিদ্যাবুদ্ধি ও বিচারবিবেচনার তীক্ষ্ণতায় সন্তুষ্ট হয়ে তাঁকে আমি উযীর শ্রেণী থেকে আমীর পদে উন্নীত করে দিয়েছিলাম। ঐ উপলক্ষে আমি সকল শ্রেণীর কর্মচারীদের উদ্দেশ্যে কঠোর অনুজ্ঞা জারী করেছিলাম যে, তারা যেন দ্বিধা না করে কিংবা কথা না বলে তাঁর সিদ্ধান্ত সব মেনে নেয়। তাঁর ঐ সব সিদ্ধান্ত চারিত্রিক সততা ও বিশুদ্ধ কর্মপরায়ণতা থেকে উৎসারিত হবে বলে আমার দৃঢ় বিশ্বাস ছিল।

একই সময়ে আমি শাহযাদা পারভেজের কাছে পাঁচ লক্ষ টাকা মূল্যের একটি মুক্তার মালা এই নির্দেশ দিয়ে পাঠিয়েছিলাম যে, রাণার ভূভাগে বানারসের মত একটি শহর যেন তৈরী করা হয় এবং সে শহরের নাম সে যেন রাখে পারভেজাবাদ। আমি স্থপতি আবদুর রাজ্জাক মামুরীকে একহাযারী মনসবদারী দিয়ে শাহযাদার বখশী পদে নিযুক্ত করেছিলাম এবং আসফ খানের চাচা মোকতার বেগকে আমার শাহযাদা পুত্রের পার্শ্বচর হবার সুযোগ দিয়েছিলাম। মোকতার বেগ ছিল আটশো অশ্বারোহীর অধিনায়ক। সিংহাসনে আরোহণের আগে আফগানবাসী শেখ রুকনউদ্দীনকে আমি শেরখান উপাধি দিয়েছিলাম। এখানে এইটুকু মাত্র আমি বলতে চাই যে শেখ রুকনউদ্দীন অত্যন্ত সাহসী প্রকৃতির লোক; কিন্তু গুটিকয় কাশ্মীরী সর্দারের অধীনে চাকরি করবার সময় সে অত্যন্ত মদ্যাসক্ত হয়ে পড়ে। তবুও লোক হিসাবে সে অত্যন্ত ধীরস্থির প্রকৃতির।

আবুল ফজলের পুত্র শেখ আবদুর রহমানকে দুহাযারী মনসবদারীতে উন্নীত করে দিয়েছি, সে কথা আমি এখানে লিপিবদ্ধ করছি। আবুল ফজলকে অবশ্য উড়নচণ্ডীর স্বভাবের লোক বলে ভাল ভাবেই জানতাম। আমার পিতার শাসনের

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

শেষদিকে, যে-ভাবেই হোক তাঁকে প্রভাবিত করবার মত ক্ষমতা আয়ত্ত করে, আবুল ফজল তাঁর প্রভুর মনে ঢুকিয়ে দিয়েছিল যে, নবুয়তের মোহর আর কিছু না, বাগ্মী এক আরববাসীর প্রচারের ফল মাত্র এবং কুর'আনের পবিত্র বাণী মুহম্মদ (যাকে হাযারও সালাম), বানিয়েছেন মাত্র-যে নবীর প্রতি আমার মত সহস্র জনের চিত্ত উৎসর্গীকৃত। এইসব কারণেই আমি আবুল ফজলকে লোক দিয়ে হত্যা করি। তাঁর মস্তক আমার সম্মুখে উপস্থাপিত করা হয়। তার দরুন আমি আমার পিতার গভীর অসন্তোষের কারণ হয়ে উঠি। সেই সঙ্গে আমি নবীর পবিত্র নামে আবেদন ও ঘোষণা করি যে, নবীর বদৌলতে আমি হিন্দুস্তানের তখতে এসে বসবই। আমি একথা বলতে বাধ্য হচ্ছি, ঐ উপলক্ষে রুষ্ট হওয়ার দরুন, আমার পিতা আমাকে ছাড়িয়ে আমার পুত্র খসরুকে বেশী পদমর্যাদা দিয়েছিলেন এবং বলেছিলেনও যে, তারপর খসরুই সম্রাট হবে। শেখ সাদী অনেক আগেই লিখে গেছেন : আল্লাহ যাকে চান তাকে তিনি তুলে নিয়ে যাবেন। নাস্তিক যতই নিজেকে রক্ষা করার চেষ্টা করুক না কেন। আল্লাহ অবশেষে তাঁর উদ্দেশ্যাবলীর যবনিকা উত্তোলন করলেন। সে যাই হোক, আবুল ফজলের মৃত্যুর পর, আমার পিতা অন্যান্য ধারণায় চমৎকৃত হয়ে সঠিক পথে আবার ফিরে এসে নিজেকে গোঁড়া মুসলমান বলে জাহির করেছিলেন।

তুর্কমেন অঞ্চলের কারাখানের উযীর সাদেক মুহম্মদ খানের পুত্র জাহেদ খানকেও আমি দুহাযারী মনসবদারীতে উন্নীত করে দিয়েছিলাম। আমার পিতার আমলে এই ব্যক্তি গোলন্দাজ বাহিনীর অধিনায়ক পদে অধিষ্ঠিত ছিলেন। আসীর দুর্গ অবরোধকালে তিনি কর্মক্ষমতা ও দক্ষতার চূড়ান্ত পরিচয় দিয়েছিলেন। বর্তমান পদোন্নতির পিছনে অবশ্য ঐসবই কাজ করেছে। সেই সঙ্গে তাঁকে আমি 'বুজর্গ আদম'[২২] ও ত্রিশ সহস্র টাকা উপঢৌকন হিসাবে দিয়েছিলাম।

AMARBOI.COM

প্রসঙ্গক্রমে এখানে আমি উল্লেখ করছি যে, হিন্দু কেচুয়া গোত্রের রাইমনোহরের সঙ্গে আমার পিতা ফার্সীতে কথোপকথনে অভ্যস্ত ছিলেন। রাইমনোহর যখন যুবক ছিলেন, পিতা নানা ভাবে তাঁর উপকার করেছিলেন। সাধারণ জ্ঞানে তাঁর বিপুল পারদর্শিতা এবং রাষ্ট্রের কাজে এখনও তিনি নিযুক্ত। কখনও কখনও তিনি আরবীতে কবিতা লিখেছেন। সে কবিতা একেবারে খারাপ নয়। তাঁর একটি কবিতার চরণে আছে–'ধনী মহিলাদের পট্টপরিচ্ছদের উদ্দেশ্য তুমি জানতে চাও? সে হচ্ছে এই কেউই সিংহের সামনে পা বাড়িয়ে দেবে না।' এই গোত্রের লোকদের কাছে, অবশ্য কল্পনার আশ্চর্য উদ্ভাসন আশা করা উচিত নয়।

পাহাড় খান রাজা মানসিংহের চাচা। তিনি দুহাযারী মনসবদার। কিছুটা নি:সঙ্গ জীবন যাপনের স্বভাব ছিল তাঁর। অবশ্য তাই বলে যুদ্ধবিদ্যা ও সামরিক প্রতিভায় তিনি খাটো নন। তাঁর এক বোন আমার পিতার হারেমে ছিলেন।

২২. কারো কারো মতে আদম মানে রুবী। এক্ষেত্রে বিরাটাকার রুবী।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

অপরূপ সুন্দরী হওয়া সত্ত্বেও তাঁর ভাগ্য প্রসন্ন হয়নি। কথায় বলে 'যাদের রূপগুণ কিছুই নেই, তাদেরই ভাগ্য খোলে;' কারণ দেখা যায় সৃষ্টির কারখানায় কোনকিছুই যথার্থ অবস্থায় নেই। যারা ভীরু তারা ভয়ের মধ্যে আরও সেঁধিয়ে যায়, আর যারা পৃথিবীর প্রেমিক তাদের ভাগ্য আরও উদ্ভাসিত হয়।'

দৌলতখান আমার পিতার অন্তঃপুরের খোজাদের সর্দার। এই কাজের দরুন তাকে নাজিরদ্দৌলা উপাধি দেওয়া হয়েছিল। এই লোকটি সম্পর্কে আমার বক্তব্য হচ্ছে যে ঘুষ গ্রহণ ও কর্তব্যে নীতিবিচ্যুতির দিক থেকে সাম্রাজ্যে তার মত আর একটিও নেই। মৃত্যুকালে সে রেখে গিয়েছিল দশ কোটি আশরফি, এক একটি আশরফি পাঁচ মিসকাল সমান। তাছাড়া গহনাপত্র, সোনা ও রূপার বাসন, তৈজসপত্র, তামার বাসনকোসনের মূল্য হবে প্রায় আরও তিন কোটি। আমার পিতার খাজাঞ্চীখানাতে তার সব সম্পত্তি বাজেয়াপ্ত হয়ে গেল। জয়েন খান কোকার পুত্র জাফর খান। আমার পিতা জাফর খানকে অত্যন্ত স্নেহ করতেন। জাফর খান ও খানে আজম দুজনকেই তিনি পুত্রবৎ মনে করতেন; কিন্তু খানে আজম তাঁর কাছে অন্য দুজনের চেয়ে বেশী শ্রদ্ধা পেত। জাফর বিচার বুদ্ধিসম্পন্ন লোক। তার কর্তব্যনিষ্ঠা ও দক্ষতার জন্য তার কাছে আমি অনেক কিছু প্রত্যাশা করেছি। সে যথার্থই তার পিতার প্রত্যুৎপন্নমতিত্বের অধিকারী। খুব কম লোকই পর্যবেক্ষণের দ্রুততায় তার সঙ্গে প্রতিযোগিতায় পেরে উঠবে। তার পর্যবেক্ষণ শক্তি এমনই যে উড়ন্ত পায়রার ঝাঁকে এক নযর বুলিয়ে সে তাঁদের সংখ্যা একেবারে ঠিক ঠিক বলে দিতে পারবে। ভারতীয় সঙ্গীতে তার বেশ দক্ষতা আছে; আর সৈনিক হিসাবে সে তুলনাহীন।

এই সময়ে আমি অন্যান্য কাজের মধ্যে 'ফিন্দিয়া' নামক একদল ডাকাতের গোত্রকে দমিয়েছিলাম। আগ্রার চারপাশের সড়কে তারা ঘুরে বেড়াত। হাতের মুঠায় পেয়ে হাতীর পায়ে পিষে আমি তাদের মেরেছিলাম।

রাই দুর্গা আমার সিংহাসনে আরোহণের প্রাক্কালে সাতশো মনসবদারীতে অধিষ্ঠিত ছিলেন। বীর্যবান পুরুষ তিনি, বহু যুদ্ধে তিনি তাঁর সাহসের পরাকাষ্ঠা দেখিয়েছেন। এখন অবশ্য তাঁর বয়স হয়েছে। তাঁকে আমি একহাযারী মনসবদারীতে উন্নীত করে সেই সঙ্গে এক লক্ষ টাকা উপঢৌকন দিয়েছিলাম। সুজাত খানের পুত্র মকিম খানকেও আমি সাতশো থেকে একহাযারী মনসবদারীতে উন্নীত করে দিয়েছিলাম। সুজাত খান ছিলেন আমার পিতার অন্যতম শ্রেষ্ঠ আমীর। আমার এখনও মনে আছে, আমার যুবা বয়সে পিতা আমাকে আদেশ করেছিলেন ধনুর্বিদ্যা তাঁর কাছে শেখার জন্য। এইসব কারণে আমি এখন তাঁকে নাকাড়া ও পতাকার তকমা সহ পাঁচাহাযারী আমীর পদে অধিষ্ঠিত করে দিয়েছিলাম।

রূপ কাউয়াস নামক জনৈক ব্যক্তি আমার পিতার একশো কুড়ি জন ক্রীতদাসকে কর্তব্য থেকে ভ্রষ্ট করে পালিয়ে গিয়েছিল। হিম্মতপুরের যুদ্ধে তাকে আবার বন্দী করা হয়েছিল। বিপুল শৌর্যবীর্যের অধিকারী হওয়া সত্ত্বেও, লোক

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

হিসাবে সে ছিল পাঁড় মাতাল। তাছাড়া, সারা জীবনে সে একবার না রেখেছে রোযা না পড়েছে নামায। এইসব সত্ত্বেও আমি তার অপরাধ মার্জনা করে তার জীবন বাঁচিয়ে দিয়েছিলাম।

শাহবাজ খানকে যদিও বাজার থেকে কেনা হয়েছিল, তবু নানা কাজ করবার মত ক্ষমতা তার ছিল। অশ্লীল ও নোংরা কথাবার্তা তার মুখে লেগে থাকত, আমার পিতার উপস্থিতিতেও সে ওভাবে কথা বলত, তবু সে আমার পিতার কাছ থেকে পাঁচহাযারী মনসবদারের মর্যাদা পেত। সে অবশ্য তুর্কী ভাষা জানত, সামরিকবিদ্যার রীতিকরণের সঙ্গে তার পরিচয় ছিল। তবু দুশমনের মুখোমুখি হলেই সে ভয়ে কাবু হয়ে যেত। তার জন্য আমি তাকে পাঁচহাযারী থেকে সরিয়ে নিয়ে দুশো মনসবদারী দিয়ে প্রধান শিকারীর পদে নিয়োগ করেছিলাম।

তাছাড়া বিভিন্ন স্তরের মনসবদারদের, পাঁচশো থেকে অহিদি অর্থাৎ বেসামরিক ঘোড়সওয়ার পর্যন্ত, (যাদের প্রত্যেকের চারটি করে ঘোড়া আছে) সবাইকে পদ ও গুণ দেখে ভাতা বাড়িয়ে দিয়েছিলাম। আমি আরও নির্দেশ দিয়েছিলাম রাজকীয় শিবিরের সঙ্গে সব সময় ত্রিশ হাযার অহিদিকে থাকার জন্য, আমার দরবারের বিধিবদ্ধ আইনের সঙ্গে সঙ্গতি রেখে তাদের রাতপ্রহরীর কাজ করতে হবে।

মীর্জা সুলাইমানের নাতি বাদাকশানের শাহযাদা মীর্জা শাহরুখ আমার আত্মীয়। আমার পিতার আমলে তিনি পাঁচহাযারী মনসবদারীর পদ লাভ করেছিলেন। তাঁকে আমি এখন সাতহাযারী মনসবদারীর মর্যাদায় ভূষিত করলাম। এর জন্য অবশ্য আইনের কিছুটা অসঙ্গতি হল, কেননা আইনে ছিল যে কোন তুর্কীকে যেন পাঁচহাযারী মনসবদারীর উঁচু পদ না দেওয়া হয়। শাহরুখ সরল প্রকৃতির মানুষ। তাঁকে আমার পিতা খুবই স্নেহ করতেন। পিতা তাঁকে নিজ পুত্রদের সঙ্গে তাঁর সম্মুখে বসবার অনুমতি দিয়েছিলেন। তাতার জাতির স্বভাবানুগ সরলতার দরুন ভারতে বিশ বছর থাকবার পরও তিনি হিন্দুস্তানী কথা মোটেই বলতে পারতেন না। বাদাকশানের বাসিন্দারা সত্যের প্রতি যেমন উপেক্ষা দেখায়, তেমন জাতি সারা জাহানে বোধ হয় আর নেই। অবশ্য বিচার বুদ্ধিতে তারা খাটো এ কথা বলা যায় না। শাহরুখ যে বাদাকশানী একথা ধরবার উপায় নেই। বাদাকশানীদের সঙ্গে তার কোথাও কোন মিল নেই।

যত স্নেহই তিনি পেয়ে থাকেন না কেন, এই শাহযাদার দুর্ভাগ্য, বাদাকশানের বাসিন্দা মীর আলাউদ্দীনের প্রলোভনে পড়ে তিনি আমার পিতার অসন্তোষের কারণ হয়ে উঠেন। তার দরুন তাঁকে কাবুলে পাঠান হয়েছিল কাবুলবাসী খাজা আবদুল্লাহর প্রহরায়। সে সময়ে ঐ শহরের কারাগারে চারশো রাজবন্দী ছিল। এই সঙ্গেই খবর পাঠান হয়েছিল, যদি অনুতপ্ত হয়ে রাজবন্দীরা শপথ গ্রহণ করে তারা আর কখনও অবাধ্যতা করবে না, তাহলে তাদের মুক্তি দিয়ে সাম্রাজ্যের নানা শহরে পাঠিয়ে দিতে। খাজা আবদুল্লাহ কাবুলের দিকেই আসছিলেন জেনে তাঁর সঙ্গে আলাপ না করেই উল্লিখিত আলাউদ্দিন শহরের

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

প্রতিরক্ষকদের বুঝিয়েছিল এই বলে যে, নির্দেশ এসেছে সব রাজবন্দীদের অস্ত্রশস্ত্র, ঘোড়া, এমনকি খেলাৎ দেওয়ার জন্য এবং তার উপর ভার পড়েছে তাদের রাজধানী অভিমুখে নিয়ে যাওয়ার জন্য।

এর পিছনে হীন কোন ষড়যন্ত্রমূলক অভিসন্ধি আছে সে সম্পর্কে সন্দেহ না করে, কাবুলের শাসনকর্তা ঐ কথায় রাযী হয়ে গেলেন এবং নির্দেশ দিলেন চারশো রাজবন্দীর আনুষ্ঠানিক পোশাক-আশাক ও প্রয়োজনীয় সামরিক অস্ত্রশস্ত্র যোগাড় করে দেওয়ার জন্য। মীর আলাউদ্দিনের সঙ্গে যুক্ত হয়ে এইসব রাজদ্রোহীরা, শাসনকর্তা তাদের উদ্দেশ্য সম্পর্কে সজাগ হওয়ার আগেই, শহরে ঝাঁপিয়ে পড়ে ব্যাঙ্কারদের দোকানপাট ও বাজার বেপরোয়া লুট করে এবং যা কিছুতে হাত দিতে পেরেছিল সে সব নিয়ে শহরের তোরণ দিয়ে বেরিয়ে বাদাকশানের পথে কেটে পড়ল। দুহাযারী মনসবদারী শ্রেণীভুক্ত হয়েও অমন হীন ও জঘন্য ভাবে সেই আলাউদ্দিন আনুগত্যের শপথ লজ্ঘন করেছিল। তার অভিযোগ করার মত কোন কারণও ছিল না। কয়েক বছর বাদে সব রকম দুঃখ দুর্দশা ভোগ করার পর সে যখন আমার সামনে এসে হাযির হল, আমি তাকে জিজ্ঞাসা করলাম, আমার পিতার সঙ্গে ঐ বিশ্বাসঘাতকতা ও কৃতঘ্নতা করার পর, কোন মুখে সে আমার সামনে এসে দাঁড়িয়েছে? সে এমন বিনীত ও কাতরকণ্ঠে জবাব দিল যে, তার মিথ্যাভাষণের সঙ্গে পূর্বপরিচয় থাকা সত্ত্বেও, তার দুর্ভাগ্যে দয়াপ্রবণ না হয়ে পারলাম না। আমার পিতার আমলে যে পদে অধিষ্ঠিত ছিল, তাতে পুনর্নিয়োগ করা শুধু নয় তাকে দুহাযারী থেকে দুহাযার পাঁচশো মনসবদারীতে উন্নীত করে দিয়েছিলাম। এই ব্যাপারে আমার আমীর-উল-উমরাহের সমর্থন ছিল। আলাউদ্দিনের সৈনিক হিসাবে শৌর্যবীর্যের খ্যাতির কথা উল্লেখ করে, তিনি আমাকে সনির্বন্ধ অনুরোধ করেছিলেন শুধু একটি মাত্র অপরাধের জন্য তাকে প্রত্যাখ্যান করার বিপদ ও অসমীচীনতা সম্পর্কে হুঁশিয়ার হতে। তাছাড়া ঐ অপরাধের জন্য যথেষ্ট দুঃখকষ্ট এর মধ্যে সে পেয়েছে।

আমি খুব সম্ভব এখানে উল্লেখ করতে পারি যে সময়ে আমি এই বিবরণী লিখছি, তখন আমার অধীনে কমপক্ষে একশো পঞ্চাশ হাযার উজবেক অশ্বারোহী ছিল। তাদের ভেতর একশো অশ্বারোহীর অধিনায়ক থেকে প্রাইভেট ঘোড়সওয়ার পর্যন্ত ছিল। তবু আমি মন্তব্য করতে বাধ্য হচ্ছি যে, যতই তারা যুদ্ধ ক্ষেত্রে বীরত্ব দেখাক না কেন, যখন তখন তারা তাদের মালিকদের ছেড়ে চলে যেতে পারে।

সিংহাসনে আরোহণের কিছু আগে শেখ হোসেন বুলনারকে আমি মোকারেব খান উপাধিতে ভূষিত করেছিলাম। এই ব্যক্তিকে আমি মনোনীত করেছিলাম দাক্ষিণাত্যে খানখানানের শিবিরে যাওয়ার জন্য। তার উপর ভার দেওয়া হয়েছিল আমার পরলোকগত ভ্রাতা দানিয়েলের সন্তানসন্ততি নিয়ে আসার। ঐ উদ্দেশ্যে আমি তাকে যথাসাধ্য নির্দেশ দিয়েছিলাম, মন্ত্রীপ্রবরের কাছে কি বলতে হবে সে সম্বন্ধে। যে কাজের ভার তাকে দেওয়া হয়েছিল, যোগ্যতার সঙ্গেই সে তা নিষ্পন্ন করেছিল, সে সঙ্গে করে নিয়ে এসেছিল আমার ভ্রাতার পরিজনদের, সেই সঙ্গে

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

বিশাল ঐশ্বর্যও। শুধু গহনাপত্রের মূল্যই হবে প্রায় পাঁচ কোটি আশরফি[২৩] এবং প্রত্যেকটি আশরফি পাঁচ মিসকাল পরিমাণের এবং নগদ মুদ্রার পরিমাণ দুকোটি আশরফি। আর এনেছিল দুশো বিরাটাকার হাতী এবং দুহাযারের মত ইরানী ঘোড়া। সত্যি কথা বলতে কি, রাজকর্মচারী হিসাবে মোকারেব খানের গুণাবলী প্রথম শ্রেণীর। খুব কম সম্রাটেরই তার মত কর্মচারী আছে। যা হোক, তাকে আমি নাকাড়া ও পতাকার তকমা সহ পাঁচহাযারী মনসবদারীতে উন্নীত করে দিয়েছিলাম, সেই সঙ্গে উপঢৌকন দিয়েছিলাম হীরকখচিত একটি সমশের, জমকালো অশ্বসজ্জা সহ একটি ঘোড়া, রত্নভূষিত পাগড়ি চূড়া, একপ্রস্থ মূল্যবান পোশাক এবং একটি শিক্ষিত হাতী। এই উপলক্ষে তাকে আমি গুজরাটের শাসকের পদেও নিয়োগ করেছিলাম।

আর একজনকে দুহাযারী মনসবদারীর যোগ্য বলে আমি মনে করেছিলাম, তাঁর নাম নকীব খান। নকীব খানের আসল নাম এনায়েত-উল-রুমলী। তিনি কাসভীনের সৈয়দদের বংশধর এবং আমার পিতার কাছ থেকে তিনি নকীব খান উপাধি পেয়েছিলেন। অন্যপক্ষে ইতিহাসে তাঁর জ্ঞান অনন্য, যত দূরবর্তী তথ্যই জিজ্ঞাসা করা হোক না কেন, এত স্বচ্ছন্দে তিনি জবাব দিতেন যে মনে হত এইমাত্র তিনি তথ্যটি জেনে এসেছেন; তাঁর স্মৃতিশক্তির এমনই ছিল তীক্ষ্ণতা। ইতিহাস-শাস্ত্রে সাত খণ্ড বই তিনি লিখেছিলেন এবং এ-কথা অনস্বীকার্য যে সাহিত্যের এই শাখায় তিনি তুলনাবিহীন, তার দরুন সঙ্গত ভাবেই বলা যায় পৃথিবীর আর কোন রাজা তাঁর মত লোক পাননি। সবশেষে আমি বলব কৈশোরে তাঁর কাছে আমি স্বল্পকালের জন্য পাঠ নিয়েছিলাম[২৪]।

শাবান মাসের সাত তারিখে (সনের উল্লেখ নেই) রাজা মানসিংহের চাচা ভগবান দাসের তিন পুত্র রামজী, বেচারাম ও শ্যামকে তাদের হীন চক্রান্তমূলক কাজের জন্য হাতীর পায়ে তাদের মাথা পিষে চূর্ণ চূর্ণ করে দেওয়া হয়েছিল। এভাবেই তাদের জন্য তৈরী নরকে তাদের দেওয়া হল পাঠিয়ে। বিশেষ করে রামজী হচ্ছে আলসে ও শয়তান প্রকৃতির লোক। যখন তার আত্মীয় রাজা মানসিংহের পুত্র পাহাড়সিংহকে এলাহাবাদে দুহাযারী মনসবদারী দেওয়া হয়েছিল, সে সময় জঘন্য ভাবে রামজী, পাহাড়সিংহকে প্ররোচিত করে তার সর্বনাশ সাধনে উদ্যত হয়েছিল। রামজী যখন তার চক্রান্তমূলক কাজে উদ্যত, তখনই তার হীন কাজের সে যথার্থ শাস্তি লাভ করল।

সেই গোত্রের একজন হচ্ছে ইলিচরাম। পরিণামের কথা বিন্দুমাত্র না ভেবে এই লোকগুলির হত্যায় সে ভীত-সতর্ক হয়ে সন্দেহজনক গতিবিধি শুরু করলে, আমি তাকে বন্দী করে বাংলাদেশের 'ক্রৌড়ী' (রাজস্ব আদায়কারী) মুহম্মদ

---

২৩. পঁয়তাল্লিশ কোটি টাকা।

২৪. ইনি খুব সম্ভব সেই নকীব খান যিনি সংস্কৃত থেকে মহাভারত পার্শীতে অনুবাদ করেছিলেন, কেননা তিনিও কাসভীনের বাশিন্দা বলিয়া কথিত।

AMARBOI.COM

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

আমীনের হাতে সমর্পণ করে দিলাম এই বলে যে সে যেন সজাগ দৃষ্টি রাখে ইলিচরামের উপর। প্রসঙ্গত, মুহম্মদ আমীনের পিতা তিরমিজি সৈয়দ বংশীয়। তাকে নির্দেশ দেওয়া হয়েছিল বাংলা দেশে উপস্থিত হয়ে সে যেন ইলিচরামকে রাজা মানসিংহের হাতে তুলে দেয়। ইলিচরামের হাত-পা বেঁধে ছৈ-তালা গরুর গাড়ীতে তুলে কি সহজভাবেই এই রাজকর্মচারী বাংলা অভিমুখে রওয়ানা হল। সে ভেবেছে ঐ যা সতর্কতা গ্রহণ করা হয়েছে তা-ই বুঝি ঢের। সেরাকতাল ও গাজীপুরের মাঝামাঝি কোন জায়গায়, যখন মধ্যরাত, সবাই ঘুমিয়ে, কয়েদী সুযোগ বুঝে রাণার সঙ্গে যোগ দেওয়ার উদ্দেশ্যে পালিয়ে গেল। সে যাই হোক, পলায়নের শব্দ শুনে মুহম্মদ আমীন ব্যাপারটা বুঝে নিল। তিলমাত্র দেরী না করে সে ছুটে চলল পলাতকের পিছু পিছু। ফেরারী ভুল করে যমুনার এমন এক পাড়ে এল যেখানে কোন খেয়া ছিল না। সাহস করে সে নদীতে ঝাঁপিয়ে পড়ে অন্য পাড়ে নিরাপদে উঠে এল; কিন্তু এখানেই তার সব শেষ; গাঁয়ের লোকজন তাঁকে ধরে ফেলে দড়ি দিয়ে বেঁধে রাখল। মুহম্মদ আমীন এলে তার হাতে কয়েদীকে তুলে দেওয়া হল।

মুহম্মদ আমীন, এরপর, আমার কাছে বার্তা পাঠাল এই বলে যে, কয়েদীকে সে ফের ধরতে পেরেছে, কয়েদীর উদ্দেশ্য ছিল রাণার সঙ্গে যোগ দেওয়ার এবং সে এখন কি করবে আমাকে জানানোর জন্য সে অনুরোধ করে পাঠাল। আমি জবাবে তাকে জানালাম যদি রাজপুত্র গোত্রের কোন ব্যক্তি কয়েদীর জামিন হতে রাজী হয়, তাহলে কয়েদীকে আমি মার্জনা করতে ও একটি জায়গীর দিতে রাজী আছি। তার উদ্দাম প্রকৃতির কুখ্যাতির জন্য কেউ তার জামিন হতে খুব সম্ভব রাজী হবে না বলে, আমি আমীর-উল-উমরাহের সঙ্গে আলাপ করলাম, এই ব্যাপারে কি করা যায় তা নিয়ে। কারণ, যদি সে পালিয়ে যেতে সক্ষম হয়, তাহলে এমন পরিস্থিতির উদ্ভব হবে, যা আয়ত্তে আনা কষ্টসাধ্য, বিশেষ করে যখন কুকুর-বিড়ালের চেয়ে দেশ জুড়ে রাজপুতের সংখ্যা বেশী। আমীর-উল-উমরাহ জানালেন তার মহৎ দুটি মাত্র পথ আছে : এক হচ্ছে তাকে কোন বিশ্বাসভাজন ব্যক্তির কাছে রাখা, যে তার নিরাপত্তার জন্য দায়ী হবে, নয়তো অবিলম্বে তাকে গোয়ালিয়রের দুর্গে বন্দী করে রাখা। ঘটনা-প্রবাহে সংকট দেখা দিল, যখন জানা গেল, ইব্রাহীম গাগুর-যাকে দিলওয়ার খান ও হাশেম মুংগলী-যাকে শাহনওয়াজ খান উপাধি দেওয়া হয়েছে, তারা অস্ত্রশস্ত্রে সজ্জিত হয়েও লোকলস্কর নিয়ে মুহম্মদ আমীনের হাত থেকে ইলিচরামকে উদ্ধার করে দুশমনদের কাছে নিয়ে যাওয়ার জন্য প্রস্তুত হল।

অমন বিপন্ন ঘটনাপ্রবাহ মনে রেখেই গোপনে আমি আমার দেহরক্ষী যারা আছে, তারা ছাড়াও চার হাযার ঘোড়সওয়ার ও দুহাযার মশালচী নিয়োগ করে তাদের নির্দেশ দিয়ে দিলাম, যদি আমার ব্যক্তিগত নিরাপত্তায় বিন্দুমাত্র ব্যাঘাত দেখা দেয়, তাহলে তারা যেন হামলাকারীদের উপর ঝাঁপিয়ে পড়ে, হামলাকারী যারাই হোক না কেন এবং ইলিচরামের উদ্ধার প্রতিহত করার যথাসাধ্য চেষ্টা

করে। মুহম্মদ আমীনকে নির্দেশ দেওয়া হল সে যেন শেষ পর্যন্ত কয়েদীকে রাখার চেষ্টা করে। এরই মধ্যে নওয়াজেস খান তাড়াতাড়ি এসে আমীর-উল-উমরাহের কাছে জানাল, ইলিচরাম সত্যিই ছাড়া পেয়েছে, আর মুহম্মদ আমীন ঝিলের কাছে ঘাসী জমিতে ছাউনী নিতে বাধ্য হয়েছে,হ্রদের চারপাশ ঘিরে সে ঘাষীজমি। এই সংবাদ চুপি চুপি আমীর-উল-উমরাহ্ আমাকে জানালেন। আগ্রা দুর্গের রাজকীয় মিনারের দিকে সেই কোলাহল এগিয়ে আসছিল তরঙ্গের পর তরঙ্গে। আমি আমার মন্ত্রীকে বললাম, ঘটনাপ্রবাহ এমন এক জায়গায় এসে উপনীত হয়েছে, যখন চুপ করে থাকা অপরাধ বলে বিবেচিত হবে। আমি হুকুম দিলাম, 'তাহলে আপনি আপনার বাহিনী নিয়ে এগিয়ে যান এবং দুস্কৃতিকারীদের তাদের রাজদ্রোহিতার উপযুক্ত শাস্তি প্রদান করুন।' আমীর-উল-উমরাহ্, কথামত সেনাবাহিনী নিয়ে এগোলেন এবং বিদ্রোহীদের সঙ্গে যুদ্ধে রত হলেন। শেখ ফরিদ বখশীকে আমি তারপর হুকুম দিলাম এই বলে যে, সন্দেহ নেই সব রাজপুতরাই বিদ্রোহীদের সঙ্গে মিলিত হবে। তাহলে আমাদের বিপদের মাত্রা বেড়ে যাবে। আমি তার দরুন তাকে তার বাহিনী নিয়ে দেরী না করে আমীর-উল-উমরাহ্কে সাহায্যের জন্য অগ্রসর হতে নির্দেশ দিলাম।

শেখ ফরিদ চলে যাওয়ার পরপরই, লড়াইয়ের কোলাহল বিক্ষোভ ক্রমশ জোরদার হয়ে উঠল। আমি শাহী মিনারে উঠে সেখান থেকে নীচের দিকে তাকিয়ে দেখলাম। দুপক্ষই ভয়ংকর ভাবে যুদ্ধে রত। কমপক্ষে বিশ হাযার রাজপুত অশ্বারোহী বিদ্রোহীদের সঙ্গে যোগ দিয়েছে। তারা সবাই, তরবারি ও ছুরি হাতে, আমীর-উল-উমরাহের বাহিনীর দিকে এগিয়ে এসেছে। অন্যপক্ষে, যুদ্ধে নিপুণ আমীর-উল-উমরাহ দুশমনের বিরুদ্ধে যুঝে চলেছেন। তাঁর বাহিনীর সাহসী ও দক্ষ সৈন্যদের মধ্যে কুতুব খান অন্যতম, সেই কুতুব খান অন্যান্য বীরদের সঙ্গে আমার চোখের সামনেই বিদ্রোহীদের তরবারির আঘাতে ধরাশায়ী হল। আরও বহুলোক হতাহত হল। দিলওয়ার খান অন্যান্যদের সঙ্গে কুতুব খানের সাহায্যে এগিয়ে এসেছিল। তাকে ঘোড়া থেকে টেনে নামিয়ে টুকরা টুকরা করে ফেলা হল। তার সঙ্গে আর যারা এসেছিল তাদেরও একই ভাগ্য হল। আমীর-উল-উমরাহের সাহায্যের জন্য আমি তিন হাযার সৈন্য পাঠিয়ে দিলাম। তাদের পেয়ে আমীর-উল-উমরাহ ফের হামলাকারীদের উপর ঝাঁপিয়ে পড়লেন। বহুসংখ্যক রাজপুত তাঁর হাতে মারা গেল।

সেই মুহূর্তে শেখ ফরিদ মন্ত্রীর সাহায্যে এগিয়ে এল। তার সঙ্গে ছিল দশ হাযার অশ্বারোহী এবং পাঁচ হাযার উটের পিঠে বন্দুকধারী সৈনিক। তারা সবাই অস্ত্রশস্ত্রে সজ্জিত এবং শৃঙ্খলাবদ্ধ। এই মিলিত বাহিনী সঙ্গে সঙ্গেই রাজপুতদের অভিযান ঠেকিয়ে দিল। এইভাবে বহুক্ষণ ধরে প্রচণ্ড লড়াই চলবার পরে জনৈক রাজপুত তরবারি হাতে শেখ ফরিদকে আক্রমণের জন্যে এগিয়ে এল। শেখ ফরিদ সামনের দিকে একটি পতাকার নীচে দাঁড়িয়েছিল। তার এক পার্শ্বচরের হাত থেকে বর্শা ছিনিয়ে নিয়ে এত জোরে শেখ ছুঁড়ে মারল যে রাজপুতের বক্ষ ভেদ করে তা

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

পিঠ দিয়ে বেরিয়ে গেল। দুস্কৃতিকারী এইভাবেই নরকের পথে পাড়ি দিল। শাহী বাহিনীর বিশাল শক্তি এখন পরিস্ফুট হয়ে উঠল এবং বহু সংখ্যক রাজপুত প্রাণ হারাল। যারা বাঁচল তারা দিশাহারা হয়ে পালাল। তাদের ভেতর চার হাযারের মত রাজপুতকে বন্দী করা হল। তাদের সবাইকে আমার নির্দেশে হাতীর পায়ে দলে পিষে মেরে ফেলা হল, যাতে আর কেউ তাদের পদাঙ্ক অনুসরণের চেষ্টা না করে। সেই সঙ্গে, জ্যান্ত উদাহরণ হিসাবে, বিদ্রোহীদের নেতা ভক্তরামকে গোয়ালিয়রের দুর্গে আবদ্ধ করে রাখার নির্দেশ দিলাম, যাতে করে চক্রী ও বিদ্রোহপ্রবণ ব্যক্তিরা অমন রাজদ্রোহী ও জঘন্য পরিকল্পনায় ভবিষ্যতে মত্ত না হয়।

এই উপলক্ষে বাহাদুর খান নামক জনৈক উজবেক সর্দার মন্তব্য করেছিলেন, তাঁর দেশের কোন রাজার বিরুদ্ধে যদি অমন বিদ্রোহ অনুষ্ঠিত হত, তাহলে পুরা গোত্রটিকে শাখাশুদ্ধ পৃথিবীর বুক থেকে বিলুপ্ত করে দেওয়া হত। জবাবে আমি বলেছিলাম, আমার পিতার সেনাবাহিনীতে এরা সবাই ছিল এবং এই রাজপুতরা তাঁর কাছে অসীম আস্কারা পেয়েছে, তাদের সমান অন্যান্য গোত্রের চেয়ে তারা বেশী সম্মান লাভ করেছে, তার দরুন, তাদের বোধ হয় মনে হয়েছে তারা উচ্চতর শ্রেণীর জীব, এইসব কথা আমি ভুলে যেতে পারি না। তবু গুটিকয় বিপথচারী ব্যক্তির অপরাধের জন্য সম্পূর্ণ গোত্রের উচ্ছেদ সাধন ন্যায় বিচারের সঙ্গে সঙ্গতিপূর্ণ নয়। নবীর হিসাবে, যারা অপরাধী তাদের শাস্তি দেওয়াই যথেষ্ট।

আমি এখন আমার সরকারের বিশ্বাসভাজন ব্যক্তিদের উপঢৌকন ও পদোন্নতির সুখকর প্রসঙ্গে ফিরে যাব। কাবুলবাসী কাজী আবদুল্লাহকে পাঁচশো থেকে পাঁচ হাযারী মনসবদারীতে উন্নীত করেছিলাম। যদিও খাজা মুহম্মদ ইয়াহিয়ার পুত্র খাজা জাকারিয়া কোন ব্যাপারে দোষী সাব্যস্ত হয়েছিল, তবু আমি তাকে পাঁচশো মনসবদারী দিয়েছিলাম। শেখ হোসেন জামীর সুপারিশেই আমি অমন করেছিলাম। তিনি আমাদের যুগে পবিত্র জীবনযাপনের জন্য অনন্য। সিংহাসনে আরোহণ করবার ছমাস পূর্বে আমি শেখ হোসেনের কাছ থেকে একটি আরেজদস্ত (বা স্মারক-নামা) লাভ করেছিলাম। তাতে উল্লেখ করা হয়েছে, সমস্ত বিরোধিতা সত্ত্বেও, আল্লাহ আমাকে হিন্দুস্তানের তখতে নিশ্চিতই বসাবেন। তিনি স্বপ্নে তাই দেখেছেন। যদি তাই ঘটে, তাহলে পূর্ব থেকে আমার সমৃদ্ধির ভবিষদ্বাণী করবার জন্য, আমি যেন খাজা ইয়াহিয়ার পুত্রের অপরাধ মার্জনা করে দিই। এই কারণেই আমি তাকে মার্জনা ও পদোন্নতি, দুইই করে দিয়েছিলাম।

তাস খান বেগমও কাবুলের বাশিন্দা। তিনি তাস খান উপাধি আমার পিতার কাছ থেকে পেয়েছিলেন। তাঁর সেই উপাধি বহাল রেখে আমি তাকে দুহাযারী মনসবদারীর পদে ভূষিত করেছিলাম। সেই সঙ্গে তাকে উপঢৌকন হিসাবে দিয়েছিলাম সুসজ্জিত একটি ঘোড়া, পাগড়ি চূড়া ও কিরিচ। পাগড়ি চূড়া ও কিরিচের মূল্যবান পাথর বসান ছিল।

ইনি আমাদের সবচেয়ে পুরান অনুচরদের অন্যতম। আমার পিতামহ

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

হুমায়ূনের কালে তিনি সৈনিক হিসাবে খুব নাম করেছিলেন এবং আমার চাচা মুহম্মদ হাকিম মীর্জার অধীনে আমীরের পদে অধিষ্ঠিত ছিলেন। তাঁর এখন অনেক বয়স হয়েছে। দাড়ির কৃষ্ণাভা ঘুচে যাওয়া সত্ত্বেও, তাঁর চেহারার আকর্ষণীয়তা এখনও অক্ষুণ্ন রয়েছে।

কাবুলের আর একজন বাসিন্দাকে পদোন্নতির জন্য আমি মনোনীত করেছিলাম। তাঁর নাম বিহাজা বেগ খান। পনের শত থেকে তিন হাযারী মনসবদারীতে আমি তাঁকে উন্নীত করে দিয়েছিলাম। এই সর্দারটির প্রচুর বাস্তবনিষ্ঠ দক্ষতা আছে এবং উল্লিখিত মুহম্মদ হাকীমের আমীর দলের ভিতর ইনিই সবার বেশী শ্রদ্ধা লাভ করেন। অত্যন্ত সাহসী প্রকৃতির লোক তিনি। সাবেক সৈনিক হওয়া সত্ত্বেও, তিনি একজন নিষ্ঠাবান মুসলমান, ধর্মীয় কাজ তিনি গভীর নিষ্ঠার সঙ্গে পালন করে থাকেন। আমি এখানে শুধু উল্লেখ করব, বেশ কদিনের মধ্যেই ঐ গোত্রের প্রায় শ'খানেক ব্যক্তিকে আনুষঙ্গিক উপঢৌকন শুদ্ধ পদোন্নতি করে দিয়েছিলাম।

মীর্জা আবুল কাসেম একহাযারী আমীর ছিলেন। তাকে আমি পনের শত অশ্বারোহীর অধিনায়ক পদে উন্নীত করেছিলাম। তিনিও আমার পিতার পুরান অনুচরদের অন্যতম। সৈন্য হিসাবে ভালই এবং অন্যান্য ক্ষেত্রেও কার্যোপযোগী। বিস্ময়কর যে তাঁর ত্রিশটি সন্তানের কোন সন্তানই কাজের হয়নি। এটা সত্যি দুঃখজনক যে, বহু সন্তানের পিতা হয়েও সংখ্যার অনুপাত অনুযায়ী তেমন কোন সুযোগ সুবিধা লাভ করেন নি।

আজমীরের শেখ সেলিমের পৌত্র শেখ আলীকে আমি খান উপাধিতে ভূষিত করেছিলাম এবং দুহাযারী আমীরের পদে তাকে অধিষ্ঠিত করেছিলাম। সেই সঙ্গে তাকে আমি উপঢৌকন দিয়েছিলাম পঞ্চাশ হাযার টাকা, তাঁর শ্রদ্ধেয় আত্মীয়ের ওরস পালনের জন্য। শৈশবকাল থেকেই শেখ আলী আমার সঙ্গে একই প্রাসাদে বেড়ে উঠেছিল। সে আমার মাত্র এক বছরের ছোট। অত্যন্ত দুর্ধর্ষ প্রকৃতির সৈন্য, সারা গোত্রে তার সঙ্গে তুলনা করবার মত কেউ নেই। পানীয় কিংবা আফিম সম্পর্কে তার কঠোর অনাসক্তি, তার দরুন তার কাছ থেকে আমি অনেক কিছু পাওয়ার প্রত্যাশী। সত্যি কথা বলতে কি তাকে আমি নিজের সন্তান বলেই মনে করি।

সৈয়দ আলী আসাফকে আমি সইফ খান উপাধিতে ভূষিত করেছিলাম। বাওরার সৈয়দদের তিনি বংশধর এবং সৈয়দ মুহম্মদের পুত্র। সৈয়দ মুহম্মদ ছিলেন আমার পিতার দরবারের শ্রেষ্ঠ আমীরদের একজন। তিনি খাঁটি সৈয়দ বংশোদ্ভূত। পুত্র ঐ জাতির যোগ্য সন্তান। কথা সর্বস্ব নয় তাঁর চরিত্রও। মানুষের মধ্যে এর চেয়ে আর কি ভাল গুণ থাকতে পারে আমার জানা নেই। সেই লোককে আমি ঘৃণা করি যে পরিণাম না ভেবে কাজ করে নয়তো না ভেবেচিন্তেই কথা বলে। তাঁর সারা জীবনে সইফ খান বাজে কোন কাজ করেছেন বলে আমার জানা নেই। পানীয় থেকে তিনি দূরে থাকেন। এই বছরেই তাঁকে শীর্ষস্থানীয় আমীরদের পদে বরণ করবার ইচ্ছা আমার আছে।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

এরপর, মুহম্মদ কুলী খানের পুত্র ফিরিদুনকে একহাযারী থেকে দুহাযারী মনসবদারীতে পদোন্নতি করে দিয়েছিলাম। ফিরিদুন খ্যাতনামা বংশোদ্ভূত। শৌর্যবীর্যে কি দ্যানধ্যানে তিনি খাটো নন। তাঁর সাহস এমন যে তাঁর সম্পর্কে প্রচলিত আছে তিনি বেশ কয়েকবার সিংহের সঙ্গে লড়াই করেছেন। এক হাতে পশু লোমজ জমাট বস্ত্র জড়িয়ে ও অন্য হাতে ছুরি নিয়ে তিনি ভীষণ এই পশুকে হত্যা করার চেষ্টা করেন, এক হাত সিংহের থাবার দিকে বাড়িয়ে, অন্য হাতে ছুরিকাঘাত করে সিংহটিকে বধ করেন। রাজা গানুম ফুল কোন পরগণা কি জেলার জমিদার ছিলেন। সেই জমিদার ও অনুচরদের সঙ্গে ফিরিদুনের লড়াই চলছিল। তিনি একাই ঐ জমিদারকে দ্বৈরথ সমরে আহ্বান করেন। শরীরের বহু জায়গায় আঘাত পাওয়া সত্ত্বেও, ফিরিদুন তাকে পরাজিত করতে সক্ষম হয়েছিলেন।

আমি এখন একটি ঘটনার উল্লেখ করব। ঘটনাটি হচ্ছে বন্ধুত্ব বনাম কর্তব্যের দাবীর দ্বন্দ্ব, যা আমার মনে যথেষ্ট দু:খ সঞ্চার করেছিল। খানে আজমের পুত্র মীর্জা নূরকে হত্যাপরাধে আমার সামনে হাযির করা হয়েছিল। যুবকটি আমার পিতার অত্যন্ত স্নেহভাজন, তাকে আমার পিতা নিজ সন্তানের মতই ভালবাসতেন। যুবকটিও তাঁকে খুশী করবার জন্য যথাসাধ্য চেষ্টা করত। এইসব কারণে, ফরিয়াদীদের সঙ্গে তাকে অবিলম্বে কাযী ও মীর আদেলের (বিচার মন্ত্রী) কাছে নিয়ে যাবার জন্য নির্দেশ দিয়েছিলাম। কাযী ও মীর আদেলকে আমি নির্দেশ দিয়েছিলাম আইন-অনুযায়ী যা সত্য হয় তাই করবার জন্য। যথাসময়ে বিচার বিভাগের এ দুজন কর্মচারীর কাছ থেকে একটি রিপোর্ট আমার সামনে উপস্থাপিত করা হল। সেই রিপোর্টে উল্লিখিত, খানে আজমের পুত্র মীর্জা নূর ইচ্ছাকৃত ভাবে মানুষ হত্যার অপরাধে দোষী বলে সাব্যস্ত এবং মুহম্মদের আইন অনুযায়ী; রক্তের বদলা একমাত্র রক্তেই সম্ভব।' পুত্রের প্রতি আন্তরিক স্নেহ ও পিতার প্রতি গভীর শ্রদ্ধা থাকা সত্ত্বেও, আল্লাহর বিধানের অন্যথা করা আমার পক্ষে অসম্ভব বলে মনে হল। আমি হাযারও অনিচ্ছা সত্ত্বেও, তাকে জল্লাদের হাতে সঁপে দিয়েছিলাম।

পরবর্তী এক মাস তার মৃত্যুর জন্য আমি গভীর দুঃখ অনুভব করেছিলাম, তার মত তরুণ ও নানা সদগুণাবলী বিশিষ্টর মৃত্যুতে আমার মন শোকে ছেয়ে গিয়েছিল; কিন্তু যতই খারাপ লাগুক না কেন, এইসব ক্ষেত্রে দ্বিতীয় পন্থা নেই; আমরা যদি আমাদের বিরক্তিকর দায়িত্ব পালনে বিচ্যুত হই, তাহলে ক্ষুব্ধ ব্যক্তিমাত্রই তার প্রতিপক্ষের উপর জিঘাংসা মেটাবার জন্য সময় ও সুযোগের অপেক্ষায় থাকবে। তার দরুন, যে ব্যক্তি তার স্বদেশের আইন লজ্ঘন করে, তার শাস্তির ব্যবস্থা ত্বরান্বিত করা ছাড়া শাসকের বিকল্প কোন পথ নেই। (এরপর চৌদ্দটি শ্লোকের উল্লেখ আছে। তার সমাপ্তিসূচক মন্তব্য : সুলাইমানের খ্যাতির উৎস তাঁর অবিচল ন্যায়নিষ্ঠাই।)

খানে আজম তাঁর পুত্রের মৃত্যু সংবাদ শুনলেন; কিন্তু আল্লাহর নির্দেশের অন্যথা হওয়ার জো নেই ভেবে কিছুদিন দু:খ ভারাক্রান্ত চিত্তে কাটিয়ে, মন থেকে সেই দুঃখের ছায়া অপসারিত করে দিতে সক্ষম হলেন। বিশিষ্ট এই আমীর

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

সম্পর্কে এখানে আমি উল্লেখ করতে চাই যে, নাস্তালিক লিখন রীতিতে তাঁর অপূর্ব দক্ষতা, কুরআনের আয়াত আবৃত্তিতে তিনি অনন্য এবং পূর্বোল্লিখিত নকীব খানের পরেই, অতীত ঘটনা ব্যাখ্যানেও তাঁর জুড়ি নেই।

খানে আজমের মতই আসফ খানও কুরআনের ভাল আবৃত্তিকারক, সুবক্তা এবং সানন্দচিত্ততায় তিনি তুলনাহীন। আমার পিতার দরবারে আমীরদের মধ্যে তিনিই সবচেয়ে বিশিষ্ট যোগ্যতা সম্পন্ন। তাঁর সম্পর্কে আমার গভীর শ্রদ্ধা আছে। তার প্রমাণ পাওয়া যাবে আমি যে তাঁকে চাচা বলে ডাকি–তা থেকেই। সত্যি কথা বলতে কি, তাঁর এত গুণাবলী আছে, ব্যক্তিগত ও বুদ্ধিগত, যা সচরাচর মানুষের মধ্যে দেখা যায় না; কিন্তু তাঁর চরিত্রে এমন একটি দোষ আছে যা তাঁর সব গুণাবলী ঢেকে দেওয়ার জন্য যথেষ্ট; কৃপণ তিনি, মানুষের চরিত্রে এর চেয়ে বাজে দাগ আর কি হতে পারে, বিশেষ করে তাঁর মত উচ্চপদে অধিষ্ঠিত ব্যক্তির পক্ষে। কারণ, অর্থলিপ্সার বীজ ইহকাল ও পরকাল, দুই-ই পংকিল করে দেয়। আমি খুব ভেবে দেখিছি, দয়াদাক্ষিণ্যের চেয়ে বড় গুণ মনের পক্ষে আর কিছু নেই। আর একটি দোষের জন্য তার বিরুদ্ধে অভিযোগ করা যেতে পারে। তিনি কোনদিন নামায পড়েছেন কিনা জানা যায়নি। এই অমার্জনীয় ত্রুটির জন্য তিনি অজুহাত দেন এই বলে যে, নামায তিনি পড়তে পারেন না নানা প্রলোভনের দরুন, কারণ ঐ সব প্রলোভনে তিনি সবসময়ই আক্রান্ত। আমার পিতার অনুমতি নিয়ে যদিও তিনি মক্কায় গিয়ে গভীর একাগ্রতায় হজ্বের পবিত্র অনুষ্ঠানাবলী পালন করে এসেছেন, তবু হজ্বব্রতীর কর্তব্য তাঁর মনে কখনও আসে না। হিন্দুস্তানে ফিরে আমার পিতার সঙ্গে মিলিত হওয়ার পর, ধর্মীয় কর্তব্যচ্যুতি তাঁর পূর্ববৎ থেকেই গেছে।

AMARBOI.COM

মুয়েজউলমুলক-কে আমি পাঁচশো থেকে একহাযারী মনসবদারীতে উন্নীত করে দিয়েছিলাম। তাঁর আসল নাম মুয়েজউদ্দীন হোসায়েন। আমার পিতার অধীনে তিনি স্বর্ণকার বিভাগের তত্ত্বাবধায়ক ছিলেন। তাঁর উপাধি বহাল রেখে আমি তাঁকে আমার প্রাসাদাবলীর দিওয়ান পদে অধিষ্ঠিত করে দিয়েছিলাম। অন্যান্য দিক থেকে তাঁর পদোন্নতির যে দাবীই থাক না কেন, তাঁর আত্যন্তিক সরল মন সত্যের প্রতি তাঁর নিষ্ঠার ইঙ্গিতবহ, তাছাড়াও, লিখনকর্মেও তাঁর পটুত্ব আছে। শেখ বায়যীদ আজমীরের শেখ সেলিমের আর একজন পৌত্র। তাঁকে আমি দুহাযারী থেকে তিনহাযারী মনসবদারীতে উন্নীত করে দিয়েছিলাম। শেখ বায়যীদের জননীরই স্তন্যদুগ্ধ আমি প্রথম পান করেছিলাম। তাছাড়া তাঁর (শেখ বায়যীদ-এর) নিজের বিচার বিচক্ষণতাও অনন্য; যে কাজের ভার তাঁকে দেওয়া হোক না কেন, সে কাজ সফল না হয়ে যায় না।

একদিন বিকালে আমি কয়েকজন পণ্ডিতের সঙ্গে আলোচনা করছিলাম। হিন্দু সমাজে শাস্ত্রজ্ঞ শিক্ষিত ব্যক্তি ঐ নামেই পরিচিত। আমি তাঁদের বললাম, যে-সব প্রতীকের তাঁরা উপাসনা করেন, সেইসব প্রতীক কোন না কোন ভাবে প্রকৃতি কি ঈশ্বরের প্রতিভূ বলে ধরা হয় অথচ আমরা জানি সর্বশক্তিমান বিশ্বনিয়ন্তা পরিবর্তন

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

কিংবা ধ্বংসের অতীত, তাঁর দৈর্ঘ্য অথবা প্রস্থ নেই, তার দরুন তিনি অদৃশ্যমান, যদি তাই হয় তাহলে ঐ প্রতীক উপাসনার কি অর্থ হয়? অথবা তার চেয়ে উদ্ভট ব্যাপার আর কি হতে পারে? আর অপূর্ণাঙ্গ কল্পনা শক্তি নিয়ে মানুষের পক্ষে তাঁকে একটা বিশেষ আকারের মধ্যে কল্পনা করা কি করে সম্ভব? আমি আরও বললাম, 'পক্ষান্তরে ঐশ্বরিক জ্যোতি অমন সব প্রতীকে উদ্ভাসিত এই যদি আপনাদের ধারণা হয়, সে ক্ষেত্রে আমরা জানি যে ঐশ্বরিক শক্তি সমস্ত অস্তিত্বে পরিব্যাপ্ত' ভস্মীভূত বুনো ঝোপের মধ্য থেকে ইসরাইলের নবীর কাছে এই বার্তা ঘোষণা করা হয়েছিল। অন্যপক্ষে স্রষ্টার কোন একটি গুণের সঙ্গে একাত্মতা বোধ করাই যদি আপনাদের উদ্দেশ্য হয়, সেক্ষেত্রে আমাদের বলতেই হবে এই মর্ত্য ভূমিতে একাত্মতা বলে কোন কিছুই নেই। তা যদি থাকত, তাহলে যে কোন ধর্মে, যাঁদের মোজেজা (অলৌকিক ঘটনা) প্রদর্শনের ক্ষমতা আছে বলে আমার বিশ্বাস করে থাকি, যাঁরা কি জ্ঞানে কি ক্ষমতার কি মানবীয় গুণের সম্পূর্ণতায় অন্যান্যদের চেয়ে ঢের বড় তাঁরাই ঐ উদ্ভাসন প্রদক্ষিণ করতে পারতেন। এইসব প্রতীক পূজা যদি আপনারা মেনে নেন এবং ধরে নেন এই পূজারীতির মধ্য থেকে আপনারা ঐশ্বরিক সাহায্য ও সমর্থন লাভ করবেন, তাহলে ভয়ংকর সিদ্ধান্তে এসে পৌছাতে হয়, তার কারণ, উপাসনা হচ্ছে আল্লাহতায়ালার একার, যিনি অনন্ত গৌরবের অধিকারী, যাঁর সমকক্ষ কেউ নেই, যাঁর কোন সঙ্গীও নেই। পক্ষে ও বিপক্ষে নানা যুক্তিজাল বিস্তারের পর, বুদ্ধিমান গুটিকয় পণ্ডিত তাঁদের যুক্তির দুর্বলতা সম্পর্কে খুব সম্ভব অবহিত হয়েছিলেন। শেষ পর্যন্ত তাঁরা বলেই ফেললেন যে, এইসব প্রতীক না থাকলে মনস্থির করে পরমশক্তির ধ্যান করা তাঁদের পক্ষে অসম্ভব হয়ে পড়ে। জবাবে আমি শুধু এই মন্তব্য করেছিলাম, কি করে এইসব প্রতীকের পক্ষে আল্লাহতায়ালার ধ্যানে সাহায্য করা সম্ভব হতে পারে।

আমার পিতা আকবরের এইসব পণ্ডিতদের সঙ্গে সব বিষয়ে আলাপ আলোচনা করার অভ্যাস ছিল। তিনি হিন্দু সমাজের যাঁরা যথার্থ পণ্ডিত, তাঁদের সঙ্গে মেলামেশা করতেন। এই মেলামেশা থেকে তাঁর যে খুব সুবিধা লাভ হয়েছে তা নয়। তবে গদ্য ও পদ্য রচনায় তিনি বিলক্ষণ জ্ঞান অর্জন করেছিলেন। তাঁর মহান চরিত্র ও পদমর্যাদার সঙ্গে পরিচিত নয়, এমন ব্যক্তি ঐসব দেখে শুনে হয়ত ভেবে বসতে পারে বিজ্ঞানের প্রতিটি শাখায় তাঁর পাণ্ডিত্য বুঝি অপরিমেয়।

আমার স্মৃতিতে আমার পিতার চেহারা অনুক্ষণ দীপ্যমাণ থাকবে। তিনি দীর্ঘদেহী ছিলেন, গায়ের রং ছিল তাঁর লালাভ বাদামী, তাঁর চক্ষু ছিল কৃষ্ণ বর্ণের, তার উপরে শোভা পেত কালো জোড়া ভ্রূ। দেখতে তিনি সুন্দর ছিলেন, গায়ে ছিল তাঁর সিংহের শক্তি, তাঁর বুকের বিশাল বিস্তৃতি ও লম্বা হাত তার প্রমাণ। মোটকথা, সবকিছু মিলিয়ে তাঁর চেহারা অদ্ভুত আকর্ষণীয়। তাঁর নাকের উপর ছিল কালো একটি তিল, গণকরা তা দেখে বলেছিলেন ঐ তিল বিরাট সৌভাগ্যের ইঙ্গিতবহ। তিনি সৌভাগ্যবান ছিলেন না একথা মোটেই বলা যায় না। পঁয়ষট্টি বছর ধরে তিনি প্রবল প্রতাপে হিন্দুস্তানে রাজত্ব করে গেছেন, যে সাম্রাজ্য

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

অতিক্রম করতে দুবছর দরকার এবং যেখানে তাঁর কোন প্রতিদ্বন্দ্বী ছিল না।

তাঁর ঐশ্বর্য কি বিপুল ছিল তার ধারণার জন্য আমি একটি ঘটনার উল্লেখ এখানে করছি। কিলিজ খানকে একদিন তিনি হুকুম দিয়েছিলেন রাজকীয় খাজাঞ্চীখানাগুলিতে কি পরিমাণ শুধু সোনা আছে তার হিসাব দেওয়ার জন্য। ঐ কর্মচারী আগ্রার খাজাঞ্চীখানার সঞ্চিত সোনার পরিমাণ দেওয়ার যথাসম্ভব প্রয়াস পেয়েছিল। সে শহরের নানা বণিক থেকে চারশো জোড়া দাড়িপাল্লা যোগাড় করে দিনরাত পাঁচ মাস ধরে অনরবত কাজ করেছিল মুদ্রা ও দুর্লভ পাথরের ওজন নেওয়ার জন্য। পাঁচ মাস পরে আমার পিতা জানতে চাইলেন কত মন সোনার ওজন নেওয়া হয়েছে। জবাব এল, পাঁচ মাস ধরে হাযার লোক দিনরাত চারশো জোড়া দাড়িপাল্লা দিয়ে অনবরত একটি খাজাঞ্চীখানার ওজন নেওয়া সত্ত্বেও, তাদের পক্ষে কাজ শেষ করা সম্ভব হয়নি। আমার পিতা খবর পাঠালে যেখানে যা আছে তা রেখে দিয়ে তালাচাবি বন্ধ করে ফিরে আসার জন্য। বলাইবাহুল্য, এ হচ্ছে একটি শহরের খাজাঞ্চীখানা মাত্র।

তিনি যে পিলখানা বানিয়েছিলেন তার সমতুল্য পৃথিবীর কোন রাজার আগেও ছিল না, কখনও হবেও না। কারণ, কারও পক্ষে বার হাযার বড় হাতী ও কুড়ি হাযার মাদী হাতীর সমাবেশ করা সম্ভব হবে না, তাদের খাবারের জন্য দিনে খরচ হয় চার লক্ষ টাকা, সে টাকা ইরাকের বার হাযার তমানের সমান। তাঁর[২৫] শিকারখানাও অমন বিশাল ছিল। শিকারের জন্য তাঁর ছিল বার হাযার একচোখা হরিণ এবং নীলগাই, পাহাড়ী ভেড়া, গণ্ডার, উটপাখি ও ইলুত-এ-দরিয়াই[২৬] মিলে ছিল আরও বার হাযার।

রণহস্তী ও চিত্ত বিনোদনের জন্য কিছু হাতী রেখে, বাদবাকী আমি বিদায় করে দিয়েছিলাম। মোদ্দা কথা, ধনরত্ন কিংবা আসবাবপত্র ঐশ্বর্যের পরিচায়ক হিসাবে আমার পিতার যা জমেছিল, পৃথিবী পদানতকারী অজেয় তৈমুরের (আমার পিতা যাঁর অষ্টম অধস্তন পুরুষ) তাঁর দশ ভাগের এক ভাগও ছিল না। আমার পিতার উচ্চাশা ছিল বিরাট, তাঁর পূর্বসূরীদের ছাড়িয়ে যাওয়াই ছিল খুব সম্ভব তাঁর আকাঙ্ক্ষা।

তাঁর বিশ বছর বয়সে দৈবানুগ্রহে তাঁর প্রথম সন্তানের জন্ম হয়। সে সন্তানের নামকরণ করা হয়েছিল ফাতেমা বানু বেগম; কিন্তু এক বছর বয়সে তাঁর মৃত্যু ঘটে। তার জননী বিবি পাঙ্গারী। বিবি আরাম বখশের গর্ভে তাঁর দুই সন্তানের জন্ম হয়। তাদের নাম হাসান ও হোসেন রাখা হয়েছিল। হোসেনকে আসফ খানের জননী বিরিজা বেগমের কাছে দেওয়া হয়েছিল পালন করবার জন্য; কিন্তু সে বেঁচে ছিল মাত্র আঠার দিন। জীন খান কোকার কাছে হাসানের ভার অর্পণ করা

---

২৫. প্রথম শ্রেণীর হাতীর দৈনিক খরচ প্রায় চৌত্রিশ টাকার মত।

২৬. ইলুতে দরিয়াই বলতে কি বোঝান হয়েছে বলা মুস্কিল; খুব সম্ভব জলহস্তী বা ঐ জাতীয় কোন সামুদ্রিক প্রাণী হবে।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

হয়েছিল। কিন্তু দশ দিনের বেশী সে বাঁচেনি। তাদের পরে, বিবি সেলিমা বেগমের গর্ভে তাঁর এক কন্যাসন্তান জন্মে। সে মেয়ের তিনি নাম রেখেছিলেন শাহযাদা খানম। সে মেয়ের ভার তাঁর আপন জননী মরিয়ম মাকুনীর হাতে অর্পণ করা হয়েছিল। আমার বোনদের মধ্যে তিনিই আমার সবচেয়ে বড় শুভার্থিনী; কিন্তু বেশীর ভাগ সময়ই তিনি আল্লাহর এবাদতে মগ্ন থাকেন।

এরপর, বিবি খিরার গর্ভে তাঁর এক সন্তানের জন্ম হয়। তার নাম তিনি রেখেছিলেন পাহাড়ী। তার বয়স হলে পিতা তাকে দাক্ষিণাত্যের যুদ্ধের ভার অর্পণ করেছিলেন। সে গোয়াইল, পার্ণালাহ এবং অন্যান্য দুর্গ অধিকার করেছিল এবং নর্মদা নদীর দক্ষিণ ভূভাগ পদানত করবার ব্যাপারে সাফল্যজনক দক্ষতা দেখিয়েছিল। মাত্র ত্রিশ বছর বয়সে খানপুরে এই শাহযাদার মৃত্যু ঘটে। আমার পিতা তাকে সুলতান মুরাদ নামে ভূষিত করেছিলেন। হিন্দুস্তানী ভাষায় উচ্চ দেশের নাম পাহাড়। ফতেপুরের পাবর্ত্য অঞ্চলে তার জন্ম হয়েছিল বলে পিতা তাকে পাহাড়ী বলে ডাকতেন। সুলতান মুরাদের গায়ের রং ময়লা, চিকন চেহারা, একটু লম্বাটে ধরনের। তার মেজাজ নম্র ও অভিজাত সুলভ, কাজের ক্ষেত্রে তিনি সাহসী। তার আচরণ ছিল ধীরস্থির, তার দরুন পিতা তাকে প্রাসাদ ও নির্মাণ বিভাগের তত্ত্বাবধায়কের পদে বরণ করেছিলেন।

মেহের শামার গর্ভে আমার পিতার এক কন্যাসন্তানের জন্ম হয়। তার নাম তিনি রেখেছিলেন মিঠি বেগম। হিন্দুস্তানী মিঠির মানে মিষ্টি। মেয়েটি অবশ্য আট মাসে মারা যায়। এরপর বিবি মরিয়মের গর্ভে তাঁর পুত্রসন্তানের জন্ম হয়। এই সন্তানের তত্ত্বাবধানের ভার রাজা ভারমলের উপর অর্পণ করা হয়।

সুলতান মুরাদের মৃত্যু হলে পর আমার ভ্রাতা শাহযাদা দানিয়েলকে দাক্ষিণাত্য বিজয় সম্পূর্ণ করবার জন্য পাঠান হয়েছিল। বরহামপুরের দিকে পিতা নিজেই অগ্রসর হচ্ছিলেন। বরহামপুরে সুলতান দানিয়েল খানখানান ও নানা শ্রেণীর বিশিষ্ট আমীর, শাহী সেনাবাহিনীর বিরাট এক বাহিনী নিয়ে আগেই এসে পৌছেছিলেন। সেই সময় আহমদনগর দুর্গের পতন ঘটে। পিতা ফের বরহামপুরে এসে সুলতান দানিয়েলকে দাক্ষিণাত্যের শাসক নিযুক্ত করে আগ্রায় ফিরে এসেছিলেন। বহরামপুরেই ত্রিশ বছর পার হতে না হতেই দানিয়েলের মৃত্যু হয়: তার মৃত্যুর কারণ অত্যধিক মদ্যাসক্তি।

তার মৃত্যুর সঙ্গে এমন সব গুরুত্বপূর্ণ ঘটনা জড়িত, সেগুলির উল্লেখ এখানে আমি না করে পারছি না।

শিকারের সখ তার প্রবল ছিল। বিশেষ এক বন্য মোরগ শিকারে তার ছিল ক্লান্তিহীন উৎসাহ। মোরগ শিকারের জন্য একটি বন্দুক ছিল, তার নাম দিয়েছিল সে জানাজা। জানাজার উপর একটি শ্লোক সে উৎকীর্ণ করিয়েছিল :

তোকে শিকারের খুশীতে
মন আমার হয় উচ্ছলিত
কিন্তু যাঁর বুকে বেঁধে তীর
প্রাণ হারিয়ে সে পড়ে 'জানাজায়'।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

দানিয়েলের বিশ্রী ও অত্যধিক মদ্যাসক্তির কথা আগেই আমি উল্লেখ করেছি। সেই মদ্যাসক্তির পরিমাণ এবার মাত্রা ছাড়িয়ে গেল। খান খানানের নির্দেশক্রমে আদেশ দেওয়া হল যেন তাকে মদ সরবরাহ না করা হয়, যাদেরকে মদ সরবরাহ প্রচেষ্টায় ধরা যাবে, তাদের শাস্তি হবে মৃত্যু। শাস্তির ভয়ে বেশ কিছুদিন তার কোন পরিচারক মদের নাম পর্যন্ত উচ্চারণ করতে সাহস পায়নি। এই ভাবেই বেশ কদিন গেল কেটে। তার অভ্যাসিক আসক্তি থেকে দূরে থাকা আর সহ্য করতে না পেরে অশ্রুসজল চোখে দানিয়েল মুর্শীদকুলীকে উপরোধ জানাল অল্প হলেও বিষাক্ত সেই মদ যোগাড় করে দিতে। সে যদি তার উপরোধ রাখে তাহলে তাকে তার ইচ্ছামত পদোন্নতি করা হবে। মুর্শীদকুলী দানিয়েলের গোলন্দাজ বাহিনীর একজন সৈনিক। মুর্শীদকুলী শাহযাদার কথায় গলে গিয়ে তাকে শুধাল, মৃত্যুর শাস্তি ও জানাজানি এড়িয়ে কি করে তাকে মদ এনে দেওয়া যায়। দানিয়েল জবাব দিল, এই মুহূর্তে মদের একফোঁটা জীবন সমান–আমার বন্দুকের নলে ভরে মদ নিয়ে এস। দুবার তিনবার আনলেই চলবে। কেউ জানবে না, সন্দেহও করবে না। উপরোধে কাবু হয়ে দানিয়েলের কথা মত মুর্শীদকুলী কাজ করল। জানাজার (বন্দুক) নলে ভরে মদ তার প্রভুর কাছে নিয়ে এল। ঐ অশুভ নাম তারই দেওয়া, নিয়তিরই লিখন বন্দুকের নলে আনা মদ পান করা কি শব-খাটে শুয়ে থাকা এদুই-ই সমান–দানিয়েল ঐ মদ গিলে মারা গেল; এবং ঘটনাটি সত্য বলে ঐ সম্পর্কে বেশী কথা বলা উচিত নয়।

দানিয়েল একই সঙ্গে ভোজনপ্রিয় ও পানাসক্ত ছিল, যা সচরাচর হয় না; কিন্তু তার একটা উদ্ভট উচ্চাশা ছিল, যা অন্য সব কিছুকে ছাড়িয়ে গিয়েছিল, সেটি হচ্ছে ভাল জাতের একদল হাতীর অধিকারী হওয়া। সেই উচ্চাশার মাত্রা এমন ছিল, যদি তার কোন আমীরের হাতী আকারে কি জাতে বড় হত, তাহলে যে-ভাবেই হোক সে কেড়ে নিত, কখনও কখনও বিনিময়ে অর্থপ্রদানের সামান্যতম অনুষ্ঠানটি পর্যন্ত ভুলে যেত। এ প্রসঙ্গে পরে আরও বলা যাবে। মোটকথা, তার ক্ষমতার পরিধির ভিতর সে নিজেকে ছাড়া অন্য কাউকে বড় হাতীর মালিক হতে দিত না। পরিশেষে আমি বলব হিন্দুস্তানী সঙ্গীতের প্রেমিক ছিলেন এই সুলতান দানিয়েল। হিন্দী কবিতাও মন্দ আবৃত্তি করতেন না।

আমার পিতার সন্তানসন্ততিদের প্রসঙ্গে ফিরে আসা যাক। নান বিবির গর্ভে তাঁর যে-কন্যাসন্তানের জন্ম হয় তার নাম তিনি রেখেছিলেন লালা বেগম। এই কন্যার তত্ত্বাবধানের ভার তিনি তাঁর জননীর হাতে অর্পণ করেছিলেন। আঠার মাসে মেয়েটির মৃত্যু ঘটে। এরপর, বিবি দৌলত শাহের গর্ভে তাঁর একটি কন্যা সন্তানের জন্ম হয়। তার নাম তিনি রেখেছিলেন আরাম বানু বেগম। এই মেয়েকে তিনি খুবই ভালবাসতেন, আমাকে তিনি প্রায়ই বলতেন, তিনি যখন আর এই পৃথিবীতে থাকবেন না, তখন আমি যেন তাকে ওভাবেই স্নেহ করি। তাঁর কথা আমার স্মৃতিতে চিরদিনের জন্য অমলিন থাকবে।

পিতা সম্পর্কে আরও কিছু বলব। যৌবনে তিনি ভোজনপ্রিয় ছিলেন। ভাল

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

খেতে পারাটা আনন্দের ব্যাপার এবং একটা বর হিসাবে তিনি মনে করতেন। তবু বিধাতার অসীম ক্ষমতা সম্পর্কে তাঁর বিনীত মনোভাব ছিল। তাঁর বিশাল ও অজেয় বাহিনী, অগণিত রণহস্তী, অমিত ঐশ্বর্য ও বিশাল সাম্রাজ্য, সব থাকা সত্ত্বেও মুহূর্তের জন্য তিনি আল্লাহর কথা ভুলে যেতেন না। আল্লাহ ছিল তাঁর ধ্যান, তাই তাঁর ঠোঁটে সব সময় এই শ্লোক উচ্চারিত হত, যে-জায়গায় যে-অবস্থায়, যে মানুষের সঙ্গেই থাক না কেন, সেই অনাদি অনন্ত বন্ধুর দিকে তোমার হৃদয় ও দৃষ্টি উন্মুক্ত রেখ।

তাঁর চরিত্রের সবচেয়ে বড় বৈশিষ্ট্য ছিল, সব ধর্মের মর্মেই কোন সংস্কার ছাড়াই তিনি মিলেমিশে যেতে পারতেন; আর সুযোগ পেলেই দ্বিধা না করে তিনি সব ধর্মের জ্ঞানীগুণীদের সঙ্গে মেলামেশা করতেন। তাঁর জীবনের প্রায় রাতই অমন সামাজিক উৎসবে অতিবাহিত হত। এখানে একথা বলে নেওয়া ভাল, দিনরাত মিলিয়ে তাঁর ঘুমের সময় এক প্রহরের বেশী হত না।

তিনি ছিলেন অকুতোভয় ও নিঃশঙ্কচিত্ত। প্রায়ই তাঁকে দেখা যেত মাদী হাতীর পিঠ থেকে ঝাঁপিয়ে পড়ছেন দুরন্ত ও অবাধ্য হাতীর সামনে, যে-সব হাতী বহু মাহুত মেরে ফেলেছে। যারা ঐসব বিশালকায় পশুর তত্ত্বাবধান করত তারা সবাই ঐ দেখে অবাক হয়ে যেত। কোন কোন সময় যখন মত্ত হাতী, মাদী হাতীর উপস্থিতিতে খেপে যেত, তখন তিনি গাছ কিংবা দেয়ালে চড়ে বসতেন এবং হাতীর সেখান দিয়ে যাওয়ার কালে কোন দ্বিধা না করে ঐ মত্ত হাতীর পিঠে লাফিয়ে পড়তেন। যে-অলৌকিক শক্তি বিধাতা তাঁকে দিয়েছেন, তারই প্রভাবে বুঝি হাতীটি তাঁর বশ মেনে যেত।

তাঁর অসাধারণ বাহুবলের একটি নযীর দেওয়া যাক। তিনি হিন্দুস্তানী দশ মন ওজনের বিশাল এক শিকল তৈরী করিয়েছিলেন। ইরাকী ওজনে যা হবে একশো মন। রোয সকাল বেলা ঐ শিকলটি তুলে নিয়ে বেড়াতেন। তাঁর অমন সহজ ঘোরাফেরা দেখে সবাই অবাক হয়ে যেত, কারণ ঐ শিকল তোলার জন্য দরকার প্রচণ্ড শক্তির।

সমর পরিচালনা, সামরিক বিদ্যায় তাঁর দক্ষতা ও ক্লান্তিহীন কর্মক্ষমতার নযীর হিসাবে দুটি ঘটনার উল্লেখ যথেষ্ট বলে আমি মনে করি।

এক-সবাই জানে আমার পিতামহ হুমায়ূনের মৃত্যুর পর পিতা যখন হিন্দুস্তানের সিংহাসনে আরোহন করেন, তখন তার বয়স চৌদ্দর বেশী নয়। সেই সংকট কালে বেঈমান হিমু নিজেকে আফগানদের রাজা বলে ঘোষণা করেছিল। আফগানরাও তাদের গোত্রের নেতা বলে তার পরিচয় দিত। সেই হিমু শাহী শাসনের অবসানের জন্য এগিয়ে এল সেনাবাহিনী নিয়ে। সংঘর্ষ হয়েছিল ঠিক বৃহিস্পতিবার দিনে, ৬ই মুহররমে, নয়শো তেষট্টি হিজরীতে (১৫৫৫ খ্রীস্টাব্দের ২০শে নভেম্বর)। ক্ষমতার দম্ভে এই ব্যক্তিটির যে মাথা ঘুরে গিয়েছিল তা আশ্চর্যজনক কিছু নয়। কেননা দুর্ধর্ষ ভারতীয় রাজাদের সঙ্গে দুটি রক্তক্ষরা যুদ্ধে সে জয়ী হয়েছিল, তাছাড়া এই যুদ্ধে তার অধিনায়কত্বে ছিল এক লক্ষ অশ্বারোহী, পঞ্চাশ হাযার

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

সাহসিকতার খ্যাতিও ছিল। সে পিতার কাছে একটি বার্তা পাঠাল এই বলে যে, তিনি তরুণ একথা তাঁর মনে রাখা উচিত এবং তাঁর পক্ষে হিমুর মত বিরাট ক্ষমতা সম্পন্ন রাজার সঙ্গে যুদ্ধে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করে জয়ী হওয়ার কল্পনা সাজে না। সে বলে পাঠাল 'আমার অগণিত অপ্রতিদ্বন্দ্বী সৈন্য ও রণহস্তীর কাছে তুমি এস না, যদি আস সংঘর্ষের ফলে তোমারই ক্ষতি হবে। যমুনার পূর্ব পাড় থেকে বাংলার প্রত্যন্ত সীমা পর্যন্ত সব ভূভাগ তোমাকে দিচ্ছি, হিন্দুস্তানের বাদবাকী অংশ আমার হবে। পিতা জবাবে তাকে সামান্য এক হিন্দু নায়কের নগণ্য বাহিনীর সঙ্গে জয়ী হওয়ার মধ্যে গর্ব করার যে কিছু নেই তা অনুধাবন করতে বললেন। নিজের ক্রীতদাসের উপর শিকল জড়ানোর কৃতিত্ব কোথায়? 'বীরদের সঙ্গে যুদ্ধের অভিজ্ঞতা কিংবা আমার গোত্রভুক্ত যোদ্ধাদের বীরত্বের কথা জানা নেই বলে, সমান শক্তির সঙ্গে লড়াইয়ের ভয়ংকরতা আপনি কি করে ধারণা করবেন? যখন আলোর প্রভু তার মহিমার তরবারি কোষমুক্ত করেন, দিনের আগমনে রাত্রির ছায়া তখন যায় সরে। আগামী কাল সকালবেলা আপনার শক্তিশালী বাহিনী নিয়ে রণক্ষেত্রে আসবেন। তখন দেখা যাবে আল্লাহ কাকে দয়া করেন।'

আমার পিতার কাছ থেকে ঐ অগ্রাহ্যকারী জবাব পাওয়ার পর হিমু তার সেনানায়কদের সঙ্গে রণক্ষেত্রের পরিচালনা সম্পর্কে কাজে ব্যাপৃত হয়ে পড়ল। মূলবাহিনীর অগ্রভাগে এক ডিভিশন শক্তিশালী সৈন্য এক হাযার হাতী সহ রেখে বাকী দুহাযার হাতী পিছন দিকে রিজার্ভ হিসাবে রেখে দিল। এইভাবে সেনাবাহিনীর পুরাভাগে নিজেকে উপস্থিত করে যুদ্ধের জন্য সে গেল এগিয়ে। পিতা বিভিন্ন হাতীর উপর সামরিক বাদ্য বিতরণ করে দিলেন। তিনি পাঁচ হাযার অশ্বারোহী এবং এক হাযার শিক্ষিত হাতী নিয়ে অগ্রবর্তী ব্যূহ রচনা করে কোন দ্বিরুক্তি না করে তাঁর হাতীর উপর উঠে হিমুর একেবারে মুখোমুখি হাযির হলেন। বলে রাখা ভাল আমার পিতার সেনাবাহিনীতে ছিল পঞ্চাশ হাযার অশ্বারোহী এবং আট হাযার উষ্ট্রারোহী বন্দুকধারী। তীর ও বন্দুকের গুলী ছোড়ার মধ্যে দিয়ে যুদ্ধ শুরু হল, আর মাহুতরা যুদ্ধমান হাতীদের পরস্পরের বিরুদ্ধে খেপিয়ে তুলতে লাগল।

পিতার ভাগ্যদেবতা আত্মপ্রকাশ করলেন। একটা তীর হতভাগ্য হিমুর মাথার মধ্যে বিঁধে বেরিয়ে গেল এবং এভাবেই তার ভবলীলা সাঙ্গ হল। তার সেনাবাহিনী ঐ সংকট দেখে রণে ভঙ্গ দিয়ে ছত্রভঙ্গ হয়ে পালিয়ে গেল। তার এত অহঙ্কারের হাতী, ধনদৌলত, তার ঐশ্বর্যের সব সমারোহ এক ফুৎকারে মিলিয়ে গেল। শাহ্ কুলী খান মহররম তার কিছু অনুচর সহ বেঈমানের সিংহাসন যেখানে ছিল সেখানে গিয়ে পৌছল। ঐ সিংহাসন তৈরী করতে সোনা ও জহরত শুদ্ধ খরচ পড়েছে দুলক্ষ পাঁচ মিসকাল পরিমাণের আশরফির[২৭]। ঐ সিংহাসন বেশ কষ্ট করে লুটপাটের হাত থেকে রক্ষা করা হল এবং যে-হাতীর উপর ঐ সিংহাসন ছিল, সব

---

২৭. আঠার লক্ষ টাকা।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

নিয়ে সে পিতার কাছে হাযির হল। হিমুর ছেদিত মস্তক, সেইসঙ্গে তার হীরা, চুনী, রুবী ও ফিরোজা পাথর বসান টায়রা সেট ও (কারুকার্যখচিত পাগড়ি বা মুকুট) পিতার কাছে উপস্থাপিত করা হল। ঐ সেটের মূল্য ষাট লক্ষ আশরফি[২৮]।

এটা তাঁর প্রথম বিজয়, পিতা ঐ বিজয়কে তাঁর রাজত্বকালের শুভ সূচনা বলে মনে করলেন। বিজয়ের উন্মাদনায় তিনি ভাগ্যবান শাহ্ কুলী খানকে পাঁচহাযারী আমীরের পদে উন্নীত করে সেই সঙ্গে তাকে পতাকা ও নাকাড়ার তকমায় ভূষিত করলেন। এই বিজয়দৃপ্ত দিনের ফল হল বিশাল ঐশ্বর্য, তিন হাযার হাতী, পঞ্চাশ হাযার উট এবং নানাবিধ দ্রব্যসামগ্রী। এই উপলক্ষে পিতার মন্ত্রী বৈরাম খাঁন তাঁকে বেঈমানের উপর জয়ের লক্ষণ হিসাবে মৃতদেহে আঘাত হানার কথা বলেছিলেন। জবাবে পিতা বললেন, কিছুদিন আগে, তাঁর পিতার গ্রন্থাগারে সময় কাটাবার জন্য চিত্রকর আবদুস সামাদের আঁকা ছবি দেখছিলেন। একটি মুখাবয়ব তাঁর হাতে এনে দেওয়া হয়েছিল। পরিচারকদের জিজ্ঞাসা করে তিনি জানতে পারেন মুখাবয়বটি হীমুর। তিনি বললেন, 'তক্ষুণি ছবিটি আমি ছিঁড়ে টুকরা টুকরা করে ফেলে দিই। লোকটি তার কৃতকর্মের শাস্তি ভোগ করেছে। সেই সময়েই আমি লোকটির উপর জয়ী হয়েছি বলে আমার মনে হয়েছে।'

এই যুদ্ধে নিহতদের সংখ্যা গণনা করতে গিয়ে দেখা গেল যে চৌদ্দ হাযার বেদীনের মৃত্যু ঘটেছে। আহত ও পলাতকদের সংখ্যা বাদ দিয়ে অবশ্য।

দ্বিতীয়ত ফতেহপুরে যখন তাঁর কাছে খবর এসে পৌঁছল মীর্জা ইব্রাহিম হোসেন ও মীর্জা শাহ মীর্জার নেতৃত্বে গুজরাটের জনসাধারণ আহমেদাবাদ নগর অবরোধ করে রেখেছে, পিতা তাঁর বিশ্বস্ত পরিচারকদের নিয়ে মন্ত্রণালয় বসলেন কি করে ঐ আক্রমণাত্মক পরিস্থিতি মোকাবিলা করা যায়। নানা ধরনের সৈন্য অবশ্য খানে আজমের[২৯] অধিনায়কত্বে আহমেদাবাদ নগর রক্ষা করছিল। খানে আজমের জননী বিবি বেগম, যিনি পিতার ধাই-মা, পিতার বিশেষ ইচ্ছাতেই মন্ত্রণা সভায় হাযির ছিলেন। তাঁর বিশ্বস্ত মন্ত্রণাদাতাদের কথামত ঠিক হল যে একটি বাহিনী নিয়ে পিতা নিজেই বিদ্রোহীদের বিরুদ্ধে অভিযানে বের হবেন, তাহলে সহজেই প্রতিকূল পরিস্থিতির অবসান হবে। বলে রাখা ভাল, ফতেপুর যেখানে পিতার দরবার, সেখান থেকে গুজরাট দু'মাসের পথ। তবু, সাজসরঞ্জাম যোগাড় করে, সেনাবাহিনী নিয়ে, জোর কদম চালিয়ে চৌদ্দ দিনে গুজরাটে উপস্থিত হয়ে তাঁর দুশমনদের মুখোমুখী এসে দাঁড়ালেন। ঐ যাত্রা দিনরাত চলেছিল, কখনও ঘোড়ায় চড়ে, কখনও বা উটের পিঠে, তার দরুন সাধারণ ভাবে দুমাসের পথ চৌদ্দ দিনে তিনি তা শেষ করেছিলেন।

সেদিন ছিল বুধবার, নয় শত আশি (৯৮০) হিজরীর জামাদিউসসানী

২৮. পাঁচ কোটি চল্লিশ লক্ষ টাকা।

২৯. তিনি ছিলেন আকবরের দুধ-ভাই, তাঁকে মীর্জা (খোকাও) বলা হয়।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

মাস[৩০]। বিদ্রোহীদের কাছাকাছি আসার পর, যখন নিকটে শাহীদুর্গের কোন চিহ্নও দেখা গেল না; জল্পনা শুরু হল দুশমনদের উপর নৈশ আক্রমণ করা সুবুদ্ধির কাজ হবে কিনা। অমন আক্রমণে পিতার আপত্তি, তিনি বললেন নৈশ আক্রমণ কমজোর ও মতলববাজদের কাজ। পরদিন ভোর বেলা তিনি যুদ্ধের বিশাল বাদ্য বাজানোর আদেশ দিলেন। পঁয়তাল্লিশ জোড়া নাকাড়া ও বিশটি তাতার শিঙ্গা একসঙ্গে উঠল বেজে। অপ্রত্যাশিত ঐ বাদ্য শুনে সোরগোল উঠল দুশমনদের শিবিরে। এতদিন ধরে অবরুদ্ধ নগরীর দিকেই তাদের দৃষ্টি কেন্দ্রীভূত ছিল।

তাঁর ঘোড়ায় চড়ে একটু এগিয়ে পিতা সবরমতী নদীর দক্ষিণ পাড়ে এসে হাযির হলেন, দেখলেন অন্য পাড়ে একদল দুশমন, তৎক্ষণাৎ সৈন্যদের আদেশ দিলেন এ ভাবেই নদীতে ঝাঁপিয়ে পড়ে যেভাবেই হোক অন্য পাড়ে উঠবার জন্য। তিনি সেই সঙ্গে দেখলেন যে দক্ষিণ পাড়ে জঙ্গলে ভর্তি, তার দরুন যুদ্ধের জন্য অনুপযুক্ত ভূমি, নৌকা সংগ্রহের জন্য তিনি যদি বিন্দুমাত্র দেরি করেন, তাহলে দুশমনদের মধ্যে সাহস সঞ্চারিত হবে। সেই সাহস সংক্রামক হতেও পারে।

এই বিস্মিত ও হতচকিত অবস্থায় মুহম্মদ হোসেন মীর্জা একদল হাল্কা অস্ত্রে সজ্জিত বাহিনী নদীর পাড়ে পাঠিয়ে দিল, সোবহান কুলী তুর্কীনায়ক যিনি অন্য পাড়ে এগিয়ে এসেছেন তার কাছে জানবার জন্য ঐ অজানা ব্যূহের মানে কি এবং কে ব্যূহের সেনাপতি? এই বদনসীব ও অজ্ঞ লোকেদের তুর্কী নায়ক জানাল, যে সেনাবাহিনী তারা তাদের সম্মুখে দেখতে পাচ্ছে, তা হচ্ছে শাহী সেনাদলের অগ্রবাহিনী এবং সম্রাট স্বয়ং সেখানে উপস্থিত। যদিও ভয়ে তাদের হৃদকম্প উপস্থিত হল, তারা আতঙ্কিত হয়ে উঠল, তবু তারা এই সংবাদের সত্যতা মেনে নিতে রাযী হল না। 'কি বাজে কথা বলছেন!' ভ্রান্ত এই লোকগুলি বলে উঠল, চৌদ্দ দিন আগে আমাদের চর ফতেপুরে সম্রাটকে দেখে এসেছে। হাতী ও সরঞ্জাম নিয়ে সেনাবাহিনীর দু'মাসের আগে এখানে পৌঁছন সম্ভব নয়। এটা তাই মিথ্যা কথা। যারা এই কথা বলছে তারা অহেতুক অনর্থ ও প্রচারণা সৃষ্টিকারী ভবঘুরে ও ভণ্ড বৈ কিছু নয়।'

পিতা যুদ্ধের ব্যূহ রচনার জন্য সৈন্যদলকে নির্দেশ দিলেন। তবু কিছু দেরি হল; কিন্তু ক্ষুদ্র বাহিনী খবর পাঠাল যে দুশমনরা যুদ্ধের জন্য প্রস্তুত হচ্ছে; তিনি তখন নদী পার হবার নির্দেশ দিলেন। ঐ সংকট কালে, খান খানানকে তাঁর জায়গা ছেড়ে চলে আসার নির্দেশ দেওয়া সত্ত্বেও তিনি সেই নির্দেশ পালন না করে, বরং পিতার কাছে লিখে পাঠালেন যে, দুশমনদের সৈন্যসংখ্যা বিরাট, গুজরাটের বড় চার জন রাজপুত্র তাদের সঙ্গে হাত মিলিয়েছে, তাদের প্রায় সজ্জিত দু'লক্ষ অশ্বারোহী ও কুড়ি হাযার উষ্ট্রারোহী বন্দুকধারী আছে, তারা হয় জিতবে নয় মরবে বলে দৃঢ় সংকল্প, তাছাড়া তাদের ত্রিশ হাযার উষ্ট্রে বোঝাই রকেট আছে। তিনি যা বললেন তাতে নিশ্চয়ই বুদ্ধিমত্তার পরিচয় আছে। সুতরাং যতক্ষণ

৩০. ১৫৭২ খ্রীস্টাব্দের অক্টোবর মাস।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

পর্যন্ত খান খানান, খানে দুররান ও খান জাহানের নেতৃত্বাধীন সৈন্যের সঙ্গে শাহী বাহিনী মিলিত না হচ্ছে, সে অবস্থায় ছোট একটি দল নিয়ে নদী পার হয়ে বিশাল দুশমন বাহিনীর মুখোমুখি হওয়া কোন প্রকারেই যুক্তিসঙ্গত নয়।

জবাবে পিতা বললেন তিনি সব সময়ই এবং বিশেষ করে এই অবস্থায় সবচেয়ে বেশী আল্লাহর করুণা ও সাহায্যে আস্থাবান। মানবীয় বুদ্ধির উপর ভরসা রাখলে তিনি কখনই তাঁর ভীষণ দুশমনদের সম্মুখে প্রায় একা এসে হাযির হতেন না। তিনি বললেন, এটা নিয়ে আমাদের করবার কিছু নেই। যা তাঁর ইচ্ছা তাই হবে; কিন্তু দুশমনরা এগিয়ে আসছে, এখন দ্বিধা বিব্রত হয়ে শত্রুদের মনে সাহস জাগিয়ে তোলা চূড়ান্ত বোকামি হবে।'

তাঁর অশ্বারোহী বাহিনী ও প্রধান সেনাপতিরা বহু পিছনে পড়ে, যারা তাঁর সঙ্গে তাঁদের সংখ্যাও পাঁচ হাযারের বেশী হবে না এবং উপস্থিত আমীরগণ মূল বাহিনী পৌছান পর্যন্ত দেরী করবার জন্য বলা সত্ত্বেও, পিতা সব সতর্ক বুদ্ধি প্রতিহত করে যুদ্ধ করবার সংকল্পে অটল হয়ে থাকলেন। এই সংকট মুহূর্তে তিনি হঠাৎ ঘোড়া থেকে নেমে পড়ে কেবলামুখী হয়ে সেই পরম করুণাময়ের সাহায্য বিনম্র ঐকান্তিকতার সঙ্গে প্রার্থনা করলেন, কেননা আল্লাহই জয় দানকারী ও সর্বঅস্তিত্বের স্রষ্টা। আল্লাহর সাহায্যে সম্পূর্ণ আস্থাবান হয়ে ফের তিনি ঘোড়ায় উঠে, সেই বিরল সৌভাগ্যবানদের সঙ্গে, নিঃশঙ্ক চিত্তে নদীতে ঝাঁপিয়ে পড়ে আল্লাহর করুণায় ও তাঁর বংশের বিজয়ী সৌভাগ্যে অন্য পাড়ে এসে উপস্থিত হলেন। যারা তাঁর সঙ্গে সেই সময় ছিল সর্বসাকুল্যে তাদের সংখ্যা পাঁচ হাযার অশ্বারোহীর বেশী হবে না। পিতা তখন তাঁর গাত্রাবরণী চাইলেন। তাঁর এক পরিচারক রাজা দেবচাঁদের হাতে সেটা দেওয়া হয়েছিল। তারা জানাল গাত্রাবরণী হারিয়ে গেছে নয়ত তাড়াহুড়ার মধ্যে নদীর স্রোতে ভেসে গেছে। পিতা বললেন, 'এও শুভ লক্ষণ। যুদ্ধ করবার নানা পথ এভাবে প্রশস্ত হয়ে উঠবে এবং বিনা ঝঞ্ঝাটে আমরা যুদ্ধে জয়ী হয়ে আসব।'

শাহী সৈন্য এর মধ্যে ছোট ছোট দলে ভাগ হয়ে নদীর পাড়ে এসে হাযির হচ্ছে এবং নদীর মধ্যে ঝাঁপিয়ে পড়ছে। সম্রাটের দেহরক্ষীর সংখ্যা দেখতে দেখতে দশ হাযার ঘোড়সওয়ারে এসে পৌছল, সেই সঙ্গে মিলল এসে এক হাযার হাতী এবং দুহাযার বারুদী। মীর্জারা তাদের নিয়তি নির্দিষ্ট সর্বনাশের দিকে গেল এগিয়ে, তারা স্থানুর মত দাঁড়িয়ে রইল বিশাল এক সৈন্যদলের অগ্রভাগে, যে সৈন্যদল শাহীপ্রভুর বিরুদ্ধে যুদ্ধে প্রস্তুত, যে-প্রভু তাদের দয়াদাক্ষিণ্যে সিঞ্চিত করেছেন তার প্রতিদানে তারা এই অকৃতজ্ঞ আচরণে উদ্যত।

খানে আজম ভেবে উঠতে পারেননি যে তাঁর প্রভু সৈন্য নিয়ে এত বিস্ময়জনক ভাবে এসে হাযির হবেন। তিনি এখন শহর ছেড়ে এলেন, পিতার পদতলে নিজেরে আনত করে বারবার বলতে লাগলেন তিনি তাঁর ইন্দ্রিয়ের বোধশক্তি বিশ্বাস করে উঠতে পারছেন না। আসফ খান ও আহমেদাবাদের অন্যান্য বিশিষ্ট আমীরগণ খানে আজমের পর এসে একে একে বাদশাহর সম্মুখে হাযির হলেন।

হঠাৎ পাশের জঙ্গলের গাছের অন্তরাল থেকে একদল শত্রু সৈন্য এসে হাযির। আল্লাহর প্রতি নির্ভরশীল পিতা ঐ হামলা প্রতিরোধে উদ্যত হলেন। মুহম্মদ কুলী খান ও তের খান দিওয়ানা, কেন্দ্র ব্যূহের আরও কয়েকজনের সঙ্গে সামনে এগিয়ে গেল; কিন্তু ক্ষীণ প্রচেষ্টার পর দুশমনদের হামলায় তারা পিছিয়ে গেল পিতা ক্রোধান্ধ হয়ে রাজা ভগবান দাসকে (অম্বরের) সংক্ষেপে বললেন, দুশমন বাহিনী যত শক্তিশালী হোক না কেন, তিনি স্বীকার করছেন তিনি যা ভেবেছিলেন তার চেয়ে বেশী, তবু তরবারি হাতে যুদ্ধ করা ছাড়া তাদের গত্যন্তর নেই। তিনি বললেন, 'যদি আমরা পলায়নে উদ্যত হই, তাহলে আমাদের ভীরুতায় তারা সাহসী হয়ে উঠবে, আর আমাদের কেউই পালিয়ে বাঁচতে পারব না। আল্লাহ্‌র ক্ষমতায় আস্থাশীল হয়ে আমরা এখানে এসেছি। সঙ্ঘবদ্ধ ভাবে আমাদের দুশমনদের প্রতিরোধ করা উচিত; আর দুশমনরা ত অপরাধ ও রক্তে নিমজ্জিত, সে সম্পর্কে কোনই সন্দেহ নেই। খালি হাতে নয়, মুষ্টিবদ্ধ হাতে আমাদের কাজ সমাধা করতে হবে।

এ মুহূর্তে মুহম্মদ হোসেন মীর্জা দুশমনদের বাহিনী ছেড়ে সম্মুখের দিকে এল এগিয়ে। তা দেখে শাহ কুলী খান মহররম ও হোসেন খান তুর্কোমান বলে উঠল, 'আক্রমণের সময় উপস্থিত হয়েছে', হর্ষোৎফুল্ল মনে পিতা তাতে সায় দিলেন। তিনি বললেন, তোমাদের জন্য আল্লাহর সাহায্য আমি পেয়েছি এবং সময় এসে গেছে। তারা আস্তে আস্তে সামনের দিকে এগিয়ে এল এবং শত্রুপক্ষের মুখোমুখি দাঁড়াল।

পিতা সে সময় তাঁর প্রিয় এক ঘোড়ার পিঠে সমাসীন ছিলেন, সে-ঘোড়ার নাম তিনি রেখেছিলেন খোপারা। হাতীর সামনে বহুবার ঘোড়াটি এগিয়ে গেছে বলে প্রচলিত। আপাদমস্তক বর্মে আবৃত হয়ে, হাতে বর্শা নিয়ে এবং কোমরে কিরিচ বেঁধে, তাঁর সভার বিশিষ্ট বীরদের সঙ্গে নিয়ে আক্রমণের জন্য উদ্যত হলেন। যুদ্ধবাদ্য বেজে উঠল, হাতীর উপরে পঁয়তাল্লিশ জোড়া নাকাড়া, ত্রিশটি শিঙ্গা ও পঞ্চাশটি বাঁশী বেজে উঠল একসঙ্গে এবং সমস্ত সেনাবাহিনী আল্লাহ-হু-আকবর আওয়াজ তুলে তরবারি হাতে ঝাঁপিয়ে পড়ল শত্রুপক্ষের উপর।

পিতার ভীতিজনক যে-খ্যাতি ছিল, তার প্রভাবে, বাঁ পাশের ব্যূহ ছত্রভঙ্গ হয়ে গেল; কিন্তু শাহীসৈন্যের বাঁ দিক মুহম্মদ হোসেন মীর্জা প্রতিহত করে রাখল। হোসেন মীর্জা ঐ দিকে বেশ এগিয়েও এল। যুদ্ধে জয়লাভ করার অমন বিশ্বাসও তার মনে জেগে উঠেছে। সম্মুখ বাহিনীর কিছু সৈন্য অল্প সময়ের জন্য এসে হোসেন মীর্জার অভিযান আটকে রাখল।

এই অবস্থার মধ্যে, পিতার দিকে চারপাশ থেকে গোলাগুলী অবিরল ছোড়া হচ্ছে। বিদ্রোহী একজন সর্দার বারুদ ধরিয়ে দিল, ভুল করে সেই বারুদ গিয়ে পড়ল তাদের একটি হাতীর উপর, সেই হাতীর উপর মওজুত ছিল পাঁচশো' মন মরণ-বারুদ, সেগুলিতে বিস্ফোরণ ঘটল, একটার পর একটা, তাদেরই বাহিনীতে ঐ বারুদ গিয়ে পড়ল একই সঙ্গে অন্যান্য হাতী ও উটের উপর, যে-সব হাতী ও

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

উট ধ্বংসকর বারুদ বহন করছে, সেইসব বিস্ফোরিত হল। ভীতচকিত হয়ে হাতীর দল তাদের সেনার উপর গিয়ে পড়ল, ভীষণ অব্যবস্থা সৃষ্টি হল, বারুদ লেগে প্রায় পঞ্চাশ হাযার ঘোড়া ধ্বংস কিংবা পঙ্গু হয়ে গেল। ঐ ভীষণ বিস্ফোরণ লোকজনের মধ্যেও আতঙ্কের সঞ্চার করল, যে যে-দিকে পারল ছুটে পালাল। একথা বলা যেতে পারে চূড়ান্ত ধ্বংসের শিকারে পরিণত হল গোটা বাহিনী।

পিতা কিছুদূর এগিয়ে ঘোড়ার রাশ টেনে ধরলেন। তিনি দেখছিলেন শত্রুপক্ষের অদ্ভুত আতঙ্ক, তাদের পলায়নপর দৃশ্য, মনে হচ্ছে হাযার হাযার যোদ্ধা প্রতিহিংসা মেটাবার জন্য তাদের পিছনে ছুটে চলেছে। এই অবস্থায় তাঁর কাছে অল্প কয়েক জন দেহরক্ষী, মুহম্মদ হোসেন মীর্জা তার বাহিনী নিয়ে পিতার উপর ঝাঁপিয়ে পড়ল। বেশ কিছুক্ষণের জন্য তাঁর ব্যক্তিগত নিরাপত্তা বিপদসঙ্কুল হয়ে উঠল। তাঁর অনুচর মানসিংহ দরবারী প্রভুকে বাঁচাবার চেষ্টায় সফল হল; কিন্তু তাঁর আর এক অনুচর রাজা রঘুদাস ঐ জায়গায়ই নিহত হল। তৃতীয় অনুচর একজন বিশ্বস্ত ওয়াফাদার। হাতে সে তিনবার আঘাত পেয়েছে, ঘোড়া থেকে নেমে সে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে লড়াই করছিল তাঁর প্রভুর জীবন রক্ষার্থে।

সৌভাগ্যবশত হামলাকারীরা জানত না যে তারা সম্রাটের সামনেই হাযির। সেই সংকট কালে দেখা গেল শত্রুপক্ষের তিন জন অশ্বারোহী তাঁর দিকে সরাসরি এগিয়ে আসছে। তাদের দুজন তাঁকে খেয়াল না করার দরুন আক্রমণ না করে পাশ দিয়ে বেরিয়ে গেল; কিন্তু তৃতীয় জন একেবারে তাঁর কাছে এসে গেল। শিরস্ত্রাণবাহীর কাছ থেকে বর্শা কেড়ে নিয়ে পিতা তার বুকে বিদ্ধ করতে উদ্যত হতেই, লোকটি মার্জনা ভিক্ষা করে বসল, বলল, তাঁর সামনে দুর্লভ সুযোগ উপস্থিত সে কথাই সে বলতে এসেছে; কেননা বারুদ বিস্ফোরণের দরুন শত্রুপক্ষ আতঙ্কগ্রস্ত, তাদের প্রতিরোধ করবার শক্তি ও সাহস কোনটাই নেই। এইসব কথা বলে সে নিজে রেহাই পেয়ে গেল চলে।

পরে অবশ্য জানা গেল যে, এই তিনটি লোক সম্রাটকে হত্যা করবার দায়িত্ব নিয়েছিল, কিছু পুরস্কারের লোভেই তারা অমন করেছিল; কিন্তু তাঁর কাছে উপস্থিত হওয়ার পর, তাঁর রাজকীয় মূর্তি দেখে দুজন আততায়ী ভয় পেয়ে ঘোড়ার লাগাম ঘুরিয়ে অন্যদিকে গিয়েছিল চলে। তৃতীয় জন সাহস ভরে সম্রাটের একেবারে কাছে এসেছিল, কিন্তু তাঁকে বর্শা তুলতে দেখে, মৃত্যু ছাড়া অন্য কোন পথ নেই ভেবে, তাঁর জয় ঘোষণা করে সে বেঁচে যেতে চেয়েছিল, ঐ চাতুরী করে সে জীবন নিয়ে বেঁচে যেতে পেরেছে। পিছু না হটে পিতা ঐ অসম যুদ্ধ চালিয়ে যেতে লাগলেন, যতক্ষণ পর্যন্ত মধ্য ব্যূহের সেনাদল কাছে এসে শত্রুপক্ষের ছত্রভঙ্গের সঠিক খবর দিতে লাগল। তিনি তারপর নির্দেশ দিলেন শাহী সৈন্যরা যতদূর সম্ভব পলাতকদের পিছু পিছু যাবে, তাদের কেউ যেন জীবিত অবস্থায় পালাতে না পারে।

তারা এখন দ্রব্যসম্ভার সংগ্রহ করল, সে সম্ভারের মধ্যে আছে দু-হাযারের মত হাতী, দু'হাযার মূল্যবান ইরাকী ঘোড়া, তাও বর্মসজ্জিত, পঞ্চাশ হাযার খচ্চর,

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

ছোট ছোট বন্দুক তাদের পিঠে। ঐ সব তারা হাযির করল গিয়ে পিতার সম্মুখে। সুজাত খান এই মহান বিজয়ের জন্য তাঁকে অভিনন্দন জানালেন। এই জয়ের কারণ, তার মতে, আল্লাহর ইচ্ছায় তার সঙ্গে যুক্ত সম্রাটের মহান নিয়তি। সে আরও বলল, কেউ ভেবে উঠতে পারেনি সম্রাটের আকস্মিক উপস্থিতির কথা, কিংবা শক্তিধর শত্রুপক্ষের বাহিনীর পরাজয় অমন অদ্ভুত ভাবে সাধিত হবে।

আল্লাহকে কৃতজ্ঞচিত্তে ধন্যবাদ জানিয়ে পিতা ধীরে সুস্থে আহমেদাবাদ শহর অভিমুখে রওয়ানা হলেন। তখন তাঁর কাছে বলা হল, সৈয়ফ খান খোকা বীরোচিত মৃত্যুবরণ করেছেন যুদ্ধক্ষেত্রে এবং সে তার স্রষ্টার করুণা লাভের উদ্দেশে গেছে চলে। খবর শুনে মুহূর্তের জন্য গভীর শোকাপ্লুত হলেন তিনি, কিন্তু আত্মসংবরণ করে তিনি তাঁর দুধভাইয়ের বিশদ সমাচার শুনলেন। সৈয়ফ খান খোকা জয়েন খানের ভাই।

ঘটনাটি অদ্ভুতজনক। আহমেদাবাদের যুদ্ধের কিছুদিন আগে পিতা তাঁর আমীরদের জন্য এক উৎসবের আয়োজন করেছিলেন। সেখানে গুটিকয় শানাবিন[৩১] উপস্থিত ছিল। তাদের কাছে তিনি জানতে চাইলেন আসন্ন যুদ্ধে জয় কার হবে। কোন দ্বিধা না করে তারা জবাব দিলেন যে, জয় তাঁরই হবে, কেননা এ তাঁর উপঢৌকন, কিন্তু তাঁর একজন বিশিষ্ট আমীর যুদ্ধে শহীদ হবেন। সেই রাত্রেই সৈয়ফ খান পিতাকে জানাল তারই কপালে যেন এটা ঘটে, কেননা তার উপকারীর সেবার জন্যই সে মরতে এসেছে। সে যা চেয়েছিল তা-ই হল। যুদ্ধে সে মুখে দুটি আঘাত পায়, মুখ ঢেকে সে তাড়াতাড়ি নিজেকে তাঁর প্রভুর কাছে হাযির করতে চেয়েছিল, কিন্তু পথে মুহম্মদ হোসেন মীর্জার বাহিনী তাকে বাধা দেয়, তরবারি হাতে সে শেষতক লড়াই করে মৃত্যুর কবলে লুটিয়ে পড়ে।

মুহম্মদ হোসেন মীর্জা, যে নিজেকে গুজরাটের রাজা বলে ঘোষণা করেছিল, যুদ্ধে হেরে গিয়ে সে বাবলা গাছের ঝোপের পাশ দিয়ে পালাচ্ছিল, বাবলা গাছের কাঁটা সরু ও তীক্ষ্ণ, সে-কাঁটা তার ঘোড়ার পায়ে গেল বিঁধে, ঘোড়া গেল পড়ে, মীর্জাকে এবার পায়ে হেটে দৌড়াতে হল। সেই মুহূর্তে গেদা আলী বেগ, আমার পিতার সম্মুখে হাযির হবার যার অবাধ অনুমতি আছে, পলাতককে ধরে ফেলে, হাত পেছনে বেঁধে, যাতে সে পালাতে না পারে, ঘোড়ার পিঠে তুলে, তাকে পিতার কাছে এনে হাযির করল। অন্য দুজন ব্যক্তিও তাকে ধরে এনেছে দাবী করায়, পিতা বন্দীকে নির্দেশ দিলেন ঠিক কথা বলবার জন্য। বন্দী সর্দার জবাব দিল, 'হায়রে! নিমকহারামীই আমার বন্দীত্বের কারণ।' তার মানে আমার সম্রাট আমার প্রতি যে-দয়া দেখিয়েছেন, তার প্রতি অকৃতজ্ঞতার অপরাধই আমাকে ফাঁদে ফেলেছে। তার অমন দুঃখে করুণায় পিতার মন ভরে গেল, পিতা নির্দেশ দিলেন পেছন থেকে তার হাত খুলে দিতে। মানসিংহ দরবারীর হাতে তারপর তাকে সঁপে দেওয়া হল; কিন্তু মির্জা এক ঢোক পানি খাবার জন্য আবেদন জানালে মানসিংহ

৩১. দৈবজ্ঞ

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

দুহাতে তাকে নির্দয়ভাবে মাথায় বাড়ি দিতে থাকল, পিতা রুষ্ট হয়ে তা থামিয়ে দেন এবং অনুচরদের নির্দেশ দেন হতভাগ্য এই লোকটিকে ছেড়ে দেওয়ার জন্য। মীর্জা তখন তার বিজেতাকে জানাল তাকে ছেড়ে দেওয়া এখনও যুক্তিযুক্ত হবে না, কারণ, গুজরাটের একজন রাজকুমার পরাজিত হয়েছে এবং বন্দী হয়েছে, বাকী তিন জন এখনও ঘুরে বেড়াচ্ছে, যারা হয়ত বিপদ ও আশঙ্কার কারণ হয়ে উঠতে পারে।

আস্তে আস্তে পিতা শহর অভিমুখে এগিয়ে চললেন। তিনি হোসেন মীর্জার ভার রাইসিংহের[৩২] হাতে এবার অর্পণ করলেন। রাইসিংহের কন্যা এখন আমার জেনানা মহলে। পিতা নির্দেশ দিয়েছিলেন হাত বেঁধে হাতীতে চড়িয়ে তাকে শহরে নিয়ে আসার জন্য। তিনি এভাবে যখন এগিয়ে যাচ্ছিলেন, হঠাৎ করে পাশের জঙ্গল থেকে একদল সৈন্য বেরিয়ে এল। তখন কেউ বুঝে উঠতে পারেনি এরা কারা। পরে জানা গেল এরা গুজরাটি বাহিনীর, ত্রিশ হাযার সৈন্য তাদের সঙ্গে, তাদের নেতৃত্বে আছে এখতিয়ার-উল-মুলক প্রদেশের ক্ষমতাবান নায়কদের অন্যতম, সে বলল সম্রাটের কাছে নযরানা দেবার জন্যই সে চলছিল।

শাহী সৈন্য, স্বভাবতই, অকস্মাৎ এই শত্রুবাহিনীর আবির্ভাবে সচকিত হয়ে উঠেছিল। পিতা সামরিক বাদ্য ফের বাজাতে নির্দেশ দিলেন, আর তাঁর যোদ্ধারা ঘোড়ায় উঠে ফের কোষমুক্ত তরবারি বের করে লড়াইর জন্য প্রস্তুত হল। এর মধ্যে রাজা মানসিংহ[৩৩], সুজাত খান এবং রাজা ভগবান দাস[৩৪] কিছু হাল্কা বাহিনী নিয়ে এগিয়ে গিয়ে যুদ্ধ শুরু করে দিল। সেই শত্রুপক্ষের উপর ঝাঁকে ঝাঁপে তীর, পাঁচ হাযার উষ্ট্রবাহিত বন্দুকের গুলী এবং দু'হাযার কামান থেকে একই সঙ্গে গোলা বর্ষিত হতে লাগল।

এই অবস্থার পরিপ্রেক্ষিতে রাজা ভগবান দাস পিতার কাছে এক বার্তা পাঠাল, তাঁকে স্মরণ করিয়ে দিল মুহম্মদ হোসেন মীর্জার পালিয়ে যাওয়ার ঝুঁকি নেওয়া উচিত হবে না, তার দরুন ভগবান দাস পিতার কাছে বিদ্রোহীর কল্লা নেওয়ার হুকুমের জন্য অনুরোধ জানাল, কারণ পরিস্থিতি ক্রমেই জটিল ও ভয়াবহ হয়ে উঠছে। পিতার মন করুণাপ্রবণ, তার দরুন অকৃতজ্ঞতা ও বিশ্বাসঘাতকতার হাযারও নযীর থাকা সত্ত্বেও, যত ন্যায্য হোক না কেন, অমন প্রতিহিংসাপরায়ণ কাজে তিনি কোন মতেই রাযী হলেন না। অবশ্য আর ঝামেলা না বাড়িয়ে ঘটনার যবনিকা পতন হল, রায় সিংহের ইশারায় রাজা ভগবান দাসের নির্দেশে হতভাগ্য মীর্জাকে হঠাৎ হাতীর পিঠ থেকে ফেলে দেওয়া হল এবং শের মুহম্মদ তার কল্লা করে দিল দুফাঁক।

ইখতিয়ার-উল-মুলকের প্রসঙ্গেই ফিরে আসা যাক। আর যুঝে উঠতে না

---

৩২. বিকানীরের রাজা

৩৩. অম্বরের ভাবী রাজা।

৩৪. অন্দরের রাজা।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

পেরে ঐ সর্দারটি সম্রাটের কাছে দূত পাঠাল আশ্বাসের বার্তা জানিয়ে, তার এ যাবৎ কোন কুউদ্দেশ্য নেই, তার বিনীত উদ্দেশ্য হচ্ছে শুধুমাত্র বাদশাহের কাছে নিজের আনুগত্য নিবেদন করা। আমরা দেখেছি, হঠাৎ বিপদধ্বনির সোরগোলের ভিতর শাহী সৈন্যরা আক্রমণ শুরু করে দিয়েছিল, তার দরুন ঐ বার্তা পৌছতেই পারেনি, সেজন্য সে পাহাড়ী এলাকার দিকে পলায়নে উদ্যত হল; কিন্তু পিছু পিছু ধাওয়া করে তুর্কীবাসী সোহরাব বেগ তাকে ধরে ফেলল এবং সোহরাব বেগ ঘোড়া থেকে নেমে দেরি না করে তার মস্তক করে দিল দুখণ্ড।

ঐ দেখে, তার যে-সব অনুচর ঘোড়ায় চড়েছিল, তারা নানাদিকে ছুটে পালাল, যদিও তাদের দশ হাযার সঙ্গী এভাবে অনর্থক প্রাণ হারিয়েছিল।

ঐ একই দিনে পিতার এই নিয়ে দুবার বিজয়। আর কোন দুর্ঘটনা হল না। পিতা আহমেদাবাদ নগরে প্রবেশ করলেন। সাত দিন মাত্র এখানে তিনি ছিলেন। বৈরম খানের পুত্র খান খানানের হাতে প্রদেশের শাসনকর্তৃত্ব অর্পণ করে তিনি রাজধানীতে ফিরে এলেন।

এর পরেই, বাংলাদেশ জয় ও চিতোর ও রণথম্বরের দুর্ভেদ্য দুর্গ পদানত করার সংকল্প তাঁর মনে এল। ঐ দুর্গ দুটি জয়ের ভার তিনি নিজের উপর তুলে নিয়েছিলেন। চিতোর দুর্গের অধিনায়ক ছিল জয়মাল। জয়মাল যখন দুর্গের দেয়ালের ছিদ্রপথে অবরোধকারীদের সৈন্য পরিচালনা নিরীক্ষণ করছিল, পিতা বন্দুকের গুলীতে তাকে হত্যা করেন, গুলী লেগেছিল তার মাথায়। যে-অস্ত্রের সাহায্যে তিনি তাঁর লক্ষ্যভেদের দক্ষতার পরিচয় দিয়েছিলেন, তার নাম রেখেছিলেন দ্রুসতানদুজ (কখনও যা লক্ষ্যভ্রষ্ট হয় না), এখনও সেটা আমার কাছে আছে। বন্দুক হিসাবে এটি নিশ্চয়ই তুলনাহীন, কারণ নির্ভরযোগ্য সূত্রেই জানা যায়, পিতা ঐ বন্দুক দিয়ে বিভিন্ন সময়ে কমপক্ষে বিশ হাযার পশু ও পাখী শিকার করেছেন। বন্দুকটি ভাল, সেই সঙ্গে তাঁর শিকারনৈপুণ্যও এতে কম প্রমাণিত হয় না। বন্দুক দিয়ে শিকারে আমিও কম পটু নই, শিকারপ্রিয় আমি খুবই, ঐ বন্দুক দিয়ে আমি কম করেও কুড়িটি হরিণ শিকার করেছি। আমি অবশ্য পঞ্চাশ বছর বয়সের সময় প্রতিজ্ঞা করেছি আর কোনদিনও পাখী শিকার করব না। নীচের ঘটনাটি তার কারণ।

একদিন আমরা শিকারে বেরিয়েছিলাম। আমাদের দৃষ্টিপথে ছিল এক ঝাঁক হরিণ। ডোরাকাটা একটি সুন্দর হরিণ সেই ফলের মধ্যে ছিল। ঐটাকে নিজেই শিকার করব বলে ঠিক করলাম। অনুচরদের বললাম তারা যেন কিছুতেই আমার পিছু পিছু না আসে। আমি জানতাম যে লোকলস্কর দেখলে হরিণটি দিশাহারা হয়ে উঠবে। আমি বারবার দ্রুসতানদুজ বন্দুক থেকে গুলি ছুঁড়ে চললাম, কিন্তু গুলী যে লক্ষ্যভ্রষ্ট হচ্ছে সে খেয়াল নেই। যত কাছে যাই হরিণটি ততই দূরে সরে যায়, বুঝি ঠাট্টা করেই। শেষে, তিনবার গুলী করবার পর, কাছে যাওয়া মাত্রই হরিণটি হঠাৎ লাফ দিয়ে এক লহমার মধ্যে গেল মিলিয়ে। হয়ত ঐ হঠাৎ লাফ দেখে কিংবা ব্যাখ্যার অতীত কোন কারণ থেকে আমি মূর্ছিত হয়ে পড়লাম। প্রায় দু'ঘণ্টা

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

ধরে আমি সম্পূর্ণ অচেতন হয়েছিলাম। আমার দেরি দেখে, অধৈর্য হয়ে, আমার পুত্র খুররম আমায় খুঁজতে খুঁজতে ওখানে এসে হাযির হয় এবং গোলাপ জল ছিটিয়ে আমার জ্ঞান ফিরিয়ে আনতে সফল হয়। একটা মূর্ছার ঘোরে, মনের ভার ভার অবস্থায় আমার প্রায় মাসখানেক কেটে গিয়েছিল। ঐ দিন থেকে আমি প্রতিজ্ঞাবদ্ধ হয়েছিলাম, পঞ্চাশ বছর পূর্তি হওয়ার পর থেকে আমি শিকারে কখনও বন্দুক স্পর্শ করব না।

আমার পিতার কথা শেষ করবার আগে, আমি এ উল্লেখ না করে পারছি না যে পানাহারে তিনি এমন সংযমী ছিলেন বছরে প্রায় তিন মাস ধরে গোশত খেতেন না। তাঁর জন্মমাসে কোন প্রাণী যেন হত্যা না করা হয় সে ব্যাপারে তিনি কঠোর নির্দেশ জারী করেছিলেন। অবশ্য একথা বলতেই হয় রমযান মাসে তিনি রোযা রাখতেন না; কিন্তু ঈদের দিন তিনি ঈদগাহে যেতেন, নামায পড়তেন যথারীতি, সব তরিকা পালন করতেন; রোযা না রাখার ক্ষতিপূরণের জন্য তিনি ঐ দিনে তিনশো ক্রীতদাসকে মুক্ত ও গরীবদের ভেতর পঞ্চাশ হাযার টাকা বিলিয়ে দিতেন।

আমার শৈশবকালে যারা আমার সবচেয়ে ঘনিষ্ঠ ছিল জামাল উদ্দীন আঞ্জু তাদের একজন, সে অবশ্য আমার পিতা বেঁচে থাকতেই আমার স্বার্থের প্রতি তার ঐকান্তিক নিষ্ঠার প্রমাণ দিয়েছে। এতদিন ধরে সে এক হাযারী মনসবদার ছিল। তাকে আমি ইজুদ্দৌলা উপাধি দিয়ে বারহাযারী পদে উন্নীত করে দিয়েছিলাম। পিতার কিংবা আমার দরবারের কোন আমীরকে এত উঁচু পদমর্যাদা দেওয়া হয়নি। সেই সময়ে তাকে আমি আরও দিয়েছিলাম পতাকা ও নাকাড়ার তকমা, হীরকখচিত একটি তরবারি রত্নভূষিত একটি পেটি, রত্নখচিত ও কারুকার্য করা অশ্বসজ্জা সহ একটি অশ্ব। পিতার আমলে সে যে মর্যাদা ভোগ করত, তার চেয়ে হাযার গুণ বেশী সম্মানে তাকে আমি ভূষিত করেছিলাম, সেই সম্মান আরও বাড়ালাম তাকে বিহার প্রদেশের শাসনকর্তা নিযুক্ত করে। শাসনকার্য নির্বাহের জন্য তার হাতে প্রচুর ক্ষমতা অর্পণ করেছিলাম। তাছাড়াও তার এগারটি ছেলের প্রতিটিকে একহাযারী কিংবা দুহাযারী মনসবদারী দিয়েছিলাম, অবশ্য তাদের গুণ ও কাজ অনুযায়ী। ইতমোদ্দৌল্লার পরিবার বাদে আমার দরবারের কোন আমীরই অমন সম্মান অর্জন করেনি। ইতমোদ্দৌল্লা, তাঁর সন্তানসন্ততির, আত্মীয়স্বজন, তাঁদের হাতেই বলতে গেলে আমার সরকারের সব দায়িত্ব এখন তুলে দেওয়া হয়েছে।

এই সময়ে সাম্রাজ্যের মুদ্রাবিধি নিয়ন্ত্রণের দিকে দৃষ্টি দিয়েছিলাম। তার জন্য নতুন মুদ্রা তৈরীর ব্যাপারে আমি নির্দেশ দিয়েছিলাম। বর্তমানে যে-সব সোনার ও রূপার টাকা আছে, ব্যবসায়ী ও অন্যান্য শ্রেণীর হাতে ঘুরে ঘুরে সেসব নিকৃষ্ট হয়ে গিয়েছিল। আমার উদ্দেশ্য নতুন মুদ্রাকে পুরান মুদ্রার চেয়ে উন্নত মান দেওয়া, যদি কোন তফাৎ দেখাই দেয় সে সব ধরতির মধ্যে না আনা।

তাছাড়া, দরিদ্রদের সাহায্যকল্পে যে-দপ্তর আমি সৃষ্টি করেছি তার ভার প্রদান

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

করেছিলাম মীরন সদর জাহানের উপর। ঐ একই নীতির উপর ভিত্তি করে বিধবাদের তত্ত্বাবধানের তহবিল সংক্রান্ত দপ্তর ন্যস্ত করেছিলাম হাজী কোকাহকে। সেই একই সময়ে আমি জাহিদ খানকে পনের শ' থেকে দুহাযারী মনসবদারীতে উন্নীত করে দিয়েছিলাম।

সেই একই সময়ে আর একটি বিধি জারী করা আমি জরুরী মনে করেছিলাম। সেটি হল এই, আমার পিতার আমলে এই দপ্তরের ভার যার উপর ছিল, যখন কাউকে ঘোড়া কিংবা হাতী যৌতুক দেওয়ার প্রশ্ন উঠত (সে সরবরাহ করা হত শাহী আস্তাবল থেকে) ঐ লোকটির তা থেকে আয় হত বছরে পাঁচ লক্ষ টাকা, যা কিনা ইরাকের পনের হাযার তোমানের সমান। এই প্রথা আমার কাছে যুগপৎ উদ্ভট ও ন্যাক্কারজনক মনে হত, তাই ঐ প্রথাই আমি বাতিল করে দিয়েছিলাম। আমি নির্দেশ দিয়েছিলাম এখান থেকে শাহী দাক্ষিণ্যকে কেন্দ্র করে ঘুষ কিংবা উপহার কেউ যেন না নেয়।

এখানে এ-কথার উল্লেখ করা হয়ত সঙ্গত। দাক্ষিণাত্য থেকে আমার পরলোকগত মধ্যম ভ্রাতা সুলতান দানিয়েলের সম্পত্তি নিয়ে শালবাহান আমার কাছে হাযির হয়েছিল। সেই সম্পত্তির মধ্যে ছিল বড় আকারের পনের'শ হাতী, তার প্রতিটির দাম কমপক্ষে চার লক্ষ টাকা। আর ছিল বাদাকশান ও ইরাকের আট হাযার ভাল জাতের ঘোড়া, সবগুলিই সমান উচ্চ মূল্যের, আর ছিল শড়কবাহী আট হাযার উট। এই সবের সঙ্গে ছিল ঐশ্বর্য সমৃদ্ধ রাজদরবারের সব রকম জিনিসপত্র, চীন ও অন্যান্য জায়গার সোনালী ব্রকেড, গুজরাটের উত্তম তৈজসপত্র এবং অন্যান্য মূল্যবান দ্রব্যসম্ভার। তার ধনরত্নের পরিমাণ পঞ্চাশ লক্ষ আশরফি[৩৫] অন্যান্যের পরিমাণ আরও ছয় কি আট লক্ষ টাকা। সে সব কিছুই হিসাবপত্রের জন্য আমার সামনে হাযির করা হয়েছে।

সেই সঙ্গে আমার ভ্রাতার হারেমের তিন শত মহিলা আমার হেফাজতে এল। তাদের আমি বলে পাঠালাম, যদি তাদের কেউ বিয়ে করতে ইচ্ছুক হয়, তাহলে তারা যেন আমাকে জানায় এবং আমার দরবারের পার্শ্বচরদের মধ্যে যাদের আমি যোগ্য মনে করি তাদের সঙ্গে বিয়ে দেব। এটা উল্লেখ্য, প্রতিটি মহিলারই নিজের গহনাপত্র, এক কাঁড়ি সোনালী ব্রকেড, সোনার ও রূপার তৈজসপত্র, ছত্রসহ হাতী ও ঘোড়া ছিল, সেই সঙ্গে ছিল একদল সুন্দর খোজা ও মহিলা পরিচারিকা এবং বিয়ের যৌতুক বাবদ তিন লক্ষ টাকা। যাদের তারা বিয়ে করতে ইচ্ছুক, সেইসব আমীরদের গৃহে তারা যখন যাবে তখন এই সবকিছুই আমি তাদের নিয়ে যেতে দিয়েছিলাম। এভাবেই তারা তাদের সাংসারিক অনিশ্চয়তা ও আমি আমার দায়িত্ব থেকে অব্যাহতি লাভ করেছিলাম।

ঐ উপলক্ষে আমার ভ্রাতার যে-সব হাতী আমার ভাগে পড়েছিল, তাদের একটির আমি প্রশংসা না করে পারি না। তার নাম রেখেছিলাম ইন্দ্রগজ। অত বড়

---

৩৫. চার কোটি পঞ্চাশ লক্ষ টাকা।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

হাতী আমি আগে কখনও দেখিনি, তার পিঠে চড়তে হলে চৌদ্দ সিঁড়ির মই দরকার। হাতীটির স্বভাব এত শান্ত ও নমনীয় ছিল যে তার মত্ততার সময়ও যদি কোন শিশু অজান্তে তার সামনে পড়ে যেত, আস্তে করে পরম যত্নে তাকে শুঁড়ে তুলে নিয়ে হাতীটি নিরাপদ জায়গায় রেখে দিত। অন্যপক্ষে হাতীটির চলাফেরায় ছিল তুলনাহীন দ্রুততা। দ্রুতগামী ঘোড়াও তার সঙ্গে এটে উঠতে পারত না। আর সাহস এমন ছিল যে একশো হাতীর সঙ্গে পাল্লা দিতে সে সবসময়ই যেন তৈরী।

এই প্রসঙ্গের অবতারণা ক্লান্তিকর মনে হলেও, এই হাতীটির গুণপণায় মুগ্ধ হয়ে আমি হাতীটির জন্য এক বাদ্যদল নিযুক্ত করে দিয়েছিলাম। আর হাতীটির আগে আগে হেঁটে যেত চল্লিশটি বর্শাধারী। হাতীটির পানীয়ের জন্য বরাদ্দ ছিল হিন্দুস্তানী ওজনে এক মন মদ, যা কিনা ইরাকের দশ মনের সমান এবং রোয সকাল সন্ধ্যায় হাতীটির খাদ্য এক মন তেলে কিংবা মাখনে বানাতে হত। তার খাদ্য ছিল চার মন চাল ও দু'মন গরুর কিংবা খাসীর গোশত। একথা স্মরণযোগ্য যে, পিতার মৃত্যুর পর বার হাযার হাতী আমি পেয়েছি। আর প্রতিটি হাতীর দৈনিক বরাদ্দের পরিমাণ ঐ। সব হাতীদের থেকে ঐ হাতীটি বেছে নেওয়া হয়েছিল আমার প্রাতঃভ্রমণের জন্য। তার দরুন ঐ হাতীর পিঠে পুরা সোনার হাওদা সবসময় স্থাপন করা হত। হিন্দুস্তানী চার মন ওজনের সোনা গলিয়ে হস্তীটির জন্য শিকল, আংটি, নাক, বুক ও পায়ের জন্য অন্যান্য গহনাপত্র বানান হয়েছিল। রোয হাতীটির সর্বাঙ্গ চন্দনকাঠের গুড়া দিয়ে মেজে দেওয়া হত।

গুটিকয় ব্যক্তি আমার কাছে এসে আবেদন জানিয়েছিলেন যে পরলোকগত শাহযাদা শুধু হাতী নয়, অন্যান্য জিনিসপত্র জবরদস্তি করে কিনে নিয়েছিলেন; যে-ব্যাপার আগেই উল্লেখ করা হয়েছে। তার দরুন আমি ঘোষণা করে দিয়েছিলাম যে যদি কোন ব্যক্তির উপর জুলুম করা হয়ে থাকে, সে যেন তার দাবী নিয়ে হাযির হয়, তাহলে বেচাকেনায় যদি তাদের কোন ক্ষতি হয়ে থাকে, ভাইয়ের হয়ে আমি তা পূরণ করে দিতে রাযী আছি।

আমার কাছে বিশেষ এক বন্দুক ছিল। আমার বোধ হয় ঐ বন্দুকটির জন্য মীর্জা রুস্তম পূর্বতন মালিককে বার হাযার টাকা ও দশটি ঘোড়া দিতে চেয়েছিল, কিন্তু আসলে দেয়নি। আমার কাছে টাকার অঙ্ক অত্যধিক মনে হল। তার দরুন লোকটির কাছে জানবার জন্য লিখে পাঠালাম বন্দুকটির কি এমন গুণ আছে যার জন্য ঐ অর্থ দেওয়ার কথা উঠেছে। জবাবে সে জানাল, এক নম্বর হচ্ছে, না থেমে একশো বার গুলী করার পরও বন্দুকটি তেতে ওঠে না, দু'নম্বর, ট্রিগার দেওয়া আছে, তিন নম্বর, বন্দুকটির গুলী কখনও লক্ষ্যভ্রষ্ট হয় না। সবশেষে, বন্দুকটিতে পাঁচ মিসকাল পরিমাণ ওজনের গুলী পোরা যায়। ঐ সব থাকা সত্ত্বেও বন্দুকটি আমি তাকে যৌতুক হিসাবে দিয়ে দিলাম।

১০২০ হিজরীর শাওয়াল মাসের ১৭ তারিখ শনিবার[৩৬] আমি আমার পুত্র

---

৩৬. ১৬১১ খ্রীস্টাব্দের ১২ই ডিসেম্বর।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

খুররমকে[৩৭] মুক্তার একছড়া নেকলেস ও একটি হীরা বসান পাগড়ি চূড়া উপঢৌকন দিয়েছিলাম। সর্বমোট মূল্য হবে আট লক্ষ টাকা। পরে অবশ্য খুররম প্রচুর দুর্লভ মণিমুক্তার অধিকারী হয়েছিল। আমার একমাত্র কামনা কি গুণে কি প্রতিভায় সে যেন আমার সকল সন্তানদের ছাড়িয়ে যায়।

সেই একই দিনে কাবুলের কাজী আবদুল্লা প্রেরিত একটি লিখিত স্মারক লিপি আমার হস্তগত হয়েছিল। সাম্রাজ্যের সর্বত্র যাকাত থেকে অব্যাহতি দেওয়ার যে নির্দেশ আমার আছে, তা যদি সব রকম বণিকদের উপর প্রযুক্ত হয়, তাহলে রাজস্বের কি ক্ষতি ও অসুবিধা হবে, তারই উল্লেখ ঐ স্মারকে করা হয়েছে। সঙ্গে সঙ্গে আমার মনে হল কাজী যে স্মারকটি পাঠিয়েছে তার উৎস একান্তই ব্যক্তি স্বার্থ উদ্ভূত, যতই কেন না সে রাজস্ব বৃদ্ধির কথা উল্লেখ করে থাকুক। সেজন্য আরও একটি নির্দেশ জারী করলাম এই মর্মে যে, ব্যক্তি বিশেষ বণিক কিংবা বণিক নয়, এ প্রশ্ন অবান্তর, কোন বৈষম্য না করে দেশের সর্বত্র ভ্রমণকারীদের উপর থেকে ঐ কর রহিত করা গেল। সেইসঙ্গে আমি আরও ঘোষণা করে দিলাম জনসাধারণের মধ্যে প্রচারিত কোন অনুজ্ঞা আমার সেনাবাহিনীতে কর্মরত কেউ যেন ভঙ্গ না করে; দেশের সড়ক পাহারা দেওয়ার কাজে যারা নিযুক্ত তারা তাদের মস্তকের কথা যেন মনে রেখে, হাযার বার মনে রেখে শুল্ক আদায় করে এবং শান্তিপ্রিয় সফরকারীর উপর শুল্ক আদায়ের ছলে কোনরূপ নির্যাতন যেন না করা হয়।

বোখারাবাসী সৈয়দ আবদুল ওহাবের পুত্র সৈয়দ কামাল। সৈয়দ কামালের হাতে আমার পিতা দিল্লীর শাসনভার অর্পণ করেছিলেন। ঐ কাজে তিনি বহু বছর নিযুক্ত ছিলেন। ঐ দায়িত্বের পরিচালনায় দেখা গেল তিনি এমন সব কাজ করছেন যা সত্য ও ন্যায়নিষ্ঠ চরিত্রের সঙ্গে মোটেই খাপ খায় না। তার দরুন তাঁকে কঠিন শাস্তি দেওয়ার ব্যাপারে প্রথমে আমি দৃঢ়প্রতিজ্ঞ হয়েছিলাম। কেননা ন্যায়নিষ্ঠাই হচ্ছে আমার স্বভাবের প্রধান বৈশিষ্ট্য; কিন্তু তাঁর সঙ্গে পিতার বন্ধুত্বের কথা স্মরণ করায়, তাঁকে মার্জনা করতে বাধ্য হলাম, অন্য কোন শাস্তি না দিয়ে শুধুমাত্র ক্ষমতা থেকে তাঁকে অপসারিত করে দিলাম।

সারা হিন্দুস্তানকে যাকাত কর থেকে অব্যাহতি আমি দিয়েছিলাম। সেই নির্দেশনামা কাবুল প্রদেশ ও তৎসন্নিহিত ভূভাগেও প্রযুক্ত হল। পিতার আমলে ঐ ভূভাগের রাজস্বের পরিমাণ ছিল এক কোটি আশরফি[৩৮]। ইরানের সঙ্গে তুরানের যা সম্পর্ক কাবুল প্রদেশের সঙ্গে হিন্দুস্তানের সেই একই সম্পর্ক। হিন্দুস্তানের অধিবাসীদের মত, খোরাসান ও ট্রান্সসাক্সোনিয়ার বাশিন্দারা আমার রাজ্যের একই সুযোগসুবিধা লাভ করুক তাই আমি চেয়েছি।

আসফ খানের জায়গীর আমি বজবাহাদুরের কাছে হস্তান্তর করে দিয়েছিলাম; কিন্তু আসফ খান জানাল তার জায়গীর থেকে দু'লক্ষ টাকার বকেয়া পড়ে আছে,

---

৩৭. পরবর্তীকালে সম্রাট সাহজাহান।

৩৮. নয় কোটি টাকা।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

সে-বকেয়ার উপর তার দাবী আছে, তার দরুন আমি বকেয়া ফেরৎ না পাওয়া পর্যন্ত বদলীর আদেশ স্থগিত রেখেছিলাম। এর মধ্যে, আসফ খানকে শাহী কোষাগার থেকে এক লক্ষ টাকা দেওয়ার জন্য আমি নির্দেশ দিয়েছিলাম। বজবাহাদুরকে বকেয়া আদায়ও সরকারকে ফিরিয়ে দেওয়ার সুযোগ দেওয়া হয়েছিল। সেই একই সময়ে আমি আফগান শরীফ খানকে ত্রিশ হাযার টাকা দান করেছিলাম। শরীফ খান আমার ছেলে পারভেজের সঙ্গে উদয়পুরের রাণার বিরুদ্ধে অভিযানে গিয়েছিল। সেই একই দিন আমার পিতার পিতৃব্য হীন্দাল মীর্জার কন্যার সঙ্গে শাহ্ কুলী খান মুহররমের বিয়ে দিয়েছিলেন। আমার ছেলে খুররমের লালনপালনের জন্য পিতা তাঁকে ঠিক করেছিলেন।

হিজরী ১০২৪ সালের[৩৯] জূলহজ মাসের আট তারিখ রবিবার সন্ধ্যায়, রাত্রির দ্বিতীয় প্রহরে কুচক্রী ও বদমাশদের পাল্লায় পড়ে পুত্র খসরু পিতার সমীপ থেকে দূরে গিয়ে পলাতকের জীবন গ্রহণ করে। সে তার উস্কানিপূর্ণ কথাবার্তা পাঞ্জাব অঞ্চলে প্রচারিত করতে থাকে।

উল্লিখিত প্রহর উত্তীর্ণ হওয়ার পর, খসরুর মহলের চিরাগচী উযীর-উল-মূলকের কাছে এসে জানাল যে রাত্রির দ্বিতীয় প্রহরে শাহযাদা প্রাসাদ ছেড়ে যে বেরিয়ে গেছেন আর ফেরেননি। ঐ চিরাগচী উযীর-উল-মুলকের বিশেষ বিশ্বাসভাজন লোক। উযীর-উল-মুলক ঐ লোকটিকে তক্ষুণি আমীর-উল-উমরাহের কাছে নিয়ে এল। আমীর-উল-উমরাহ্ আমার কাছ থেকে অল্পক্ষণ আগে মাত্র বিদায় নিয়ে তাঁর বাড়ির দিকে গিয়েছেন। পথেই এই গুরুতর খবর তাঁকে জানান হল। আমীর-উল-উমরাহ্ দেরি না করে প্রাসাদে ফিরে এসে বহু কষ্টে খসরুর মহলের খোজাদের ঘুম থেকে জাগালেন। তাদের কাছ থেকে জানা গেল যে শাহযাদা সত্যিই পালিয়ে গেছেন। ঐ দরকারী খবরাখবর নিতে আরও আধ ঘণ্টা গেল কেটে। তারপর আমীর-উল-উমরাহ্ সত্বর এসে হাযির হলেন আমার কাছে অমন গুরুত্বপূর্ণ ঘটনা জানাবার জন্য। ঘুমাবার জন্য আমি তখন হারেম অভ্যন্তরে গিয়েছি। মন্ত্রীপ্রবর খোজা এখলাস মারফত আমায় খবর পাঠাল যে, আমার কাছে জরুরী কিছু খবর তার বলবার আছে।

আমি ভাবলাম বুঝিবা গুজরাটের উপদ্রুত অঞ্চল, যা কিনা রাজদ্রোহ কিংবা গণ্ডগোলের আবাস, অথবা দাক্ষিণাত্য বিজয়ে যে-বাহিনী পাঠান হয়েছে, সে সম্পর্কিত কোন দুঃসংবাদ নিয়ে দূত এসেছে। ঐ সব ছাড়া অন্য কোন ভাবনা ছিল না আমার মনে, যখন আমি মন্ত্রীপ্রবরের সঙ্গে দেখা করতে আসি। তার কাছ থেকে আমি শাহযাদার কারণহীন পলায়নের সব খবরই পেলাম। বিস্মিত ও বিব্রত হয়ে বলে উঠলাম, কি করা যায়। আমি কি ঘোড়ায় চড়ে নিজেই পিছু পিছু যাব না পুত্র খুররমকে পাঠাব পলাতকের পিছনে? জবাবে আমীর-উল-উমরাহ্ বললেন, যদি তাঁকে আমি আদেশ দিই তাহলে তাঁর সন্দেহ নেই যে আল্লাহর সাহায্যে ও

৩৯. ১৬০৬ খ্রীস্টাব্দের ৩১ সে মার্চ।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

শাহী সৌভাগ্যের প্রভাবে আমার ইচ্ছার সঙ্গে সঙ্গতি রেখে তিনি এই অনাসৃষ্টি ঘটনার অবসানে সফল হবেন। যদি পরিস্থিতি চূড়ান্ত পর্যায়ে যায় ও শাহযাদা যুদ্ধে অবতীর্ণ হন, সেক্ষেত্রে আমার আদেশ কি হবে তিনি তা বেশ ব্যগ্র ভাবেই জানতে চাইলেন। আমি জবাবে বললাম, যদি তিনি দেখেন পরিস্থিতি যুদ্ধ ছাড়া আয়ত্তে আনা সম্ভব নয়, সেক্ষেত্রে তিনি যেন তাই করেন। রাজ্যশাসন প্রসঙ্গে পুত্র কিংবা আত্মীয়ের স্থান নেই। যে পর রাজ অনুগতনিষ্ঠ, সে সহস্র পুত্র কিংবা আত্মীয়ের চেয়েও বড়। যে তার প্রতিপালকের স্বার্থের সংবৃদ্ধিতে নিজের কর্মদক্ষতা প্রয়োগ করে, সে নিশ্চয়ই তার প্রভুর বিশাল দাক্ষিণ্যের যোগ্য। যে-পুত্র রক্তের সম্পর্কে পিতার প্রতি তার কর্তব্য ভুলে যায় তার উপর রাজকীয় স্নেহ অনি:শেষ ও অপরিমাণ ভাবে বর্ষিত হওয়া সত্ত্বেও আমার কাছে সে অচেনা অজানা। আমার বংশধারা ও সিংহাসনের উত্তরাধিকারের দিক থেকে যদিও পুত্র স্থায়িত্বের ইঙ্গিতবহ, কিন্তু সে যখন তার কুচক্র জাহির করে, সে তখন তুলনীয় সেই ব্যক্তির সঙ্গে যে-কিনা নিজের ঘরের ভিত ধ্বসে দিয়ে দোতালায় নিজের বসতি তোলবার প্রয়াস পায়।

আবারও বলছি, যে ব্যক্তি প্রকাশ্য শত্রুতা করে অকৃতজ্ঞতার পরিচয় দেয়, রক্ত কিংবা সম্পর্কের দাবী সে আমার কাছে আশা করতে পারে না। আমরা কি এক্ষেত্রে ওসমানীয় রাজবংশের আভ্যন্তরীণ নীতি দিয়ে একটি উজ্জ্বল ইসলামিক নমুনা স্থাপন করিনি? ওসমানীয়রা নিজেদের রাজকীয় শক্তির স্থায়িত্বের জন্য সব ছেলের মধ্যে একটি ছেলেকে বাঁচিয়ে রাখত, বাকী সবাইকে মেরে ফেলা সুবিধাজনক বলে মনে করত। যদি রাষ্ট্র রক্ষার্থে এবং তার উপদ্রব বন্ধ করার জন্য, যা বন্ধ না করলে দেশের শান্তি বিঘ্নিত হতে পারে, আমি যদি সেরূপ শত্রুতার সমূল উচ্ছেদ সাধন জরুরী বলে মনে করি, আর সে শত্রুতার মূলে আমার আত্মজ থাক না কেন, তাহলে কি হবে? কিন্তু এসব কথা বাদ দিয়েও, যে-দায়িত্বের ভার আমার উপর ন্যস্ত করা হয়েছে, তার ভার বহনের যোগ্যতা প্রশ্নযোগ্য, তাছাড়া পিতৃকর্তব্যের অমন বরখেলাপের নযীর ত আমার চোখের সামনেই আছে, তার দরুন ঐ কুলাঙ্গার পলাতককে কোনদিনও সামান্যতম ক্ষমতা পরিচালনার ভার দেওয়ার সাধ আমার মনে জাগবে না। আল্লাহ আমাকে যে-ক্ষমতা দিয়েছেন, অজ্ঞতার ক্ষতিকর প্রতিক্রিয়া থেকে পৃথিবীকে রক্ষা করবার দায়িত্ব পালনে আমারই হাতে সে ক্ষমতা ব্যবহৃত হবে। যত নগণ্য হোক না কেন, হিংস্রকর কাজে আমার মতি কোনদিনও নেই। তাহলে অমন গুরুত্বপূর্ণ কাজ কি করে উপেক্ষা করে যাই, যে-কাজ আমাদের সকল মনোযোগে দাবী করছে?

আমীর-উল-উমরাহের মত অভিজ্ঞ ও বিজ্ঞ ব্যক্তির কাছে শান্তি বজায় রাখার জন্য অমন ভাবনা হয়ত নিরর্থক মনে হতে পারে; কিন্তু এক্ষেত্রে তাঁর ভাবনার উৎস দূরদৃষ্টি, বিশেষ করে জনসাধারণের মনে নিরাপত্তা ও আস্থা অক্ষুণ্ন রাখা থেকেই তাঁর অমন ভাবনা উৎসারিত হয়েছে। তিনি যখন আমার কাছ থেকে কিছুদূরে চলে গেলেন, তখন আমার মনে হল যদিও আমার প্রতি তাঁর বিশ্বস্ততা ও

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

আনুগত্য প্রশ্নাতীত, তবু এমন সংকট কালে অকস্মাৎ আমার কাছ থেকে তাঁর অন্তর্ধান কুচক্রীদের মনে তাঁর আনুগত্য সম্পর্কে প্রশ্ন জাগতে পারে। তাছাড়া আমি নিজেও এই অস্বস্তিকর ভাবনা মুছে ফেলতে পারলাম না যে তিনি যাচ্ছেন পুত্র খুররমের সঙ্গে, আর খুররম বয়সে খসরুর ছোট। বলাইবাহুল্য, সবাই জানে উত্তরাধিকার জ্যেষ্ঠ পুত্রে বর্তায়।

রাত্রির তৃতীয় প্রহর অতিক্রান্ত হয়ে গেছে। আমীর-উল-উমরাহ, যাঁকে আমি পুত্রবৎ মনে করি, যাঁকে আমি গভীর ভাবে বিশ্বাস করি, তিনি যখন ঘোড়ায় চড়ে চলে গেলেন, তখন তাঁর পিছ পিছ যাওয়ার অদম্য ইচ্ছা আমার মনে উঠল জেগে।[৪০] এই পরিস্থিতিতে আমি ঐ মন্ত্রীপ্রবরকে ফিরে আসার জন্য বার্তা পাঠালাম এবং সেই সঙ্গে বখশী শেখ ফরিদকে নির্দেশ দিলাম আগ্রাপ্রাসাদ প্রহরায় যত সৈন্য আছে তাদের তৈরী হয়ে নিতে। শহর কোতোয়াল ইতেমাম খানকেও আমি নির্দেশ দিলাম সাম্রাজ্যের সীমান্ত অঞ্চলে, শহরে নগরে যত বিশিষ্ট আমীর রয়েছে, তারা যত দ্রুত সম্ভব সৈন্য নিয়ে শাহী পতাকাতলে এসে জমায়েত হয়, সেই মর্মে দূত যেন সত্বর পাঠিয়ে দেয়। যারা শহরে ছিল তারা আদেশ পেয়ে গেল, কালবিলম্ব না করে আমার সমীপে হাযির হওয়ার জন্য।

আমার আস্তাবলের চল্লিশ হাযার দীর্ঘ লেজবিশিষ্ট ঘোড়া হাযির করা হলে পর, আমার সেনাবাহিনীর সবচেয়ে অভিজ্ঞ ও সাহসী রক্ষীদের মধ্যে দরকার মত ঘোড়া বিতরণ করে দেওয়া হল। কিছু সংখ্যক আমীরদেরও একশো থেকে দুশো করে ঘোড়া দেওয়া হল। আমার পশুশালে এক লক্ষ দ্রুতগামী উট রয়েছে। যে-সব সৈন্যের উট ভার বহনের যোগ্য নয়, তাদের প্রত্যেককে নতুন করে একটি উট ও অভিযানের প্রয়োজন মত সরঞ্জামাদি সরবরাহ করার নির্দেশ দিলাম। যে-সব আমীর ও মনসবদার কাছে নেই তাদের সত্বর আমার পিছু আসার নির্দেশ দিলাম। দোস্ত মুহম্মদ ও কাবুলবাসী মুহম্মদ বেগ ফিরে এসে আমায় সংবাদ দিল শাহাযাদা ত্রিশ হাযার অনুচর নিয়ে পাঞ্জাব অভিমুখে এগিয়ে আসছে। মুহম্মদ বেগ কাবুল ও পাঞ্জাবের শাসনকর্তা ছিলেন। তাঁকে সম্প্রতি আমি পদচ্যুত করেছিলাম। সেকেন্দ্রা পেরিয়ে কিছু দূরে তিনি অবস্থান করছিলেন।

আমার বিশ্বাসভাজন প্রতিটি ব্যক্তিকে দ্রুতগামী ঘোড়া ও উট বিতরণ করে দেওয়ার পর, আমি ঘোড়ার পিঠে আরোহণ করলাম। যমুনার বাম পাড়ের পথ ধরে পলাতক এগিয়ে গেছে, এত জানাই কথা, পথে যত জনের সঙ্গে দেখা তাদের কাছ থেকেও জানা গেল শাহযাদা সিন্ধু তীরের প্রদেশগুলির অভিমুখে যাত্রা করেছে।

ভোরবেলা আমি এসে উপস্থিত হলাম সেকেন্দ্রায়। আগ্রা থেকে সেকেন্দ্রার দূরত্ব তিন ক্রোশ এবং এখানেই আমার পিতার সমাধিভবন নির্মাণ করা হয়েছে।

---

৪০. এখানে মানবজাতির বিশ্বাসহীনতা সম্পর্কে গুটি সাতেক শ্লোকের উল্লেখ করা হয়েছে। ক্লান্তিকর বলে এখানে উল্লেখ করা হল না। যদিও তাদের অর্থ মাধুর্য আছে।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

মীর্জা শাহ্রুখের পুত্র মীর্জা হাসান, সে শাহাযাদা খসরুর সঙ্গে যোগ দেওয়ার উদ্দেশ্যে রওয়ানা হয়েছিল। তাকে ধরে এনে আমার সামনে হাযির করা হল। সে সত্য কথা অস্বীকার করার চেষ্টা করল না দেখে, আমি তাকে হাত পিছনে বেঁধে উটের পিঠে উঠবার হুকুম দিলাম।

এই সময়ে, নিঃসন্দেহে আমার পিতার পুণ্যাত্মার প্রভাবেই, একটি শুভ লক্ষণের উদয় হল। যত অদ্ভুতই মনে হোক না কেন, এখানে তার উল্লেখ না করে পারছি না, তাছাড়া ঐ লক্ষণের সাথে আমার পিতামহ হুমায়ূনের আমলের একটি ঘটনারও আশ্চর্য মিল আছে। পিতামহ হুমায়ূন পনের বছর বয়সে একবার তাঁর কীর্তিমান পিতা বাবরের কবর যিয়ারত করতে এসেছিলেন। সেই সময়ে একটি পাখিকে তাঁর উপর দিয়ে উড়ে যেতে দেখলেন। তিনি তাঁর সভাসদদের বললেন যদি তাঁর ভাগ্যে সাম্রাজ্য ভোগ থাকে, তাহলে তিনি যে তীর ছুড়ছেন পাখিটি তাতে বিদ্ধ হবে। তিনি হর্ষোৎফুল্ল চিত্তে দেখলেন তাঁর তীর পাখিটির মাথায় লেগেছে, পাখিটি তাঁর পায়ের কাছে প্রাণ হারিয়ে পড়ে গেছে। তার পর থেকে তিনি সিদ্ধান্ত করলেন যে কোন গুরুত্বপূর্ণ কাজে হাত দেওয়ার আগে দৈবের সঙ্গে অমন যোগাযোগ করে নেওয়া ভাল। তাঁর বদ্ধমূল ধারণা ঐ কাজের সঙ্গে দৈবের নির্ভুল যোগাযোগ থাকবেই।

কিন্তু আমার ক্ষেত্রে যা ঘটেছে তার বর্ণনা করি। পিতার সমাধিভবন এক ক্রোশ পথও যাইনি, সে সময় এক ব্যক্তি এল আমার সঙ্গে দেখা করতে। আমি যে কে সে তথ্য এই ব্যক্তির অজানা, তাই আমি তার নাম জিজ্ঞাসা করলাম। জবাবে সে জানাল তার নাম মুরাদ খাজা। 'মাশাআল্লাহ্', আমি বলে উঠলাম, 'আমার মনস্কামনা পূর্ণ হবে' এই ঘটনার একটু পরেই সম্রাট বাবরের সমাধিভবনের কাছাকাছি আর এক ব্যক্তির সঙ্গে আমাদের দেখা হল। লোকটি গাধার পিঠে জ্বালানি নিয়ে চলেছে, পিঠে তার কাঁটার বোঝা আমি তাকেও সেই একই প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করলাম। সে বলল, তার নাম দৌলত খাজা। শুনে আমার মন খুব খুশী হয়ে উঠল। আমার পার্শ্বচরদের আমি বললাম কী উদ্দীপকই না হবে যে-তৃতীয় ব্যক্তির সঙ্গে আমাদের সাক্ষাৎ ঘটবে তার নাম যদি হয় সা'দত। আমাদের ডান পাশের ছোট একটি গাঙ্গের পাড় দিয়ে খানিক দূরে এগানোর পর, একটি গরু ঘাস খাচ্ছে সেদিকে ছোট একটি ছেলে চেয়ে আছে, তাকে আমি তার নাম শুধালাম। সে জবাব দিল, আমার নাম সা'দত খাজা। বিস্ময়ের ধ্বনি উঠল আমার পার্শ্বচরদের মধ্যে। কৃতজ্ঞতা ও সন্তোষে আমার মনও পরিপ্লুত হল। সেই মুহূর্ত থেকে আমি দৃঢ়সংকল্প হলাম যে ঐ শুভ তিনটি লক্ষণের সঙ্গে সঙ্গতি রেখে আমার সরকারের যাবতীয় কাজ তিন ভাগে ভাগ করা হবে। তার নাম হবে, 'ইমায়ে সালাস' (তিন চিহ্ন)।

দিনের দ্বিতীয় প্রহর অতিক্রান্ত হল। সূর্য এখন মধ্য আকাশে। তীব্র রৌদ্রে পত্র-নিবিড় গাছ দেখে বিশ্রাম নেবার লোভ আমার জেগে উঠল। সেই মুহূর্তে কিছু বিষাদক্লিষ্ট ভাবনা আমার মনে ভেসে এল। খানে আজমের কাছে আমি না বলে

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

পারলাম না যে, সমস্ত শাহী ঐশ্বর্য সঙ্গে থাকা সত্ত্বেও আমি আমার সহচরদের নিয়ে নানা রকম অসুবিধা ভোগ করছি, সে-সব অসুবিধা দূর করার মত অবসর এখন নেই; কিন্তু যে হতভাগা ছেলেটি অপরাধ ও হতাশার ভারে পালিয়ে চলেছে তার দুঃখদুর্দশার কাছে এই সব অসুবিধার তুলনাই হতে পারে না। হায়রে, শরীরও মনে ছেলেটি যে দুঃখে জ্বলছে, আমাদের অসুবিধা তার কাছে কি? আমি স্বীকার করতে বাধ্য হলাম রাজত্বের সূচনাতেই অমন উপপ্লব আমার লোভের কারণ, তাছাড়া, যারা এতদিন ধরে আমার সুখদুঃখের সঙ্গী তারা নিজেরাই এখন আমার ন্যায়নিষ্ঠতার শিকারে পরিণত। তবু এই ভেবে আমি খানিক সান্ত্বনা পেলাম যে যদি আমি খবর শুনে দেরি করতাম, তাহলে হতভাগা পলাতকটি কিছু সময় পেত, তার সঙ্গে এসে জুটত বেশ সংখ্যক কুচক্রী ও বিক্ষুব্ধ লোক-তাকে ঘিরে রাখত হীন প্রতারকের দল। কাজে সফল হবার জন্য আমার নিজের অভিযানে বেরনো ভিন্ন উপায় ছিল না।

অস্বাভাবিক এই উপপ্লবের কাহিনীতে ফিরে আসা যাক। একটি গ্রামে এসে পৌঁছলাম, অনেক দীঘি ও সুন্দর ছায়া-ঘন বনে ঘেরা। সেখানে শিবির স্থাপন করার সিদ্ধান্ত নিলাম। এখন পরিস্ফুট হল খসরু যখন মথুরা এসে পৌঁছেছিল, যে-মথুরা হিন্দুদের পবিত্র তীর্থস্থান, তখন বাদাকশানবাসী হাসান বেগ শহরে একদল সৈন্য সহ প্রবেশ করে নিরস্ত্র অধিবাসীদের উপর নিষ্ঠুর লুণ্ঠনের তাণ্ডবলীলা বইয়ে দিয়েছিল, প্রত্যেকের কাছ থেকে অর্থ ছিনিয়ে নিয়েছিল, আর এমন পাশবলীলা শুরু করেছিল যে চারপাশের স্ত্রী, ভগিনী কন্যা সবার ইজ্জত হয়ে উঠেছিল চরম বিপন্ন। বীভৎস তাণ্ডবলীলায় তারা এমন মত্ত হয়ে উঠেছিল যে অভাগা খসরু বাধ্য হয়ে যাকে এই নারীমেধ যজ্ঞ দেখতে হয়েছে, সে তার পার্শ্বচরদের কাছে অনুশোচনায় তীব্র তিক্ত কণ্ঠে বলে উঠেছে, হায়রে, কোথায় আমি চলেছি এবং কার থেকে নিজেকে সরিয়ে এনেছি? কোথায় লুকাল সেই মহিমা যা আমার সাধারণ আমোদপ্রমোদকে ঘিরে থাকত। আজ আমাকে কিনা সমাজের পঙ্ককীট থেকে যারা উঠে এসেছে তাদেরকে আমীর বলে সম্বোধন করতে হচ্ছে। আমার পিতার প্রজাবৃন্দের উপর অমন নারকীলীলা চুপচাপ দেখে যেতে আমায় কিনা বাধ্য হতে হয়েছে।'

তার ঠোঁটে উচ্চারিত আত্মধিক্কার, অনুতাপ ও অনাবশ্যক অনুশোচনা, যা কিনা হতাশার কাছে সমর্পিত প্রাণের উপযোগী। তবু বোকামি ও মিথ্যা দম্ভের দরুন ধ্বংসের হাত থেকে উদ্ধারের যে একটি মাত্র পথ আছে সেটি গ্রহণ করতে সে বিরত থাকল। আল্লাহর নাম করে বলছি, যদি এই মুহূর্তে খসরু লজ্জিত ও অনুতপ্তচিত্তে আমার কাছে ফিরে আসে তাহলে তার অপরাধ তো মার্জনা করতামই, তাছাড়াও আগের চেয়ে আমার চোখে তার মর্যাদা বেড়ে যেত। তাকে আগেও যে মার্জনা করেছি তার নযীর আছে। আমার পিতার রোগশয্যায় সে যে অপুত্রজনোচিত কাজ করেছিল, যার উৎস আমার সন্দেহ হয় বিপজ্জনক ভাবনা থেকে উৎসারিত, তবু সে যখন অনুতপ্ত চিত্তে কর্ত্তব্যবোধে ফিরে এল, আমি তখন

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

আমার মন থেকে তার প্রতি সবরকমের বাজে ধারণা অপসারিত করে দিয়েছি। আমার পিতার শেষ রোগের সময় বিদ্রোহপ্রবণ আমীরদের কুচক্রের সঙ্গে আমার পরিচয় হয়েছিল। ঐ প্রসঙ্গে আমি বলতে চাই নিয়তিনক্ষত্রের প্রভাবে ও মানুষের কোন সহায়তা ছাড়াই, আল্লাহ হিন্দুস্তানের সাম্রাজ্য আমার হাতে তুলে দিয়েছিলেন। আমাদের যুগের যে কাহিনী ও ঘটনার আবৃত্তি চলছে এটা, তারই ইতিহাস এবং সেই ঘটনাপ্রবাহের পারস্পর্যের সমাচার এভাবেই হয়ত বোঝা যাবে।

হিজরী ১০১৪ সনের জমাদিউল আউয়াল মাসের ১৯ তারিখ সোমবার[৪১] তার যখন নাভিশ্বাস উঠছিল, আমার পিতার হারেমের অন্তঃপুরিকাগণ তাঁকে 'নশ-এ জান' সেবন করবার আগের দিন কিছু ফল ও মিষ্টি খেতে অনুরোধ জানাল। ঐ খেয়েই তাঁর ভয়ানক বদহজম হয়ে যায়। সেই সঙ্গে আমিন উদ্দীনের উপর তিনি ভয়ংকর রকম চটে গিয়েছিলেন, তাকে বকুনি দিয়েছিলেন অত্যধিক জুয়াসক্তির জন্য। তার সঙ্গে বদহজমের প্রতিক্রিয়া মিশে এমন পরিস্থিতির সৃষ্টি হল যে সারাদিন ধরে তিনি দাঁতে কুটোটিও কাটতে রাযী হননি। সেদিন ছিল মঙ্গলবার। পরদিন বুধবার। তাঁকে এনে দেওয়া হল পূর্বোল্লিখিত পানীয় ঔষধ। হাকিম আলী তাঁর চিকিৎসকদের একজন। আর একদিন তিনি তার উপর খেপে গিয়েছিলেন, কারণ, হাকিম আলী তাঁকে প্রবোধ দিতে চেষ্টা করেছিল এই বলে যে, উদ্বেগজনিত পরিস্থিতিতে কাজ করা নিরর্থক; তার দরুন সে সব দাওয়াই দেওয়া উচিত যাতে তাঁর নিশ্চিত আরাম হয়।

AMARBOI.COM

পিতা পরিচারকদের উদ্বেগ প্রশমিত করবার জন্য যতটা নয়, তার চেয়েও বেশী জীবন রক্ষার জন্য খিচুড়ী খেতে রাযী হলেন; কিন্তু তাঁর পেটের অবস্থা এমন যে খেলে কোন কিছু হজম হয় না, ফলে প্রবল আমাশয় হয়ে গেল তাঁর। হাকিম মুজাফফর আর একজন চিকিৎসক। তিনি এখন বলে বসলেন অন্য চিকিৎসকটি বিধানপত্রে মারাত্মক ভুল করেছে, বিশেষ করে লেবু খেতে দিয়ে, আমাশয়ের শুরুতে। কোন ব্যক্তিকে অপদস্ত করার আমি ঘোর বিরোধী এবং ক্ষমাপ্রবণ বলে, হাকিম আলীর মৃত্যু যাতে না হয় সে ব্যাপারে আমি দৃঢ় সংকল্প হলাম। কারণ (আমার মনে হয়) মুজাফফর হিংস্রাপ্রবণ হয়েই ঐ দোষারোপ করেছে, সে দোষারোপকে সঠিক বলে মেনে নেওয়া উচিত নয়। আমি ভাবলাম, 'আল্লার ইচ্ছার সঙ্গে চিকিৎসা জগতের ভ্রান্তির যদি যোগাযোগ না ঘটত, তাহলে আমাদের মৃত্যুই হত না। 'করুণাপ্লুত হয়েই ঐ উক্তি আমি হাকিম আলীর কাছে করেছিলাম; কিন্তু হৃদয়ের অন্তঃস্থলে আমি জানি তাঁর চিকিৎসাশাস্ত্রে দক্ষতায় আমার বিশ্বাস অপসারিত হয়েছে।

তাঁর শেষ দশ দিনের রোগ ভোগের সময় আমি রোয বিকালে দুই কি তিন ঘণ্টা তাঁর কাছে থাকতাম। জমাদিসউসসানী মাসের চৌদ্দ তারিখ বুধবার পর্যন্ত

---

৪১. ১৬০৫ খ্রীস্টাব্দের ১৬ই সেপ্টেম্বর।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

আমি নিয়মিত তাঁর শয্যাপার্শ্বে উপস্থিত থাকতাম। সে সময় তিনি এত দুর্বল হয়ে পড়েছিলেন যে সকাল বেলাই তাঁকে সারাদিনের ঔষধ খাইয়ে দেওয়া হত। তাঁর জ্ঞান থাকা কালীন তিনি আমাকে একবার প্রাসাদ থেকে দূরে থাকতে উপদেশ দিয়েছিলেন এবং কোন সময়ই আমি যেন আমার অনুচর ও দেহরক্ষীদের ছাড়া ভেতরে না ঢুকি। এখন আমার মনে হচ্ছে ঐ উপদেশ অবহেলা না করা উচিৎ ছিল। ঐ সংকটকালে প্রাসাদের সঙ্গে আমার সম্পর্ক সতর্ক ও সজাগ রাখাই সঙ্গত ছিল। কারণ একদিন আমি যথারীতি আমার অনুচর পরিবৃত হয়েই দুর্গে প্রবেশ করলাম; কিন্তু তার পরদিনই সম্রাটের সঙ্গে কোন আলোচনা না করেই তারা দুর্গের ফটক আমার মুখের উপর বন্ধ করে দেওয়ার সাহস পেয়েছিল এবং সত্যি সত্যি মিনারগুলিতে কামান বসিয়েছিল।

ষোল তারিখ বৃহস্পতিবার। সতর্কতার আড়ালে এই লোকগুলি যে কাজ করে চলছে সে আমি বুঝে উঠতে পারলাম। তার দরুন প্রাসাদে যাওয়া আমি বন্ধ করে দিলাম। রাজা মানসিংহের কাছ থেকে লেখা একটি চিঠি মোকারেব খানের মাধ্যমে আমার হাতে এসে পৌছল। রাজা মানসিংহ জানিয়েছেন তাঁদের মতে আমি সায় দেব সে ভরসা তিনি করেন। কৃতজ্ঞ চিত্তে এখানে আমি উল্লেখ করব যে দুর্গ মধ্যে মোকারেব খান অক্লান্ত ভাবে প্রচেষ্টা করতেন আমার স্বার্থ পরিবর্ধনের জন্য। নানা আমীরদের আমার পক্ষ সমর্থনের সারবত্তা উপলব্ধি করাতে বেশ সক্ষম হয়েছিলেন। তাঁর প্রসঙ্গে এক্ষেত্রে আমি আরও বলব যে আমার পিতার সরকারে তিনি দুহাযারী আমীরের পদে অধিষ্ঠিত ছিলেন। আমি বারবার তাঁকে বলেছি আমি তাঁর কোন উপকারে লাগতে পারি কিনা। পিতা যখন আমাকে বারহাযারী মানসবদারী দিলেন, তখন আমার বাহিনীর মধ্যে যাঁকে আমি প্রথম মনসবদার পদে নিয়োগ করলাম, তিনি হচ্ছেন মোকারেব খান। তাঁকে আমি তিনহাযারী অধিনায়ক পদে বরণ করেছিলাম। আমার জন্য তাঁর ঐকান্তিক ও গভীর নিষ্ঠার পরিচয় আমি সব সময়েই পেয়েছি।

যতদিন আমি আগ্রা দুর্গে প্রবেশ করতে পারিনি, ততদিন পিতাকে দেখতে না পারায় মন আমার ভারাক্রান্ত হয়ে উঠেছিল। তার দরুন আমি লোকজনের সঙ্গে দেখা সাক্ষাৎ কিছুদিনের জন্য বন্ধ করে দিয়ে আল্লাহর ইচ্ছার উপর নিজেকে ছেড়ে দিয়েছিলাম। অবশ্য গুটিকয়েক লোক ছিল যাদের অভিজ্ঞতা ও বিবেচনার উপর আস্থা রাখতাম, তাঁদের কাছে মনের যে গভীর যন্ত্রণায় ভুগছিলাম সে কথা জানালাম। সেই গুটিকয়েক ব্যক্তি হচ্ছেন, মীরন সদর জাহান, কাজভীনের মীর রেজাউদ্দীন এবং হামাদানবাসী খাজা ওয়েঈস।

এই বিশ্বস্ত বন্ধুরা ইরানের শাহ্ তামাস্প যে রাতে মারা যান সে রাতে শাহ্ ইসমাইল ও সুলতান হায়দার মীর্জার কি হয়েছিল, সে ঘটনা আমাকে স্মরণ করিয়ে দিয়েছিলেন। কিছু সংখ্যক আমীর ইসমাইল মীর্জাকে সম্রাটের পদে আসীন করবার জন্য ষড়যন্ত্রে যোগ দিয়েছিল। ইসমাইল মীর্জা শহরের দুর্গে বাস করতেন। যে-রাতে তাদের দুর্গ পাহারা দেওয়ার পালা সেই রাতে তারা ইসমাইল

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

মীর্জার বোনের সঙ্গে পরামর্শ করে তাকে (বোনকে) তারা জানাল যে কিছু সংখ্যক আমীর হায়দার মীর্জাকে সিংহাসনে বসাতে চায় ও বিরোধী পক্ষের লোকজনদের গ্রেফতার করতে চায়। সেই রাতেই শাহ্ তামাস্প মারা গেলেন। খবরটা পেয়ে হোসেন বেগ যে-সব আমীর হায়দার মীর্জাকে সিংহাসনে বসাতে চায় তাদের সঙ্গে যুক্তি করে তার ভাই মুস্তাফা মীর্জাকে প্রাসাদ আক্রমণের জন্য নিয়ে এল। প্রতিরোধ করা সম্ভব নয় ভেবে, প্রাসাদ অভ্যন্তরস্থ বাহিনী বিরোধ নিরসনের জন্য সুলতান হায়দার মীর্জার মাথা কেটে দেয়ালের উপর দিয়ে দিল ছেড়ে। তাতে ভয় পেয়ে মুস্তাফা মীর্জা তাঁর সঙ্গের দশ হাযার লোকলস্কর নিয়ে পালিয়ে গেল। হোসেন বেগ ও তাঁর ভাইরা ছাড়া, আর সবাই তাঁকে ছেড়ে চলে গেল। সেই হোসেন বেগই কিছুদিন পরে মুস্তাফা মীর্জাকে ধরে এনে হাযির করল নতুন বাদশাহ শাহ্ ইসমাইলের কাছে। তিনি তাঁকে মৃত্যুদণ্ডে দণ্ডিত করলেন।

যে-কাহিনী বলছিলাম তাতে ফিরে আসা যাক। আমার সত্যিকার বন্ধুদের পরামর্শে আমি দুর্গে যাওয়া বন্ধ করে দিয়েছিলাম। সেজন্য আমি আমার পুত্র পারভেজকে পিতার কাছে পাঠালাম এই বলে যে, ভয়ংকর মাথা ধরার দরুন আমি তাঁকে দেখতে যেতে পারিনি। পিতা দু'হাত তুলে আমার স্বাস্থ্যের জন্য দোওয়া চাইলেন, খাজা ওয়াসীকে পাঠালেন আমার কাছে যদি সম্ভব হয়, আমি যেন তাঁর কাছে একবার আসি। বেশীদিন বাঁচবার আশা তাঁর নেই, বিশেষ করে যে-দারুণ হিক্কায় তিনি এখন ভুগছেন। তিনি বলে পাঠালেন, 'হায়রে, কি সময়ে তুমি আমাকে দেখতে আসা বন্ধ করেছ। যখন তুমি জান, আমার মৃত্যুর পরে তুমিই সিংহাসন লাভ করবে; আর তাতে কোন সন্দেহ নেই।' সংকটজনক পরিস্থিতির উদ্ভব হওয়াতে হীনমনা আমীরগণ (মুসলমানেরা কোরান হাতে ও হিন্দুরা নিমক হাতে) শপথ করতে শুরু করল, তাদের ষড়যন্ত্রের ভাষা একই। বোখারাবাসী শেখ ফরিদ বেশীর ভাগ সময় এই কুচক্রীদের মধ্যে কাটাতেন, তার কারণ আত্মীয়স্বজন শুদ্ধ তিনি সম্রাটের সেবাশুশ্রূষা করছিলেন। তার সঙ্গে বিশ্বস্ত মোকারেব খানের পিতার বন্ধুত্বমূলক যোগাযোগ ছিল। অন্যপক্ষে মীর্জা খোকা, যিনি খানে আজম নামে প্রচলিত, শপথ গ্রহণের পর, তিনি কর্তব্যবিস্মৃত আমার পুত্র শাহাযাদা খসরুর কাছে তাঁর আসন্ন সিংহাসন আরোহণের খবর জানিয়ে অভিনন্দনবাণী পাঠাল; কিন্তু তিনি জানতে চাইলেন এই প্রসঙ্গে পিতা ও পুত্রের মত কি, তার কারণ পরে কোন পক্ষ থেকে অবমাননার শিকার হতে তিনি চান না। এই সব উদ্ভট ও স্বার্থপর জল্পনাকল্পনার মধ্যে খসরু বলে পাঠাল, তাঁর সিংহাসন প্রাপ্তি যখন প্রশ্নাতীত, তখন এই সব ভাবনা নেহাৎই বাজে।

মীর্জা কোকাহ্ ও খসরু দুজনই এভাবে আশ্বস্ত হল। খসরু রাজা মানসিংহকে জানাল সম্রাটের জীবনপ্রদীপ নিভু নিভু, তাঁর পক্ষে সুকপালে[৪২] চড়ে যাওয়ার ক্ষমতা নেই, নড়াচড়ায় যদি তাঁর মৃত্যু ঘটে, তাহলে কেউ না কেউ দায়ী হবে;

---

৪২. পাল্কী।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

সেজন্য তাঁর সতর্ক হওয়া উচিত, কারণ পীড়িত সম্রাটকে আগ্রা দুর্গের বাইরে নিয়ে যাওয়ার কোনই দরকার নেই। এই যুক্তি খুব সম্ভব রাজা মেনে নিলেন, তবু পিতার জ্ঞান ফিরে এলে পর, তিনি সাহস করে তাঁকে বললেন, শাহযাদা সেলিমের নেতৃত্বে লোকজন প্রাসাদ অবরোধ করতে উদ্যত, যদি সম্রাটের ইচ্ছা হয় তাহলে দিনকয়েকের জন্য যমুনার অন্য পাড়ে গিয়ে থাকতে পারেন। যেইমাত্র শরীর ভাল হবে, তিনি অনায়াসেই প্রাসাদে ফিরে আসতে পারবেন। পীড়িত সম্রাট জিজ্ঞাসা করলেন, কেন এমন হয়েছে? তারা কি শাহযাদার মুখের উপর দুর্গদ্বার বন্ধ করে দিয়েছে? সেইজন্যই কি সে সৈন্য যোগাড় করেছে? তাঁর পরিচারকদের সাহায্যে তিনি বিছানার অন্য পাশে মুখ ফেরালেন। মীর্জা আজিজ খোকা, যার কপালে মিথ্যার কলঙ্ক আঁকা, সম্রাটকে ঐভাবে দেখে কক্ষে প্রবেশ করে দুহাত জোর করে জানতে চাইল খসরু সম্পর্কে সম্রাটের আদেশ কি।

পীড়িত সম্রাট জবাবে বললেন, 'সব কিছুই আল্লাহর ইচ্ছা। সব সার্বভৌমত্ব তাঁরই। আমার নিজের দিক থেকে বলতে পারি, আমি একমনা হয়ে হাযারও আশা পোষণ করি। আমার সামনে তোমরা ঐ ধরনের কথাবার্তা বলে আমাকে তোমরা মৃত্যুর মুখেই ঠেলে দিয়েছ। তবু জীবনরশ্মি এখনও আমার নির্বাপিত হয়নি। যদি সেই সংকট মুহূর্ত এসে থাকে, যদি ফেরার ঘণ্টা বেজে থাকে, তাহলে যে-সব গুণ সম্রাট হওয়ার একান্ত উপযোগী সেই সামরিক তৎপরতা, রাজনৈতিক দূরদর্শিতা, যে-সব আমি এলাহাবাদে সেলিম শাহের মধ্যে দেখেছি, সে-সব কি ভুলে যাওয়া সম্ভব? যে-স্নেহ ও ভালবাসা তার জন্য আমার আছে, এক মুহূর্তের জন্যও তার হ্রাস হয়নি। যদি বা কুচক্রীদের পরামর্শে সে মুহূর্তের জন্য কর্তব্যবোধ ভুলেও যায়, তাহলেও কি সে আমার জ্যেষ্ঠ পুত্র নয়? সে হিসাবেই আমার সিংহাসনের উত্তরাধিকারী, আমার বংশের নিয়ম অনুযায়ী জ্যেষ্ঠপুত্রেই সিংহাসন বর্তায়, যে-তার চেয়ে বয়সে ছোট তার কাছে কিছুতেই নয়? কিন্তু, বাংলা দেশের রাজত্ব আমি খসরুকে দিয়ে যাচ্ছি।'

পিতার কাছ থেকে ঐ সব কথা শুনে ভণ্ডরা দলে দলে আমার কাছে এসে হাযির হল, এমন ভীড় করে যেন শ্বাস ফেলবার জো নেই। সে যাই হোক, তারা তাদের বক্তব্য মীরন সদর জাহান, মীর জামাল উদ্দীন হোসেন আঞ্জু এবং ঈদি খোজার মারফৎ আমার কাছে বলে পাঠাল, 'সম্রাট আপনার পুত্র খসরুকে সব পদোন্নতির সঙ্গে সঙ্গে নির্দেশ দিতেন আপনাকে 'শাহ ভাই' বলে সম্বোধন করবার জন্য। আপনার কাছে আমাদের নিবেদন আপনি যেন আপনার পুত্রের সঙ্গে তদনুযায়ী ব্যবহার করেন। জবাবে আমি বললাম : পিতা আমার সঙ্গে কথোপকথনের সময়ে আমাকে বাবা ছাড়া অন্য কোন নামে ডাকেন না। তোমরা নিশ্চয়ই অস্বীকার করতে পার না যে ঐ সব ঘটনাই প্রমাণ করে আমি তোমাদের ভাবী সম্রাট; কারণ পুত্র যাই হোক ভাই কিংবা পিতা হতে পারে না।

জবাব শুনে আমীরবৃন্দ বেশ বিভ্রান্ত হয়ে গেল। জুতসই যে কোন জবাব দেবে সেও তাদের সাধ্য নেই। মনে হল তারা তাদের কৃতকর্মের জন্য অনুতপ্ত,

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

তারা তাদের বোকামি বুঝতে পেরে আমার সঙ্গে বিরোধ না করে আমার কাছে নতি স্বীকার ও আমার আনুগত্য মেনে নিতে রাযী হল, শুধু মীর্জা কোকাহ বাদে। সে আমার সঙ্গে নিভৃতে আলাপ করবার জন্য দ্বিতীয়বার অনুমতি প্রার্থনা করল। জবাবে আমি তাকে বলে পাঠালাম, অতীতে আমার পরিবারের জন্য সে যা করেছে তার দরুন তার বহু অন্যায় আমি গ্রাহ্যের মধ্যে আনিনি, সে-সব অন্যায়ের কোন কোনটি গুরুত্বপূর্ণ, আমি গ্রাহ্য করিনি, তার কারণ হীনকাজ করে মানুষ কখনও কখনও বিবেকের দংশন অনুভব করে। আমার নিজেরই কি এমন কোন অন্যায় নেই যার জন্য আমাকে খোদার কাছে জবাবদিহি করতে হবে! আমি আরও বললাম, কত সময় আমি তোমার কাছে হৃদয়ের গোপনতম কোন খুলে ধরেছি। তোমার প্রতি আমার অনুরাগের কোন সীমা ছিল না। এর বেশী আর সে কি চায়? তবু, তার প্রতি আমার স্নেহের নানা নযীর থাকা সত্ত্বেও এই সাক্ষাৎকার না দেওয়ার দরুন যদি আমাদের দেখাশুনা বন্ধ হয়ে যায়, তাই ভেবে আমি তার অনুরোধে সম্মতি জানালাম।

জমাদিউসসানী মাসের আঠার তারিখ, শনিবার। বোখারাবাসী শেখ ফরিদ আমার কাছে এলেন তাঁর শ্রদ্ধাঞ্জলি নিবেদনের জন্য। আমার স্বার্থের প্রতি তাঁর ঐকান্তিক নিষ্ঠা দেখে তিনি আমার কাছ থেকে বেসামরিক কিংবা সামরিক, সর্বক্ষেত্রের প্রধান কর্মাধ্যক্ষের পদ লাভ করলেন। সেই সঙ্গে প্রথামত দেওয়া হল ছুরি, জীগা, অশ্বসজ্জা সহ অশ্ব এবং এক লক্ষ টাকা। তারপর এলেন রাজা মানসিংহ। তাঁকে আমি দিলাম কারুকাজ করা একটি কিরিচ, পেটি, একটি ঘোড়া ও আসবাবপত্র। তাঁকে বন্ধুত্বপূর্ণ মর্যাদার সঙ্গেই গ্রহণ করেছিলাম। তারপরের দিন রাজা মানসিংহ[৪৩] ও মীর্জা আব্দুল কোকাহকে সঙ্গে করে খসরু নিজেই এল। মীর্জা আব্দুল কোকাহ্ আমাকে অনুরোধ জানাল সুবে বাংলার সার্বভৌম কর্তৃত্ব খসরুকে দেওয়ার জন্য। পায়েন্দা মুহম্মদ তেগালকে যেন তাঁর শাসনকাজে সাহায্যের জন্য পাঠান হয়।

রাজত্বের শুরুতেই খসরুকে আমার কাছ থেকে দূরে পাঠান শাসনকাজের সাধারণ নিয়ম বহির্ভূত, বিশেষ করে তার বিপজ্জনক উচ্চাশার জন্য। আমার পরিষদ সবারই ঐ একই মত। তবুও ঐ অনুরোধ মেনে নিতে আমি রাযী হলাম। আমি তাদের সেই সঙ্গে নির্দেশ দিলাম আগ্রা দুর্গে প্রবেশ না করে তারা যেন যমুনা পেরিয়ে চলে যায়। যেই ঐ বিষাদময় ঘটনা ঘটবে (পিতার মৃত্যু) তাদেরকে বাংলায় যাওয়ার অনুমতি দেওয়া হবে।

এই সংকটজনিত উদ্বেগাকুল পরিস্থিতিতে পিতা আমাকে তাঁর একটি পোশাক, তাঁর পরিহিত পাগড়ি পাঠিয়ে দিলেন। সেই সঙ্গে এই বলে বার্তা পাঠালেন যে, পিতার মুখ না দেখাই আমি স্থির করেছি কিনা, যেখানে পিতা আমাকে না দেখে স্বস্তি কিংবা শান্তি কোনটাই পাচ্ছেন না। বার্তা পাওয়া মাত্র

---

৪৩. খসরুর মাতুল।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

পোশাক পরে আমি বিনীত নম্রভাবে প্রাসাদ অভিমুখে রওয়ানা হলাম। মাসের আট তারিখ, মঙ্গলবার। পিতার শ্বাস টানতে কষ্ট হচ্ছে। মৃত্যু কাছে দেখে তিনি আমাকে সব আমীরকে তাঁর সমীপে ডেকে আনার জন্য লোক পাঠাতে বললেন। তিনি বললেন, তোমার ও যারা আমার সঙ্গে এত বছর থেকেছে, যারা আমার কীর্তির সহযোগী, তাদের মধ্যে কোন ভুল বোঝাবুঝি থাকুক আমি চাই না। তাঁর ইচ্ছা মত আমি খাজা ওয়াসীকে পাঠালাম তাদের সবাইকে পীড়িত সম্রাটের কক্ষে ডেকে আনার জন্য। তাদের নাম আলাদা আলাদা ভাবে উল্লেখ করলে, কাহিনী ক্লান্তিকর হয়ে উঠবে।

পিতা তাদের সবার দিকে চেয়ে তাদের অনুরোধ করলেন যদি তিনি কোন ভুল করে থাকেন তাহলে তারা যেন তা ভুলে যায়। তিনি তাদেরকে এভাবে ভাষণ দিলেন কবিতাকারে :

যে শান্তি ও নিরাপত্তা আমার রাজত্বকালের জন্য ছিল
আশীর্বাদ তার কথা মনে রেখ,
মনে রেখ সেই ঔজ্জ্বল্য ও শৃঙ্খলার কথা যা আমার
রাজসভাকে অলংকৃত করেছিল
আমার অনুতাপের সঙ্কট এবং জপমালার গণনায় কথা মনে রেখ
আর মনে রেখ সেই চাঁদোয়ার কথা যা কারাঘরের জন্য
তৈরী করিয়েছিলাম।
আমার ধূলার উপর তোমার স্নেহের অশ্রু যেন মুক্ত হয়ে ঝরে পড়ে
তোমার সকাল বেলার প্রার্থনায় আমার আত্মার কথা ভেব।
তোমাদের সান্ধ্য-উপাসনা যেন রাত্রির ভার দূর করে দেয়।
অশ্রু প্রবাহিত নয়নের বেদনা ভুলে যেও না।
হেমন্তের ঝড়ের মত হিমেল হাওয়া যখন তোমাদের ঘরে হানা দেবে
তখন সেই ঠাণ্ডা হাতের কথা ভেব যে-তোমাদের
মধ্যে প্রায়ই সোনা ছড়াত।
তিনি এর সঙ্গে আরও চারিটি পংক্তি যোগ করলেন :
'দেখেছ আকাশ কিভাবে ফুলের মত সম্মোহন চারপাশে ছড়ায়?
আমার আত্মা অন্ধকার খাঁচা ছেড়ে উড়ে যেতে চাইছে।
সেই বুকে, পৃথিবী সংকীর্ণ বলে যাকে ধারণ করতে পারে না।
জায়গা নেই, তবু নিশ্বাস নেওয়াটুকু ছাড়া।

আমার মনে হল প্রবল প্রতাপান্বিত সম্রাটের শেষ নিশ্বাসের সময় উপস্থিত হয়েছে। সময় এসেছে ঐ শোকসন্তপ্ত শেষ কাজ পুত্র হিসাবে সমাধা করার। তার বিছানার কাছে যেতেই চোখ ফেটে আমার পানি বেরল, জোরে আমার কান্না এল, পিতার পায়ের উপর আমি আমার মাথা রাখলাম। দু:খ ভারাক্রান্ত চিত্তে তাঁর চারপাশে তিনবার ঘুরলাম, মৃত্যুমুখী সম্রাট ইশারায় তাঁর প্রিয় ছুরিকা ফতেহ-উল-মুলক নিয়ে তাঁর সামনে আমার কোমরবন্দে আঁটতে বললেন। এ হচ্ছে আমার

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

ভাগ্যের বুঝিবা শুভ লক্ষণ। তা করার পর, ফের আমি তাঁর পায়ের উপর মাথা রেখে আমার কর্তব্যের শপথ নতুন করে উচ্চারণ করলাম। দুঃখে আমি এতই অভিভূত হয়ে পড়েছিলাম যে শ্বাস টানতে আমার কষ্ট হচ্ছিল।

বুধবার যখন রাত্রির প্রথম প্রহর ও চার পল উত্তীর্ণ হয়েছে, তখন আমার পিতার আত্মা স্বর্গধামে চলে গেলেন। তিনি অবশ্য আগেই আমাকে বলেছিলেন মীরন সদর জাহানকে ডেকে আনবার জন্য, তার সঙ্গে কলেমা শাহাদত পড়তে, মৃত্যুকে তিনি ঠেকিয়ে রাখতে চান, পরম শক্তিমান আল্লাহ হয়ত তাঁর আয়ু আরও বাড়িয়ে দিতে পারেন। সদর জাহান এলে পর তাকে নজতানু হয়ে পিতার কাছে বসতে বললাম। সেই সংকটকালে পিতা আমাকে কাছে ডেকে দুহাতে গলা জড়িয়ে বললেন, প্রিয় বাবা, এ আমার শেষ বিদায়! পৃথিবীতে আমাদের আর দেখা হবে না। হারেমবাসীদের রক্ষণাবেক্ষণ করতে ভুলে যেও না–আমি তাদের ভরণপোষণের জন্য যে ভাতা দিতাম সে ভাতা তুমি দিয়ে যেও। আমার মৃত্যুতে তোমার মন ভারাক্রান্ত হবে, কিন্তু ঘুর্ণাক্ষরেও অতীতের কথা ভুলে যেও না। অনেক পণ ও প্রতিশ্রুতি আমরা পরস্পরকে দিয়েছি–যে শপথ তুমি আমার কাছে করেছ–তা ভুলে যেও না। মনে রেখ। তোমার উপর আমার অনেক দাবী আছে। সে-দাবী ছোট কিংবা বড়, যাই হোক না কেন, তুমি ভুলে যেও না। আমার সামরিক কীর্তি তোমার মনে সব সময় যেন থাকে। আমার মৃত্যুর পর, আমার পরিচারক এবং আশ্রিতদের কিংবা দুঃখীজনদের তুমি ভুলে যেও না। আমার প্রতিটি কথা তুমি ভেবে দেখ, সব মনে রেখ; আর আমাকে ভুলে যেও না।'

ঐ সব বলার পর, তিনি সদর জাহানকে ফের কলেমা পড়তে বললেন এবং তিনি নিজেও স্পষ্ট কণ্ঠে ঐ কলেমা আবৃত্তি করলেন। তিনি সদর জাহানকে তাঁর শিয়রের কাছে এসে সূরা নিসা, আদিলা মুনাযাত শুদ্ধ কোরানের আর একটি অধ্যায় পড়তে বললেন, যাতে করে কোন কষ্ট না হয়ে তাঁর প্রাণবায়ু বেরিয়ে যেতে পারে। সদর জাহান কথামত সূরা নিসা শেষ করেছে এবং মুনাযাতের শেষ কথা দুটি যখন তার ঠোঁটে তখন পিতার চোখের কোণ থেকে এক ফোঁটা পানি গড়িয়ে পড়ল, ঐ একমাত্র লক্ষণ, আমার মহান পিতা তাঁর আত্মা স্রষ্টার হাতে সমর্পণ করে দিলেন। (এরপর তেরটি শ্লোকের উল্লেখ আছে। তাদের থেকে শেষ চারটির মর্মার্থ উদ্ধৃতি করা হল।)

'বাগানের শোভা দীর্ঘ সেই সাইপ্রেস গাছ, তারা কি রিক্ত, শূন্য হয়ে পড়েছে। চির পরিবর্তমান পৃথিবী। কে তোমার মোহমুগ্ধ নয়? তোমার হাত থেকে মহান পুরুষেরও মুক্তি নেই, আর তোমার আঘাত দ্রুত, চোখে পড়ে না। তোমার ফাঁদ থেকে কারও মুক্তি নেই, নিয়তি একমাত্র সত্য–মানুষের পক্ষে একটিমাত্র কাজ–সেটা মেনে নেওয়া।'

আমার পিতার পবিত্র মৃতদেহ এখন খাটের উপর, যে-খাটে রাজা কি ফকির সবাইকে শুতে হবে। নানা সুগন্ধিতে দেহ স্নান করিয়ে, তাদের ভেতর কর্পূর, কস্তুরী ও গোলাপ আছে, মৃতদেহকে নামিয়ে দেওয়া হল। একফালি কাপড় এখন

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

পোশাক, কফিন হচ্ছে কক্ষ। খাটের এক পা আমি কাঁধে তুলে নিলাম, অন্য তিন পায়ে কাঁধ লাগাল আমার তিনপুত্র, যতক্ষণ পর্যন্ত না আমরা দুর্গ তোরণ পেরিয়ে গেলাম। তারপর আমার পুত্র এবং প্রধান প্রধান রাজকর্মচারীরা কফিন কাঁধে করে নিয়ে চলল, নিয়ে চলল সোজা সেকেন্দ্রায়, সেখানে কীর্তিমান আকবরের দেহ স্বর্গের হাতে সঁপে দেওয়া হল। এই সব হবে এবং ঘটবে, পৃথিবী যতদিন টিকে থাকে।

তাঁর কবরের শিয়রে বসে আমরা সাত দিন শোকাশ্রু বিসর্জন করলাম, শাস্ত্রের সব রীতিই আমরা পালন করলাম। বিশেষ করে কুড়িজনকে আমি নিয়োগ করলাম সারারাত ধরে তাঁর কবরের পাশে এসে কোরান পড়বার জন্য। কবরের উপর বিশাল সমাধিসৌধ তৈরী করবার জন্য আমি পাঁচ লক্ষ আশরফি বরাদ্দ করে দিলাম। এক এক আশরফি পাঁচ মিসকাল পরিমাণের। শোকের সাত দিন দুশো লঙ্গরখানা থেকে খাদ্য ও মিষ্টি বিতরণের ব্যবস্থা করে দিলাম। যে-সব গরীব আসবে সকালে বিকালে তাদের মধ্যে যেন খাদ্য ও মিষ্টি বিতরণ করা হয়। শোকাঞ্জলিতে অংশগ্রহণকারী আমার দরবারের বিশিষ্ট সব আমীরদের নিয়ে আগ্রায় ফিরে এলাম। এভাবে আমার পিতার দেহাবসান হল, তাঁর বয়স তখন পঁচাত্তর বছর এগার মাস নয় দিন।

এখানে আমি সংক্ষেপে আগের কথাই বলব। আমার পিতার মৃত্যুকালে সাম্রাজ্যের বেশীর ভাগ আমীরই আমি যাতে সিংহাসনে উপবেশন না করতে পারি সে ষড়যন্ত্রে হাত মিলিয়েছিল। তারা চেয়েছিল যেভাবেই হোক আমার পুত্র খসরুকে হিন্দুস্তানের সিংহাসনে বসাতে। তাদের উদ্দেশ্য ছিল তাঁকে নামে রেখে বাদশাহী ক্ষমতা ভোগ করা; কিন্তু আল্লাহ্ আমার পক্ষে ছিলেন। ইমামদের পবিত্র রুহ আমার পক্ষে। মানবীয় কোন প্রয়াসের কাছে আমার সিংহাসনের জন্য আমি ঋণী নই। সেই তিনিই আমার হাতে এই দায়িত্বভার অর্পণ করেছেন, যাঁর পরিবর্তন কিংবা ধ্বংস নেই। আমি তাই শপথ গ্রহণ করছি, কি মানুষের সঙ্গে আদানপ্রদানে, কি ন্যায়বিচারে, কি অসহায়দের রক্ষণাবেক্ষণে, কি দুঃখীজনের দুঃখ নিবৃত্তিতে, আমি তাঁর কাছেই সাহায্য চাইব, যিনি আমার সম্রাট হওয়ার কারণ। সন্তানসন্ততি কিংবা আত্মীয় পরিজন বা আশ্রিতকারী কারোই বিন্দুমাত্র পরোয়া আমি করব না।

আমি শুনেছি উৎসবের কোন ভোরবেলা, স্নান শেষ করে শেখ বায়যীদ যখন ফিরছিলেন, তখন ভুল করে কেউ তাঁর মাথায় ছাই ছুঁড়ে দিয়েছিল। দাড়ি থেকে ছাই ঝেড়ে, হাত দিয়ে গাল ঘষে, যেন খুশী হয়েছেন, এভাবে তিনি বলে উঠেছিলেন, 'আমার মন–আমি কি এরই যোগ্য– আমার পোড়ামুখ কি ছাই বর্ষণেরই যোগ্য? যথার্থ মহত্ত্ব খ্যাতি কিংবা গুজবের উপর নির্ভরশীল নয়। অহঙ্কারদৃপ্ত মানুষের মন উন্নত নয়–বিনয়ই তোমাকে উঁচু করে ধরবে মানুষের সমাজে–অহঙ্কার তোমাকে ধূলার সঙ্গে মিশিয়ে দেবে। উদ্ধত যারা তাদের মাথা নীচেয় নেবে আসবে–তুমি যদি সম্মানের প্রার্থী হও, তাহলে তা চেও না।'

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

পলাতক খসরুর পশ্চাদ্ধাবনের কাহিনীতে আমি এখন ফিরে আসব। জূলহজ মাসের দশ তারিখ, মঙ্গলবার[৪৪] আমরা হোদল সরাইখানাতে শিবির গেড়ে বসলাম। বোখারাবাসী শেখ ফরিদ হাল্কা অস্ত্রে সজ্জিত বাহিনী নিয়ে এখনও এগিয়ে চলেছে। মীর ময়েজ-উল-মুলককে তাঁর দীর্ঘ ও বিশ্বস্ত কাজের দরুন আগ্রা দুর্গের এবং সেখানকার ধনরত্নের ভার তাকে দিতে সম্মত হলাম। খাজা জাহানের কক্ষে ঐ সব ধনরত্ন জমা আছে। আমার যেসব পুত্র অনমনীয় আনুগত্যের পরিচয় দিয়েছে তাদেরকে আমার পিছু পিছু সত্বর আসার নির্দেশ দিলাম। তার কারণ বয়সের সঙ্গে সঙ্গে আমি বিশ্বাস হারিয়ে ফেলেছি; মেহনত ও ক্লান্তির চেয়ে বন্ধুত্ব ও বিবাদ বিসম্বাদের ব্যাপার আমার কাছে বোঝার ন্যায়, এখন বিশেষ প্রয়োজনেই বন্ধুদের থেকে নিঃসঙ্গ জীবনযাপনে বাধ্য হচ্ছি, মনে হচ্ছে এই অবস্থার যেন কখনও অবসান হবে না। ঐ মাসের বার তারিখ, বৃহস্পতিবার ফরিদাবাদ এবং শুক্রবার তের তারিখ[৪৫] দিল্লী এসে পৌছালাম। সেখানে পৌছে সবার প্রথম আমি আমার পিতামহ হুমায়ূনের কবর যিয়ারত করলাম, সেই খ্যাতিমান সম্রাটের উদ্দেশ্যে আমি ভক্তিঅঞ্জলি অর্পণ করলাম। চারপাশের গরীবদের ভেতর ত্রিশ হাযার টাকা ও কাপড়চোপড় নিজের হাতে বিতরণ করে দিলাম। তারপর আমি নিযাম উদ্দীন আওলিয়ার মাজার দর্শনে গেলাম। আমীর জামাল উদ্দীন আঞ্জুর কাছে পঞ্চাশ হাযার টাকা এবং হাকিম মুযাফফরের কাছে আরও বিশ হাযার টাকা মাজারের চারপাশের বাশিন্দাদের ভেতর বিতরণের জন্য দিলাম। ঐ সংকটকালে আহমেদাবাদে এই মর্মে নির্দেশ পাঠান ভাল মনে করলাম; গুজরাটের রাজস্বের বকেয়া যেন রাজা বিক্রমজিৎকে বুঝিয়ে দেওয়া হয় এবং যুজবাসীদের (পঞ্চাশ অশ্বের অধিনায়ক) খরচ মেটানোর পর রাজকীয় কোষাগারের জন্য নির্দিষ্ট করে রাখা হয়।

জূলহজ মাসের ১৪ তারিখ শনিবার আমি বীরার সরাইখানায় এসে শিবির গাড়লাম। এই সরাইখানা পলাতক খসরু পুড়িয়ে দিয়ে চলে গেছে। এখানেই আমি আগা মৌলাকে একহাযারী মনসবদারী এবং দেড়শো ঘোড়ার বরাদ্দ থেকে পনের শ' মনসবদারীতে উন্নীত করে দিলাম। বাদাকশানবাসী জামিল বেগের হাতে এক লক্ষ পাঁচ মিসকাল পরিমাণের আশরফি তার গোত্রের ভেতর বিতরণের জন্য দিলাম, যাতে করে তারা ভবিষ্যতের প্রচুর আশার সম্ভাবনায় উদ্দীপিত হয়। কারণ এরা এখনও মন থেকে সাম্প্রতিক বিচ্ছিন্নতাবাদী ও উপপ্লবমূলক কার্যাবলীর ফলে উদ্ভূত শঙ্কা কাটিয়ে উঠতে পারেনি। আজমীরের মঈনউদ্দীন চিশতীর মাজারের চারপাশের দরবেশদের ভেতর বিতরণের জন্য পঞ্চাশ হাজার টাকা রাজা মানসিংহকে দেওয়ার জন্য আমি নির্দেশ দিয়েছিলাম। ঐ মাসের ষোল তারিখ সোমবার আমরা পানিপথে এসে উপস্থিত হলাম।

---

৪৪. ১৬০৬ খ্রীস্টাব্দের ২রা এপ্রিল।
৪৫. ১৬০৬ খ্রীস্টাব্দের ৫ই এপ্রিল।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

তৈমুর বংশের জন্য এ শহরটি সবসময়ই শুভ সংকেত বহনকারী। পিতা আকবর-এর পাশেই দুটি গুরুত্বপূর্ণ যুদ্ধে জয়ী হয়েছিলেন। পানিপথের প্রান্তরেই আমার পিতামহ হুমায়ূন আফগান সুলতান ইব্রাহিম লোদীকে পরাজিত করেছিলেন। এই যুদ্ধে তিনি কি করে জয়ী হয়েছিলেন সেই ঘটনাই এখন বর্ণনা করব।

আফগান বেলালের পুত্র ও ইব্রাহিমের পিতা সিকান্দার লোদী। তিনি তাতার খানের পুত্র দৌলত খানকে পানিপথের শাসনকর্তা নিযুক্ত করেছিলেন। সিকান্দার লোদীর মৃত্যুর পর দৌলত খান ইব্রাহিমের ভয় ও আতঙ্কের কারণ হয়ে উঠে। নতুন রাজবংশের রাজধানী দিল্লী, সেখানে দৌলত খানকে ডেকে পাঠান হল। তার নিরাপত্তা সম্পর্কে সন্দিহান হওয়ায় দৌলত খান দিল্লী যাওয়ার নির্দেশ এড়িয়ে গিয়ে পুত্র দিলওয়ার খানকে তার জায়গায় পাঠিয়ে দিল। জানতে পেরে ইব্রাহিম দিলওয়ারকে লিখে জানাল, যদি তার পিতা সত্বর দরবারে এসে হাযির না হয় তাহলে, কুচক্রী আমীরদের ভাগ্যের মত তারও দশা হবে। ঐ কুচক্রীদের নাম উল্লেখ নিস্প্রয়োজন। দিলওয়ার খান এই হুমকী বার্তা তার পিতার কাছে পাঠাতে কসুর করল না। দিল্লী যাওয়া সম্ভব নয় লিখে দিয়ে দৌলত খান কাবুলে পালিয়ে গেল। সেখানে গিয়ে সে আমার পিতামহের সঙ্গে যোগ দিল। এই ঘটনা উৎসারিত পরিস্থিতির দরুন আমি ইব্রাহিম খান গাওরকে উচ্চতম পদমর্যাদার এবং দিলওয়ার খান উপাধিতে ভূষিত করেছিলাম।

সে যাই হোক, বোখারাবাসী সৈয়দ হামিদের পুত্র সৈয়দ কামাল যদি পানিপথে দিলওয়ার খানের জায়গায় থাকত, তাহলে হতভাগ্য খসরুর পক্ষে পানিপথ ছেড়ে যাওয়া সম্ভব হত না। তার কারণ দীর্ঘ তিক্ত অভিযানের ফলে সে ক্লান্ত, অবসন্ন; তার অনুচররা আমার অনবচ্ছিন্ন পশ্চাদ্বাবনের ফলে ভীতচকিত, তার দরুন তারা হতাশাচ্ছন্ন। আরও, আমার সেনাবাহিনী চারদিক থেকে তাদের ঘিরে ফেলেছে, পূর্বেই সে আদেশ আমি দিয়েছিলাম। পরিশেষে, অবশ্য দিলওয়ার খান গাওর তার ভুলের প্রায়শ্চিত্ত করেছিল, তাকে যেতে হল লাহোরে, সেখানে সে লাহোর শহরকে খসরুর হাতে পড়া থেকে রক্ষা করল, যেমন সৈয়দ কামাল করেছিল খসরুর সঙ্গে, যার কথা এখন উল্লেখ করা হবে।

এক ক্রৌড়ীর (রাজস্ব আদায়কারী) কাছ থেকে পাল্কি সংগ্রহ করে পানিপথ থেকে খসরু পালিয়ে যেতে সক্ষম হয়েছিল এবং দিলওয়ার খান সেই একই জায়গা থেকে রওয়ানা হয়ে গিয়েছিল, পলাতক খসরুর অধীনে যে-সৈন্যবাহিনী আছে তার খবর নিতে সে ভুলে যায়নি। আব্দুর রহমান ছিল পাঞ্জাবের দেওয়ান। দিলওয়ার খান থেকে খসরুর আগমনের বার্তা পেয়ে লাহোর দুর্গে সে আট হাযার ঘোড়সওয়ার ও পদাতিক জড়ো করেছিল। বেশসংখ্যক সৈন্যসামন্ত নিয়ে পলাতক কুমারের সঙ্গে দেখা করতে গিয়ে সে তার কাছে আত্মসমর্পণ করে বসল। এই বিশ্বাসঘাতকতার বিনিময়ে খসরুর কাছে সে মালেক আনওয়ার পদবীতে এবং তার ক্ষণস্থায়ী সরকারের লেফটেনান্ট জেনারেলের পদে নিযুক্ত হয়েছিল। খসরুর

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

পরাজয়ের পর অমন হীন অকৃতজ্ঞতার যোগ্য শাস্তি সে ভোগ করেছে, তাকে বন্দী করে কালোরঙা গাধার কাঁচা চামড়ার মধ্যে পুরে সেলাই করে লাহোরের বাজার-রাস্তায় ঘোরান হয়েছিল, পরে অবশ্য তার অসহায় সন্তানসন্ততিদের মুখ চেয়ে তাকে মার্জনা করে দিয়েছিলাম। তার কৃত অমন অপরাধ সত্যিই করুণার অযোগ্য; কিন্তু আমার মন এত কোমল যে কিছু কারণ খুজে পেলে অমন দয়া-করুণা প্রদর্শন করে মন আমার খুশী হয়ে উঠে। রাষ্ট্রীয় কাজ পরিচালনায় দুধরণের অপরাধের কখনও মার্জনা করা যায় না, সে হচ্ছে রাষ্ট্রদ্রোহিতা এবং হারেম অভ্যন্তরে বিশ্বাসঘাতকতা।

জুলহজ মাসের ১৭ তারিখ বুধবার আমি কর্ণালে পৌছে ঈদি খাজাকে দুহাযারী আমীরের পদ প্রদান করলাম এবং তানাসেরের শেখ নিজামকে উপঢৌকন হিসাবে দিলাম দুহাযার টাকা। এখানেই আমার কানে এসে পৌছল একটি সাধারণ দোকানদার নাকি বলে বেড়াচ্ছে সে আল্লাহকে মরচক্ষে উদ্ভাসিত করে তুলতে পারে। তার অমন বেদীন কথাবার্তার ফলে বেশসংখ্যক মানুষকে সে অভিভূত করে ফেলেছে; কিন্তু আমার বোধশক্তিকে সে তার উদ্ভট ও বেদীন জল্পনা-কল্পনা দিয়ে অভিভূত করতে ব্যর্থ হওয়ায়, তাকে মক্কা যাওয়ার অনুমতি দিয়ে, হিন্দুস্তান থেকে সরিয়ে দিয়েছিলাম।

ঐ মাসের[৪৬] ১৯ তারিখ বৃহস্পতিবার আমরা এসে পৌছলাম শাহাবাদে। সেখানে ভয়ংকর জলকষ্টে আমরা ভুগেছিলাম। দুহাত তুলে আমি আল্লাহর কাছে তাই প্রার্থনা করলাম এবং সৌভাগ্যক্রমে ঐদিনেই সেখানে প্রচুর বারিপাত হল। শাহাবাদে উপস্থিত সৈন্যবাহিনীর জল সরবরাহ এভাবেই হল। বিশাল বাহিনীর মধ্যেই পানির কি অপরিসীম মূল্য তা উপলব্ধি করা যায়, এমনও দেখা গেছে, সাধারণত যারা স্বচ্ছ ঝর্ণার পানি খেতেও ইতস্তত করে, তারাই দুর্গন্ধযুক্ত পঙ্কিল পানি গিলছে খুশীর সাথেই, যেন ঐ পানি জীবনদায়িনী। না, গর্বোদ্ধত সম্রাটদের ভাগ্যে এমন মুহূর্তও এসেছে, যখন তারা হীরের বদলে এক ফোটা পানি চেয়ে ব্যর্থ হয়েছে।

আমি নিজেই একটি ঘটনার সাক্ষ্য দিতে পারি। যেবার আমি প্রথম পিতা আকবরের সঙ্গে কাশ্মীর উপত্যকায় বেড়াতে গিয়েছিলাম, তখনই ঐ ঘটনা ঘটেছিল আমার জীবনে। কোমল তৃণপ্রান্তর ও নির্মল শোভা দেখে আমি খুশী হয়ে উঠেছিলাম। হিন্দুস্তানের সমতলে অমন সৌন্দর্যের দেখা মেলে না। আমরা যেই পিরেনতালের গিরিপথে এসে প্রবেশ করলাম, আমি পরিচারকদের হারিয়ে ফেললাম, আর তখনই ক্ষুধাতৃষ্ণার আমার গলা শুকিয়ে এসেছে। খাদ্য, ফল, পানীয় খুঁজে খুঁজে আমি হয়রান, পরিচারক, পেয়ালাবাহক কি দাস, কারোরই দেখা নেই ভীড়ের মধ্যে, গিরিপথে সবাই ঠাসা, শ্বাসরুদ্ধ হওয়ার যোগাড়।

আমি আগেই বলেছি খিদেয় আমি কাতর, ভীড় ঠেলে কিছুদূর এগিয়ে দেখি

---

৪৬. ১৬০৬ খ্রীষ্টাব্দের ১১ই এপ্রিল।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

আসফ খানের গুটিকয় ভেড়া যাচ্ছে। ঘোড়া থেকে নেমেই ভেড়া একটি জবাই করে শিগগীর কাবাব বানাতে বললাম, খিদের জ্বালা মেটাবার জন্য। এখন আমার বয়স চল্লিশ আমি হলফ করে বলতে পারি ঐ সাধাসিধে খাদ্য ভেড়ার গোশতের মধ্যে আমি যা তৃপ্তি পেয়েছি সারাজীবনে তেমন আর পাইনি। ক্ষুধাতৃষ্ণার সময় হাতের কাছে খাদ্য না থাকলে যে কি অবস্থা হয় আমি এখন তা বুঝেছি, তার দরুন আমি আমার পরিচারকদের নির্দেশ দিয়েছিলাম, সে অভিযান কিংবা শিকার, যাই হোক না কেন, খাবারের ঝুড়ি সঙ্গে না নিয়ে তারা যেন না আসে। যতদিন আমরা কাশ্মীরে ছিলাম, খান খানান কিংবা আমি কখনও খাদ্য ছাড়া কোথাও বের হইনি। এখানে কাশ্মীরিদের একটি কথার উল্লেখ না করে পারছিনে। সে হচ্ছে পিরেনতাল গিরিপথে মানুষ কিংবা পশুর রক্তপাত হলেই প্রাকৃতিক ভয়ংকর দুর্যোগ এরপর দেখা দেয়। আমি এটুকু মাত্র বলতে পারি ঐ তথ্যের সমর্থনে কোন কিছু ঘটতে আমি কখনও দেখিনি।

শাহাবাদের শিবিরেই আমি শেখ আহমেদ লাহোরীকে মীর আদিলের পদে অধিষ্ঠিত করেছিলাম। সিংহাসনে আরোহণের পূর্বে আমার অধীনে সে একই পদে নিযুক্ত ছিল। তার কাজের কথা কখনও আমি ভুলে যাইনি। সে অবশ্য আমার কাছে থেকে শিক্ষালাভ করেছে। তার মত যুবক, তাদের বৃত্তি সাংবাদিকতা কিংবা যাই হোক না কেন, প্রায় ৬০ জনেরও বেশী আছে, তারা সবাই আমার শিষ্য, আমার আশ্রিত। কতকগুলি বিশেষ কর্তব্যবিধি মোতাবেক তাদেরকে শিক্ষা দেওয়ার নির্দেশ ছিল। তাদের মধ্যে বিশেষ কটির উল্লেখ করব :

তাদের কালক্ষেপণে তারা যেন কখনও তাদের বিরোধীদের দ্বারা প্রতারিত না হয়। সবসময় তারা আল্লাহর উপর আস্থাশীল থাকবে, সবসময় তারা স্রষ্টার কাছে ত্রাণ ও আশ্রয় চাইবে। যুদ্ধ কিংবা শিকার ছাড়া, নিজের হাতে তারা কোন জীবের মৃত্যুর কারণ হবে না। আলোককে তারা পরম শক্তিমানের মহিমা ও শক্তির উৎস বলে গণ্য করবে। সর্বপ্রকৃতিকে তাঁর স্বতোদ্ভাসিত সত্তার প্রতিভাস বলে মনে করবে। সবসময় মানসিক বৃত্তিগুলিকে সংযত রাখতে হবে। মুহূর্তের জন্যও আল্লাহকে বিস্মৃত তারা যেন না হয়। সব কাজই যেন ঐ ধারণা দিয়ে পরিচালিত হয়–তাঁকে স্মরণে না রেখে কখনও যেন কিছু না করে।

মানসিক সংযমের এইসব বিধিনিষেধে পিতা, যিনি এখন স্বর্গে, যিনি আমার সর্ববিষয়ে শিক্ষক, তিনি ছিলেন কীর্তিমান রূপে পূর্ণাঙ্গ, এইসব কিছুকেই, তিনি তাঁর ঘরে বাইরের আচরণীয় বিধিতে পরিণত করেছিলেন। তাঁর অধীনে যারা কাজ করেছে তিনি ছিলেন তাদের বন্ধু। তাঁকে ঐকান্তিকভাবে স্মরণ করতে ও তাঁর উপর নির্ভর করতে আমিও কম প্রলুব্ধ হইনি। তাঁর উপর নির্ভর করা তাঁর প্রতি পেশাদারী ভণ্ড শ্রদ্ধার চেয়ে ভাল, যে-ক্ষেত্রে পরিবর্তমান পৃথিবীর উদ্ভট অহংকার কল্পনাকে উদ্দীপিত করে তোলে। ঐ মহান সম্রাটের ক্লান্তিহীন পবিত্রতা এমনই ছিল, মনে হয় পৃথিবীতে তার তুলনা নেই; কারণ রাত্রের বেশীর ভাগই তিনি আল্লাহর ধ্যানে কাটাতেন; তসবী জপ করে তাঁর প্রশংসা করতেন এবং আল্লাহর

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

শানের কাছে সেজদা দিয়ে পড়ে থাকতেন। তাঁর নির্দেশপত্রেও তিনি কখনও উল্লেখ করতে ভুলতেন না, যদি আমি জীবনের নানা অসুবিধা থেকে উত্তীর্ণ হতে চাই নিজের স্বস্তি ও অন্যের সন্তোষের জন্য, তাহলে তাঁর উপর নির্ভর ছাড়া আর কারও উপর যেন না করি, কারণ তিনি হচ্ছেন সৃষ্টির বিধান। (শ্লোকগুলি বাদ দেওয়া হল, তাঁর পিতা সবসময়ই এগুলি আবৃত্তি করতেন, এই বলেছেন তিনি।)

জূলহজ মাসের ২১ তারিখ শনিবার আনন্দে পৌঁছে উজবেকবাসী আলী বেগকে বাহাদুর খান পদবীতে ভূষিত করেছিলাম। তারপর তার সঙ্গে সাতান্ন জন আমীর ও মনসবদার দিয়ে শেখ ফরিদের সাহায্যে পাঠালাম। তাদের মধ্যে একহাযারী থেকে পাঁচহাযারী পর্যন্ত আমীর ও মনসবদার ছিল। শেখ ফরিদ অগ্রগামী বাহিনী নিয়ে আমাদের আগে আগে চলেছে। সেই সঙ্গে আমি শেখ ফরিদকে দশ লক্ষ টাকা পাঠিয়ে দিলাম। ঐ টাকা ইরাকের তিন হাযার তোমানের সমান। ঐ টাকায় শেখ ফরিদ যেন বাহাদুর খান, বাদাকশানবাসী জামিল বেগ, শরীফ আমল ও অন্যান্য পদস্থ ব্যক্তিদের আপ্যায়ন করতে পারে। এইভাবে তাদের উৎসাহিত করলাম, যেন তারা একলক্ষ্য হয়ে বিদ্রোহীদের উপর ঝাঁপিয়ে পড়ে জয়ের শুভবার্তা আমার সমীপে জলদি নিয়ে আসে।

ঐ মাসের ২৪ তারিখে পেলাম আমার বিজয় পতাকা পলাতকদের সামনে এসে পৌঁছানোর খবর পেয়ে খসরুর কিছু সংখ্যক দৃঢ়পণ সেনাপতি তার অনুমতি নিল যুদ্ধ করবার। শেখ ফরিদও সাহস ভরে ঝাণ্ডা তুলে ধরেছিল, সে-ঝাণ্ডার নীচে সে তৈরী হয়েছে যুদ্ধের জন্য। পূর্বোল্লিখিত বাহাদুর খান, যাকে আমি বাদাকশানের রাজত্ব প্রদান করেছি, যাকে আমি জানি অভিজ্ঞ সৈনিক বলে, সে তার সৈন্যদল সাজিয়ে ফেলেছে যুদ্ধ করবার জন্য। তার সৈন্যদলকে তিন কলামে ভাগ করেছে, তার একটি নিয়ে সে ঝাঁপিয়ে পড়েছে শত্রুদলের সম্মুখ ভাগে। আর বাকী দুই কলাম পাশ দিয়ে দুশমনদের আক্রমণ করেছে। যুদ্ধ শুরু হল, দুপক্ষেই বেশ সংখ্যক নিহত হল, দুপক্ষই সমান জেদী, কিন্তু খসরুর চার প্রধান সেনাপতি গেল পালিয়ে, বাকী দুই সেনাপতিকে সহস্র বন্দী শুদ্ধ জ্যান্ত অবস্থায় আমার কাছে এনে উপস্থিত করা হল, কারও গলায় কাঠের জোয়াল ঝুলিয়ে দেওয়া হল, কাউকে বা নদীতে ডুবিয়ে মারা হল এবং বাদবাকীকে হাতীর পায়ের নীচে পীষে মারা হল। যারা যুদ্ধক্ষেত্র থেকে আহত হয়ে পালিয়ে যেতে পেরেছে, তারা শুধু ভীত, বিব্রত, হতাশ ও ভগ্নহৃদয়ে হাযির হল গিয়ে খসরুর সমীপে।

ঐ একই দিনে লাহোর দুর্গের অবরোধ প্রসঙ্গে বারবার খবর আসতে লাগল। তাঁতে জানা গেল দুর্গমধ্যস্থ সৈন্য ও শহরের বাসিন্দারা একই স্বার্থে হাত মিলিয়েছে এবং পরস্পরকে সাহায্যের জন্য তৈরী হয়েছে। এই পরিপ্রেক্ষিতে হাসান বেগ বাদাকশানী খসরুকে বলল যে, লাহোরের বাশিন্দারা শাহী কোষাগারের দরজা খুলে ফেলেছে এবং গোলন্দাজদের যথেচ্ছভাবে অর্থ দিচ্ছে, তারাও সেই অর্থ গ্রহণ করছে, তাদের বেতন বাদেও এই অর্থ তারা নিচ্ছে; এইভাবে অর্থের অপচয় হচ্ছে। লোকটির আসল উদ্দেশ্য খসরুকে লাহোর লুণ্ঠনে

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

প্ররোচিত করা, তাকে সংঘর্ষে লিপ্ত করা, যার থেকে উদ্ধারের পথ নেই; শহরটি সত্যই ধনী বাসিন্দায় পরিবৃত। ঐ কপট প্রস্তাবে বিভ্রান্ত এবং শহর লুণ্ঠন করা হলে তার হাতে অমিত ঐশ্বর্য আসবে, এই ধারণায় খসরু তক্ষণি নির্দেশ দিয়েছিল শহরের ফটক বন্ধ করে দেওয়ার জন্য। সাত দিন ধরে ঐ শহর অবিরাম নিষ্ঠুর লুণ্ঠনের শিকার হল, ধনীব্যক্তিদের সন্তানসন্ততিদের জামিন হিসাবে কয়েদঘরে আটকে রাখা হল।

রক্তকলংকিত দস্যুর দল এখন দুর্গের কোন একটি দরজায় আগুন লাগাতে উদ্যত। বারটি প্রধান তোরণ ও চারটি সৈন্য নির্গম দ্বার আছে শহরে ও দুর্গে প্রবেশ করার। ইতঃমধ্যে দিলওয়ার খান হুসাইন বেগ (আমার প্রাসাদে সে এখন কর্মচারী) নূর উদ্দীন কুলী কোতওয়াল ও আর যারা তার সাহায্য করছে, তাদের নিয়ে ভেতর থেকে তোরণ রক্ষা করবার জন্য এগিয়ে আসল। শত্রুপক্ষ এখনও আগুন ধরাতে সক্ষম হয়নি, দুর্গমধ্যস্থ বাশিন্দারা অবিরাম কেবল উপর থেকে পানি ঢেলে চলেছে। এভাবে তোরণের কাঠে আগুন লাগাতে ব্যর্থ হল বলে, শত্রুপক্ষ দমে গেল। নূর উদ্দীন কুলী দুর্গের প্রাকারে উঠে তার গোলন্দাজদের দিয়ে দেওয়াল ও মিনার থেকে এমনি গোলা বর্ষণ শুরু করল যে লুণ্ঠনকারীদের অবস্থা হয়ে উঠল সঙ্গীন ও মারাত্মক।

তার সৈন্যদের মত খসরুর সেনাপতিরাও দুর্গ দখলে ব্যর্থ মনোরথ হল, সেই সঙ্গে তাদের কানে এসে পৌছল শাহী সৈন্যের আগমন বার্তা, তারা এখন বুঝতে পারল রাষ্ট্রদ্রোহিতার বোকামি, যে-রাষ্ট্রদ্রোহিতায় তারা সবাই মগ্ন ছিল। তারা নিজেরাই বুঝে উঠতে পারল না অন্যদের অবরোধ করার আগে তারাই কখন অবরুদ্ধ হয়ে পড়বে। তারা ভীত, শংকিত। তবু তারা যুদ্ধ ও মৃত্যুর জন্য দৃঢ়সংকল্প, তাদের সঙ্গে আছে এক লক্ষ বার হাযার অশ্বারোহী, এই সৈন্য তারা সংগ্রহ করতে পেরেছে, এই সৈন্যদল নিয়ে রাত্রে একই সঙ্গে তারা আমার শিবিরের উপর ঝাঁপিয়ে পড়বে বলে ঠিক করল।

AMARBOI.COM

এই বিরাট পরিকল্পনা মনে রেখে জূলহজ মাসের ২৪ তারিখ মঙ্গলবার তারা মগরেবের নামায ও নৈশ-আহারের মধ্যবর্তী সময়ে লাহোর অবরোধ তুলে শহর ছেড়ে চলে গেল। ২৬ তারিখ বৃহস্পতিবার[৪৭] সন্ধ্যায় রওজস আলীর সরাইখানাতে আমি বসে। চর এসে জানাল, লাহোর অবরোধ তুলে খসরু বিশ হাযার সৈন্য নিয়ে যে কোথায় গেছে কেউ বলতে পারে না। এই খবর শুনে আমি উদ্বিগ্ন হয়ে উঠলাম, খসরু খুব সম্ভব আমার হাত এড়িয়ে পালিয়ে যেতে পারবে, বাইরে প্রচুর ও অবিরাম বৃষ্টি হচ্ছে, তার মধ্যেই সৈন্যদলকে রওয়ানা হয়ে যাওয়ার জন্য নির্দেশ দিলাম। সেইদিনেই আমি গোন্দওয়াল নদী পেরিয়ে দোওয়ালে এসে হাযির হলাম।

২৬ তারিখ বৃহস্পতিবার দুপুর বেলা শেখ ফরিদ পথরোধ করে দাঁড়াতে

৪৭. ১৬০৬ খ্রীষ্টাব্দের ১৮ই এপ্রিল।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

সক্ষম হল, এবারে শত্রুপক্ষের মুখোমুখী শেষপর্যন্ত সে হতে পারল। সুলতানপুরে তখন আমি বসে, মুয়েজ-উল-মুলকের আনীত কিছু ভাজা গম খাচ্ছিলাম, তখনই চর এসে জানাল শেখ ফরিদের অবস্থা এবং সত্যিই খসরুর বাহিনীর সঙ্গে সে লড়াই শুরু করে দিয়েছে। এক লোকমা তাড়াতাড়ি গিলে আমি আমার ঘোড়া জলদি ডাকিয়ে এনে, আল্লাহর হাতে নিজেকে ছেড়ে দিয়ে, যুদ্ধের জন্য দেরি না করেই বেরিয়ে গেলাম। তখন আমার সঙ্গে অস্ত্রশস্ত্রের মধ্যে তরবারি ও বর্শা ছাড়া আর কিছুই ছিল না। আমার সঙ্গে ছিল দশ হাযারেরও বেশী অশ্বারোহী, তারা কেউ জানত না সেদিনেই তাদের যুদ্ধে অবতীর্ণ হতে হবে। যতই দৈবানুগ্রহ থাক না কেন, অত কম সৈন্য নিয়ে যুদ্ধে অবতীর্ণ হওয়া সামরিক বিজ্ঞান সম্মত নয়, আর সৈন্যরা তাদের কমসংখ্যায় বেশ ঘাবড়ে গেছে। এই ধারণা দূর করবার জন্য কি সংকটজনক পরিস্থিতির মুখোমুখী আমরা হয়েছি, সে জানিয়ে দিলাম এবং বখশীদের নির্দেশ দিলাম সমস্ত সেনাবাহিনী নিয়ে আমাদের সমর্থনে এগিয়ে আসার জন্য। গোণ্ডওয়ালে পৌঁছে দেখা গেল আমার সৈন্যসংখ্যা বিশ হাযার অশ্বারোহী ও পঞ্চাশ হাযার উষ্ট্রবাহিত গোলন্দাজে এসে দাঁড়িয়েছে। তাদের সবাইকে আমি শেখ ফরিদের সাহায্যের জন্য পাঠিয়ে দিলাম।

এই সংকটে আমার মনে হল মীর জামাল উদ্দীন হুসাইনকে একটি বার্তা নিয়ে খসরুর কাছে পাঠান ভালই হবে, সে যেন সময় থাকতে সরে আসে এবং আল্লাহ-সৃষ্ট সহস্র জীবনের খুনোখুনির বিশাল দায়িত্বভার সম্পর্কে অবহিত হয়, এইসব জানানর জন্য। এই বার্তা পেয়ে সে যদিও আমার কাছে আসার জন্য ইচ্ছুক ছিল, কিন্তু তাকে ঘিরে আছে দুশ্চরিত্র বিদ্রোহীরা, তাদের পরামর্শে সে নিজেকে সংবরণ করল। জামাল উদ্দীনের মারফত সে আমাকে জানাল, এতদূর আসার পর, যুদ্ধ ছাড়া আর কোন পথ নেই এবং আল্লাহ নিশ্চয়ই তাকে মুকুটে ভূষিত করবেন, যার যথার্থই সম্রাট হবার যোগ্যতা আছে।

মীর জামাল উদ্দীনের কাছ থেকে খসরুর এই প্রগলভ জবাব শোনার পর, আমি শেখ ফরিদকে বলে পাঠালাম দেরি করবার আর কারণ নেই, সে যেন সত্বর শত্রুপক্ষের মূল বাহিনী আক্রমণ করে। এই আদেশ মুহূর্তমাত্র দেরি না করে পালন করা হল। একপাশ দিয়ে বাহাদুর খান উজবেক আক্রমণ শুরু করল, সূতী কাপড়ে সজ্জিত ত্রিশ হাযার অশ্বারোহী এবং বিশ হাযার উষ্ট্রবাহিত গোলন্দাজদের পুরোভাগে সে; অন্যদিকে শেখ ফরিদ বাছাই করা দেহরক্ষীদের নিয়ে শত্রুপক্ষের উপর পড়ল ঝাঁপিয়ে। খসরুর সেনাবাহিনী তখন অশ্বারোহী ও গোলন্দাজ মিলে হবে দুলক্ষের মত, তার অশ্বারোহীরা বাহাদুর খানের সৈন্যদলের মতই সূতী কাপড় পরা। দিনের দ্বিতীয় প্রহরে যুদ্ধ শুরু হল এবং চলল সূর্যাস্ত অবধি। আল্লাহর করুণা ও সাম্রাজ্যের সৌভাগ্য আমার পক্ষে, তাই সেদিন আমি জিতে গেলাম; ত্রিশ হাযার শত্রুসেনা মারা গেছে, বাকীরা প্রতিরোধ ছেড়ে দিয়ে যুদ্ধক্ষেত্র থেকে ভয়ে পালিয়ে গেল।

খসরু যেখানে ছিল, বাহাদুর খান সেখানেই এসে হাযির হল। খসরু ঘোড়া

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

থেকে নেমে পাল্কিতে চড়ে বসেছে, ভেবেছে যুদ্ধের সোরগোলের মধ্যে কারও নযরে না পড়ে পালিয়ে যেতে পারবে। বাহাদুর খান তার সৈন্য নিয়ে খসরুকে ঘিরে ফেলল। শেখ ফরিদও সেখানে এসে উপস্থিত হল। খসরু দেখল পালাবার কোন পথই নেই, তার ধরা পড়া ছাড়া গত্যন্তর নেই, তাই পাল্কি থেকে বেরিয়ে এল, শেখ ফরিদের কাছে বলল, যুদ্ধের আর দরকার নেই, সে নিজেই তার পিতার পদতলে নিজেকে সমর্পণ করতে যাচ্ছে।

আল্লাহ সাক্ষী, গোগুওয়ালে থাকা কালীন ঐ সংকটজনক অবস্থায় আমার কেবলি মনে হচ্ছিল খসরু এসে আমার কাছে হাযির হবে; কিন্তু জামাল উদ্দীন হুসাইন সন্দেহ প্রকাশ করতে দ্বিধা করল না, শেখ ফরিদ সে রাত্রে শত্রুপক্ষের আক্রমণ প্রতিহত করতে পারবে বলে তার মনে হয় না, কারণ সে নিজ চোখে দেখে এসেছে খসরুর সঙ্গে দুই লক্ষেরও বেশী যোদ্ধা আছে। আমাদের অমন কথোপকথনের সময় ঘোষণা করা হল যে শেখ ফরিদ যুদ্ধে জয়লাভ করেছে এবং খসরুকে বন্দী করা হয়েছে। এই খুশখবরী বিশ্বাস করতে দ্বিধা করে জামাল উদ্দীন ঘোড়া থেকে নেমে আমার পদতলে পড়ে বলতে লাগল, যদিও শাহীভাগ্য শুভলক্ষণের সংকেতবহ, তবু এই বার্তায় বিশ্বাস করতে তার মন উঠছে না। কিছুক্ষণ বাদে সব সন্দেহের অপসারণ হল, যখন পাল্কিতে চড়ে খসরু তার গোলন্দাজ বাহিনীর সেনাপতি সহ আমার সামনে এসে হাযির হল।

শেখ ফরিদ এবং বাহাদুর খান দুজনই এই নাজুক পরিস্থিতিতে সাহস ও বিপুল কর্মদক্ষতার পরিচয় দিয়েছে। আমি বাহাদুর খানকে পাঁচহাযারী পদ, সেইসঙ্গে পতাকা ও নাকাড়ার তকমা, অশ্বসজ্জা সহ গুটিকয়েক অশ্ব প্রদান করলাম এবং কান্দাহারের শাসনকর্তার পদে তাকে নিযুক্ত করলাম। শেখ ফরিদ পূর্বে দুহাযারী আমীরের পদে অধিষ্ঠিত ছিল। আমি এখন তাকে চারহাযারী পদে উন্নীত করে দিলাম। সৈয়দ মুহম্মদের পুত্র সাইফ খান ও বিপুল শৌর্যবীর্যের পরিচয় দিয়েছিল, তার শরীরের নানা অংশে কম করেও সতেরটি ক্ষত হয়েছিল। সৈয়দ জালাল তার হৃদয়ের উপরিভাগে ভয়ঙ্কর আঘাত পেয়েছিল, সে আঘাতের দরুন কিছুদিন বাদে সে মারা গেল। আফগানদের বনেদী বংশের ছেলে ছিল সে।

সৈয়দ হালাল আর তার ভ্রাতা ছিল খসরুর দুই সেনাপতি। শাহী নাকাড়ার আওয়াযে আতঙ্কিত হয়ে ভীতচকিত অবস্থায় তারা যুদ্ধের শুরুতেই পালিয়ে গিয়েছিল। প্রায় চারশো গোত্রের দলপতি যুদ্ধে প্রাণ হারিয়েছিল এবং প্রায় সাত শত বন্দীকে নানা জায়গা থেকে সংগ্রহ করে আমার কাছে উপস্থিত করা হয়েছিল। খসরুর ধনরত্নের সিন্দুক যাদের হাতে পড়েছিল তাদের আর খোঁজ পাওয়া যায়নি। ধনরত্নের পরিমাণ হবে প্রায় দুকোটি আশরফি[৪৮]। (এক একটি আশরফি পাঁচ মিসকাল পরিমাণের।)

সেই বৃহস্পতিবারেই আমি লাহোর দুর্গে প্রবেশ করেছিলাম। প্রধান মিনারের

---

৪৮. আঠার কোটি টাকা।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

উপর পিতা যে শাহী করোকা তৈরী করেছিলেন হাতীর লড়াই দেখার জন্য, সেখানে আমি ডেরা বাধলাম। রাভী নদীর বুকে বেশ কয়েকটি শূলদণ্ড প্রোথিত করবার হুকুম আমি দিয়েছিলাম করোকায় বসে। আমার বিরুদ্ধে খসরুর সঙ্গে যারা যোগ দিয়েছিল, সেই সাতশো বিশ্বাসঘাতককে আমি জ্যান্ত শূলে চড়িয়ে দিলাম। এর চেয়ে কঠিন শাস্তি আর কিছুই হতে পারে না, তার কারণ, মৃত্যুর আগে তাদের নির্মম যন্ত্রণা ভোগ করতে হয়। ঐ নির্মম নির্যাতনের দৃশ্য তাদের জন্য উদাহরণস্বরূপ, যারা তাদের প্রতিপালকদের বিরুদ্ধে কুচক্রে মেতে উঠে।

রাজকীয় কোষাগার আগ্রায়, সেজন্যে আমার রাজত্বের সূচনাতে লাহোরের ভণ্ডদের মধ্যে বেশী দিন থাকা সুবুদ্ধির পরিচায়ক হবে না। আমি তাই লাহোর ছেড়ে রাজধানীতে ফিরে এলাম। হতভাগা খসরুকে রেখে এলাম দিলওয়ার খানের হাতে। সে এখন লজ্জা ও অনুতাপের আগুনে দগ্ধ হচ্ছে। দিলওয়ার খানকে আমি নির্দেশ দিয়ে এসেছি সে যেন খসরুর উপর সদা সতর্ক কড়া নযর রাখে। পুত্রকে রাজবংশের খুঁটি মনে করা উচিত; সেই কারণে তার সঙ্গে বিরোধ ও অনৈক্য স্থাপনের অর্থ সাম্রাজ্যের সমৃদ্ধিকেই নড়বড়ে করে তোলা। আমি কখনই অবিবেচক পরামর্শে পথভ্রষ্ট হইনি, সে এই ক্ষেত্রে অথবা অন্য যে-কোন ক্ষেত্রেই হোক। আমার কার্যকলাপ যতদূর পর্যন্ত আমার নিয়ন্ত্রণাধীনে, ততটুকু আমার যুক্তি ও অভিজ্ঞতার দ্বারা পরিচালিত হয়েছে। সবসময় আমি মনে রেখেছি সেই শ্রেষ্ঠ পরিচালক আমার পিতার কথা, যিনি বলেছেন দুটি জিনিস সম্রাটের মধ্যে থাকা সবসময় প্রয়োজন বুদ্ধিমত্তা ও একনিষ্ঠতা দিয়ে ঘটনার সদ্ব্যবহার করা, একটি সার্বভৌম শক্তি সংরক্ষণের জন্য দরকার, অন্যটির দরকার সৌভাগ্যের সংরক্ষণের জন্য; কিন্তু প্রায়ই দেখা যায়, সমৃদ্ধিশালী জীবনপ্রবাহে তাল থাকে না, বিশেষ পর্যায়ের পরেই আমাদের আঙ্গুল গলিয়ে সে ঝরে যায়, আর ফেরে না।

AMARBOI.COM

কাহিনীর ব্যাখ্যানেই ফিরে আসা যাক। ১০১৫ হিযরীর সফর মাসের ২৬ তারিখ[৪৯] আমি রাজধানী আগ্রায় ফিরে এলাম। আমি এখানে না বলে পারছি না, অতীত আচরণের জন্য দু:খিত হতভাগা খসরু তিন দিন তিন রাত না খেয়েছে খাবার না ছুঁয়েছে পানি। সে শুধু কেঁদেছে আর বিলাপ করেছে, খাদ্য বা পানীয় কোন কিছুই গ্রহণ করেনি। এইসব হচ্ছে গভীর অনুতাপের লক্ষণ, বিশেষ করে পৃথিবীর সাধুদের চরিত্রে অমন দেখা যায়, কিন্তু তারাও দিনে একবার করে অল্প কিছু মুখে দেওয়া প্রয়োজনীয় বলে মনে করেন। বলাইবাহুল্য, তিন দিন তিন রাত একাদিক্রমে না খেয়ে থাকলে তাঁরা পরদিন মৃত্যুর বুকে ঢলে পড়তেন।

(কালুজান কিংবা কুম্ভাজান নামক কারও সম্পর্কে জাহাঙ্গীর শাহ্ এখানে উল্লেখ করছেন।)

কি সেবায়, কি নিষ্ঠায়, কি তাকে দেয় কাজের প্রতি মনোযোগে সে তার পিতাকে ছাড়িয়ে গিয়েছিল। রাতে এবং দিনে তার হাযিরার কামাই নেই। যে-

---

৪৯. ১৬৬৬ খ্রীষ্টাব্দের ১৫ই জুন।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

আবহাওয়াই হোক না কেন, তার লাঠির উপর ভর দিয়ে সে আমাকে রাত থেকে ভোর অবধি পড়ে শুনাত। আমার শিকারদলের একজন হওয়ার পরও সে তার অভ্যাস ছেড়ে দেয়নি। এই কাজের দরুন সিংহাসনে আরোহণের আগে তাকে আমি একহাযারী মনসবদারী প্রদান করেছিলাম, পরে তাকে দুহাযারীতে উন্নীত করে দিয়েছিলাম। তার এখন বয়স হওয়ার দরুন আগের মত সে আর কাজ করতে পারে না। প্রসঙ্গত এখানে আমি মন্তব্য করব যে, রাজারা মানুষের চেহারার চেয়ে তাদের কাজকেই বড় করে দেখেন এবং কাজের ক্ষেত্রে তার কতটুকু উন্নতি হয়েছে সেই পরিমাণে তাদের মর্যাদা, ঐশ্বর্য বৃদ্ধি পায়।

প্রতি মাসের পহেলা তারিখ আমার পিতা বন্দুক চালনা চর্চা করতেন। তাঁর উদ্দেশ্য ছিল তাঁর আমীরদের কাছে ঐ চালনা সম্পর্কে উদাহরণ স্থাপন করা। তাঁর অনুসরণে দরবারের সবাই, উচ্চপদ অধিকারী থেকে নিম্নপদ অধিকারী পর্যন্ত, রাষ্ট্রীয় কর্মে নিযুক্ত সবাই বন্দুক চালনা করত। মাসের ঐ দিনটি ছাড়া অন্য কোন সময় ঐ সব কামান কি বন্দুক ছোঁড়ার চর্চা হত না। যুদ্ধের কথা অবশ্য স্বতন্ত্র। ঐ প্রথার অনুকরণে বন্দুক চালনা চর্চা আমি অব্যাহত রেখেছিলাম। আমার বন্দুক দ্রসতানড়ুজ থেকে নিক্ষিপ্ত গুলীর পর সেনাবাহিনীর সবাইকে গুলী ছুঁড়তে হত। মোটকথা তেফাঙ্গ অথবা দিয়াশলাইর কাঠি দিয়ে বারুদে আগুন-জালান বন্দুকের লক্ষ্যভেদ অপূর্ব, ঐ বন্দুক কারিগরী নৈপুণ্যের নিদর্শন। যদি কোন তেফাঙ্গধারী হাযার পঞ্চাশেক অশ্বারোহী বাহিনীর অগ্রভাগে উষ্ট্রবাহিত পঞ্চাশ হাযার সৈন্যবাহিনী থাকে, তাহলে ঐ সৈন্যবল নিয়ে যে-কোন কাজ করা যেতে পারে। আমি এ প্রসঙ্গে আরও উল্লেখ করব, রাষ্ট্রীয় বেতনভুক অমন সৈন্যদলের সংখ্যা পাঁচ লক্ষ। ঐ সৈন্যসংখ্যা আমার প্রত্যক্ষ অধীনে, তাদের খুব জরুরী বার্তা দিয়ে সমবেত করা সম্ভব। ঐ বন্দুকধারীরা পদাতিক ও উষ্ট্রবাহিত দুরকমেরই আছে। অবশ্য সাম্রাজ্যের বিভিন্ন দুর্গ, প্রধান প্রধান শহর ও নানা জায়গায় যে-সব সৈন্য মোতায়েন আছে, তাদের বাদ দিয়ে। তাদের সংখ্যা প্রায় ত্রিশ লক্ষের মত। এদের মধ্যে বিভিন্ন দুর্গের কামান চালকদের ধরা হয়নি। ঐ সব কামানের জন্য হিন্দুস্তানী ওজনে পঞ্চাশ থেকে ষাট মন বারুদ দরকার।

যে-সময় আমি লাহোর থেকে আগ্রা রওয়ানা হয়েছিলাম, যে-প্রসঙ্গের উল্লেখ আগেই করা হয়েছে, পথিমধ্যে থেকেই আমি নতুন একটি নির্দেশ জারী করেছিলাম। লাহোর থেকে আগ্রার সড়কের দুপাশে ঘনপল্লব বিশিষ্ট গাছ সড়কের দুপাশের শহর, গ্রাম, সরাইখানায় রোপনের নির্দেশ আমি স্থানীয় জমিদারদের দিয়েছিলাম। পথশ্রান্ত, ক্লান্ত মুসাফির যাতে করে গ্রীষ্মের প্রখর রোদের হাত থেকে রক্ষা পায়, তাছাড়া, প্রতি আট ক্রোশ অন্তর ইট কিংবা পাথরের সরাইখানা, বিশ্রামাগার, খাবারের দোকান তৈরীর আমি নির্দেশ দিয়েছিলাম। ইট কিংবা পাথরের তৈরীর উদ্দেশ্য যাতে তাড়াতাড়ি ধ্বংস হয়ে না যায়। ঐ সব সরাইখানা কিংবা বিশ্রামাগারের সংলগ্ন স্নানাগার ও পানীয় জলের জন্য একটি করে পুকুর থাকবে। তাদের রক্ষণাবেক্ষণ, ঝাঁট দেওয়া ও পরিচ্ছন্ন রাখার জন্য পরিচারক ও

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

নিযুক্ত করা হল এবং নদীপথে, সে ছোট কিংবা বড় হোক, সেতু নির্মাণ করতে আমি নির্দেশ দিয়েছিলাম, যাতে করে মুসাফিররা কোনভাবেই বাধা না পেয়ে তাদের গন্তব্যে পৌছতে পারে।

ঐ একই ভাবে আগ্রা থেকে বাংলা পর্যন্ত সড়কের দুধারে গাছ রোপণ ও সরাইখানা তৈরী করা হল। আগ্রা থেকে বাংলা ছয় মাসের পথ। ঐ সব গাছ এত বড় হয়ে গিয়েছিল যে ঘনপল্লব ছায়া তারা দিতে সক্ষম হয়েছে। তাছাড়া, অনেক করুণাপ্রবণ ব্যক্তি, আমার কাজে-উৎসাহিত হয়ে নানা জায়গায় বানিয়েছিলেন বিশাল বাগান ও ফলফলাদির গাছ। যে-সময়ে আমি এই আত্মজীবনী লিখছি, তখন কেউ যদি আমার সাম্রাজ্যে ভ্রমণে বের হন তাহলে তিনি দেখবে্ন পথিমধ্যে তাঁর থাকার জন্য বিরাট বাড়ি অপেক্ষমান, তিনি খাবার জন্য পাবেন তাজা ফল ও শাকসব্জি, তার দরুন তিনি হয়ত বলেই বসবেন ভ্রমণের শ্রান্তি-ক্লান্তি বলে তিনি কিছুই জানেন না।

এইসব কাজই নিশ্চিতভাবে এখন ও পরকালে উপকারে লাগবে। এইসব কাজই বোবা কবরে আমাদের শুয়ে থাকা সার্থক করে তুলবে, এইসব কাজ উৎসারিত অবদানই মানুষের কাছে আমাদের স্মৃতিকে জাগিয়ে রাখবে। এই সঙ্গে একথা যেন আমরা না ভাবি অতন্দ্র থাকা আমাদের স্বভাবজাত বা বিনয়নম্র দূরদর্শিতা বনীআদমের বংশের চরিত্রগত ধর্ম, কারণ দুনিয়াদারীর রঙ্গরসে মন দূষিত, এক মিসকাল সোনা কিংবা রূপা ধর্মীয় বা আল্লাহর কাজে পাওয়ার জো নেই[৫০]।

সম্রাটদের শাসনকার্য পরিচালনা সম্পর্কে যে বিধি প্রচলিত, তাতে উল্লেখ আছে, অভিজ্ঞ ব্যক্তিদের পরামর্শ ছাড়া কোন কাজে হাত দেওয়া বিধেয় নয়। তবু আমি বলতে চাই, সৎ মন থেকে উৎসারিত না হলে মন্ত্রণায় নিরাপত্তা নেই। আমার বক্তব্য হচ্ছে, রাষ্ট্রসংক্রান্ত কাজ অন্যের মতামতের উপর সঁপে দেওয়ার মানে হৃদয়ের গোপনতম ব্যাপারে আল্লাহর সঙ্গে অন্য কাউকে সঙ্গী করা। 'হীরক দিয়ে সূর্যরশ্মি আমরা হয়ত দ্বিখণ্ডিত করতে পারি, যে-হীরক আমাদের চক্ষু বিদ্ধ করে; এমন কি আমাদের বুদ্ধিবৃত্তি দিয়ে নক্ষত্রদের কক্ষপথ জেনে নিতে পারি, ড্রাগনের থাবার মধ্যে আমরা হয়ত নিশ্চিন্তে থাকতে পারি; কিন্তু কোন ব্যক্তির কাছেই মনের ভার তুলে ধরা যেতে পারে না।' যিনি তাঁর দেশের ভাগ্য অন্যের বুদ্ধি নিয়ে পরিচালিত করে, তাঁর ভুলে যাওয়া উচিত নয়, অবিবেচনাপ্রসূত ক্ষমতা হস্তান্তরের দরুন প্রতিটি কাজ, অরাজকতা, অন্যায় সিদ্ধান্ত, দমন-নীতি ও লোকের উপর অবিচারের জন্য তিনিই রোয কিয়ামতে দায়ী হবেন। সম্রাটকেই জবাবদিহি করতে হবে, তাঁর পরামর্শদাতাদের নয়। যিনি মুকুট ও রাজদণ্ড ধারণ করছেন, তিনি ব্যক্তিগত ভাবে তাঁর প্রজাবৃন্দের দুঃখ জানা ও নিবারণের জন্য কি করছেন,

---

৫০. এই অনুচ্ছেদটি ফার্সী পাণ্ডুলিপিতে দুর্বোধ্যভাবে লেখা। তার দরুন উপরোক্ত অর্থ ছাড়া অন্য কোন অর্থ বের করবার উপায় নেই।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

যাতে করে কেউই জুলুমের কব্জাবন্ধ না হতে পারে। আমি এখন প্রসঙ্গান্তরে যাব।

মোসাহেব খান উজবেকিস্তানের বাসিন্দা। তাঁর যুগের শ্রেষ্ঠ বীরদের তিনি অন্যতম। আমার পিতার আমলে তিনি তিনহাযারী আমীরের পদ লাভ করেছিলেন। তাঁকে আমি পাঁচহাযারী পদে উন্নীত করে গুজরাটের সৈন্যবাহিনীর ফৌজদার করে পাঠালাম। এই বীরের কিছু সাহসিকতা রুস্তমের জীবনের উজ্জ্বলতম পর্বের সঙ্গে তুলনীয়। গুজরাট জেলা সীমান্ত এলাকা। আগে জেলাটি ছিল চাষবাসের অযোগ্য, ঝোপঝাড়ে ভরা পাহাড়ী বিরাণ এলাকা। মোসাহেব খানের তত্ত্বাবধানে এলাকাটি হয়ে উঠল ছিমছাম, পরিপাটি, যে কেউ ঐ এলাকার এক প্রান্ত থেকে অন্য প্রান্ত অবধি নিশ্চিন্তে নির্বিঘ্নে ঘুরে বেড়াতে পারে। এই সময়ই আমি তাঁকে খান পদবীতে ভূষিত করেছিলাম।

তাঁর বিপুল সাহস ও উপস্থিত বুদ্ধির একটি নযীর না উল্লেখ করে আমি পারছি না। একবার পিতা লাহোরের কাছেই সিংহ শিকারে বেরিয়েছিলেন। তাঁর সঙ্গে গিয়েছিল চার হাযার বারুদী বন্দুকওয়ালা। হাতীতে চড়ে তিনি বনের মধ্যে ঢুকে গিয়েছিলেন। বনটিতে কুড়িটির মত হিংস্র, নির্মম সিংহ-সিংহী থাকে বলে সবাই জানে। হঠাৎ তিনটি সিংহী হাতীটিকে আক্রমণ করে বসল, একটিতো আচমকাই লাফ দিয়ে পিতার উরুদেশ কামড়ে ধরল। ভাগ্য ভাল, মোসাহেব খান তাঁর ঘোড়া খোপাড়ায় চড়ে সেখানে হাযির। ঘোড়াটি সিংহ কি হাতী, কিছুই ভয় করত না। চোখের পলকের মধ্যে মোসাহেব খান গেলেন ছুটে, এক হাতে সিংহীর ঘাড় ঝাপটে ধরলেন, অন্য হাতে খঞ্জর বসিয়ে দিলেন ভীষণ ঐ পশুটির পিঠে। এভাবে কাবু হওয়াতে সিংহীটি পিতাকে ছেড়ে দিল আর আঘাত না করে; কিন্তু তাতেই সব শেষ হল না। সেই মুহূর্তেই দুটি সিংহ একসঙ্গে ঝাঁপিয়ে পড়ল মোসাহেব খানের উপর; অবিশ্বাস্য হলেও মোসাহেব খান দুহাতে সিংহ দুটির গলা ধরে এমন জোরে পরস্পরের মাথায় ঠুকলেন যে তাদের নাক-মুখ দিয়ে ঘিলু এল বেরিয়ে। এই এবং আরও সব সাহসিক কাজের দরুন তাঁকে সরফরাজ খান উপাধিতে ভূষিত করা হয়েছিল, যুদ্ধক্ষেত্রের বীরত্বের জন্যও তিনি কম খ্যাতিমান নন।

আরও একজন সর্দার তাঁর সাহসের জন্য কীর্তিমান। তিনি হলেন মীর্জা মাহমুদ। মাসেদের বিখ্যাত সৈয়দ বংশোদ্ভূত তিনি। পিতার আমলে তিনি পাঁচশো মনসবদারীতে অধিষ্ঠিত ছিলেন। তাঁকে আমি প্রথমদিকেই একহাযারী আমীর শ্রেণীতে উন্নীত করে দিয়েছিলাম। একবার বিশালকায় এক সিংহ নিকটস্থ অরণ্যে বন্দুকের গুলীতে আহত হয়ে আমার সামনে নীত হয়েছিল। কয়েক দিন কোনমতে বেঁচে থাকার পর সিংহটি মারা যায়। আমার মনে সন্দেহ জেগেছিল তরবারির এক আঘাতে পশুটির দেহ থেকে মাথা দ্বিখণ্ডিত করা সম্ভব কি-না সম্পর্কে, উপস্থিত অনুচরবৃন্দের কয়েক জন বলল, ঘাড়ের মোটা কেশরের দরুন অমন কাজ সম্ভব নয়। জনৈক রাজপুত্র, যে নিজেকে রাজা মানসিংহের আত্মীয় বলে দাবী করে থাকে এবং দৈহিক শক্তি ও সাহসিকতার জন্য যে কীর্তিমান, সে এগিয়ে এসে

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

বলল, যদি আমি অনুমতি প্রদান করি তাহলে এক ঘায়েই মাথা সে দ্বিখণ্ডিত করে দেবে। কথামত সে তরবারি বের করে সর্বশক্তি দিয়ে মরা সিংহের ঘাড়ে বাড়ি মারল, ফল হল কেশরগুচ্ছের কয়েকগাছি লোমের অপসরণ। তাই দেখে মীর্জা মাহমুদও এগিয়ে এল, আমার অনুমতি প্রার্থনা করল সিংহের ঘাড়ে শক্তি পরীক্ষা করবার জন্য। আমি বলে উঠলাম, 'আল্লাহর নাম করেই বলছি দেখি তুমি কি করতে পার।' কথামত সে এগিয়ে এসে তরবারি তুলে এমন সুকৌশল প্রচণ্ড এক কোপ মারল যে মাথা দ্বিখণ্ডিত হয়ে ছিটকে পড়ল দূরে, সমবেত সবাই আনন্দে হর্ষধ্বনি করে উঠল। ঐ জায়গায়ই আমি তাকে ত্রিশ হাযার টাকা উপঢৌকন দিলাম এবং তাকে মীর্জা মাহমুদ শের-বে-দু-নিম (সিংহ দ্বিখণ্ডক) উপাধিতে ভূষিত করলাম।

মীর্জা শামসি আমার পিতার দুধভাই মীর্জা কোকাহর পুত্র। তিনি একবার গুজরাট থেকে আমাকে বিশাল এক ধনুক পাঠিয়েছিলেন। ধনুকটি এমন ছিল যে শক্তিধর পুরুষ সমস্ত ক্ষমতা প্রয়োগ করেও ধনুকটি বাঁকাতে পারতেন না। মীর্জা মাহমুদকে ফের ডেকে আনা হল। আমার অনুমতি নেবার পর সে ধনুকটি তুলে নিয়ে খুব সহজ ভাবেই এমন ভাবে বাঁকিয়ে ধরল যে কোনা দুটি ছোঁয় ছোঁয়, মাঝখানটা ভেঙ্গে যায় আর কি। যারা দেখল তারা সবাই আশ্চর্য হয়ে গেল। তার দরুন তার উপর দাক্ষিণ্য বিতরণের আরেকটি সুযোগ পেলাম। তাকে আমি একহাযারী থেকে পনের শতে পদোন্নতি করে দিলাম, সেই সঙ্গে তার নতুন উপাধি দিলাম মীর্জা মাহমুদ পীচকেম্যান (ধনুক-বক্রকারী)। আমার কাছ থেকে লাহোর সীমান্তের ফৌজদারী পাওয়ার পর ঐ অঞ্চলের শক্তিশালী জনৈক রাজার সঙ্গে তার সংঘর্ষ শুরু হল। তাকে সে পর্যুদস্ত করতে সমর্থ হয়েছিল। তার দরুন আমার সব সেরা হাতী তাকে উপঢৌকন দিয়েছিলাম; আরও, আমার প্রাসাদের জনৈকা অন্তঃপুরিকার সঙ্গে তার বিয়েও দিয়েছিলাম।

দরবারের আর একজন আমীর শৌর্যবীর্যের জন্য বিখ্যাত ছিলেন। তিনি হলেন বাকের নজুমখানী। তীর ছোঁড়ায় দুনিয়ায় তাঁর সমকক্ষ কেউ ছিল না। এই বিদ্যায় তার পটুত্ব এমন পর্যায়ে পৌছেছিল যে তার একটি আশ্বর্য নযীর এখানে উল্লেখ করলেই যথেষ্ট হবে যে, এক বিকালে আমার উপস্থিতিতেই তার কাছে রাখা হয়েছিল একটি স্বচ্ছ কাচের বোতল, ঐ বোতলের একটু দূরেই একটি টর্চ, মোম দিয়ে তারা মাছির মত কি একটা বানিয়ে বোতলের পাশে সেঁটে দিয়েছিল, আর বোতলটিত ভঙ্গুর মোমের ঐ জিনিসটির উপর তারা রেখেছে একদানা চাল এবং একটি মরিচ। তার প্রথম ছোড়া তীর গিয়ে বিদ্ধ করল মরিচটি, দুনম্বর তীর চালের দানা নিল উড়িয়ে, তিন নম্বর লক্ষ্যভেদ করল মোমের পুতুল, কিন্তু কাচের বোতলটির কিছুই হল না, আগেই বলেছি কাচের বোতলটি ভয়ঙ্কর ঠুনকো। তীরন্দাজের অমন শিল্প-নৈপুণ্য আশ্চর্যের চেয়ে আশ্চর্য, নিঃসন্দেহে তাই বলা যায় তীর ছোঁড়ায় অমন নৈপুণ্যের নযীর দেশকালে কোথাও নেই। তাকে তারিফ করি তার নমুনা হিসাবেই তাকে একহাযারী থেকে দুহাযারী মনসবদারীতে উন্নীত করে

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

দিয়েছিলাম এবং তার হাতে নূরজাহান বেগমের বোনের মেয়েকে সম্প্রদান করেছিলাম। এই বিয়ের দরুন সে হয়ে উঠল আমার কাছে পুত্রবৎ।

আমার কাছে খবর এসে পৌছল কান্দাহারের চারপাশের সড়কে আফগানদের দৌরাত্ম্যে মুসাফিরদের চলাফেরা করা দায়। তার দরুন আমি ভেবেছিলাম দুর্ধর্ষ সেনাবাহিনী নিযুক্ত করে ঐসব আইনভঙ্গকারী তস্করদের উচ্ছেদ করে দেব। যখন আমি ঐ ব্যাপার নিয়ে ভাবছি, তখন প্রচুর যশ-মানের অধিকারী এবং আমার দরবারে যিনি আল্লাদাদ পদবীতে ভূষিত, তিনি এমন যুক্তি-তর্ক দিয়ে তাঁর বক্তব্য পেশ করলেন যে, আমি প্রদেশের জন্য ফৌজদার নিযুক্ত করার সঙ্কল্প গ্রহণ করলাম। ফৌজদারের শাসনের মধ্যে যদি তারা দৌরাত্ম্য শুরু করে, তাহলে কোন সাবধানী বাণী উচ্চারণ না করেই তাদের উচ্ছেদ করা যাবে। কোন ইতস্তত না করেই আমি তাকে ঐ পদে নিয়োগ করেছিলাম। তিনি এখন পর্যন্ত ঐ পদেই আসীন আছেন।

ঐ অঞ্চলের আর একটি কাজ কিন্তু অত সহজে সুরাহা হয়নি। লস্করখানের আসল নাম খাজা আবুল হুসাইন। প্রথম থেকেই তিনি তৈমুর বংশের কাজে নিযুক্ত। সম্প্রতি তাঁকে ঐ পদবীতে ভূষিত করা হয়েছে। আমার নির্দেশেই তাঁকে কাবুল অভিমুখে প্রেরণ করা হয়েছে, দস্যুদের হামলায় পথঘাট বিপজ্জনক, তাঁর উপর ভার পড়েছে পথঘাট নিরাপদ করবার জন্য। তাঁর গন্তব্যের প্রায় কাছে এসে দেখলেন একদল পাহাড়ী তাঁর পথরোধ করে দাঁড়িয়েছে। তাদের চালচলন কি কথাবার্তা বন্যপশু কি শয়তানের চেয়েও খারাপ। তাদের সংখ্যা চল্লিশ হাযার, পদাতিক অশ্বারোহী ও বারুদী শুদ্ধ, তারা তাঁর পথ রুদ্ধ করে দাঁড়িয়ে। তবু আল্লাহর করুণা এবং আমার অক্ষয় সৌভাগ্যের উপর আস্থা রেখে, তিনি দ্বিধামাত্র না করে, সেই অসম বাহিনী নিয়েই তাঁর চেয়ে বহুগুণ শক্তিশালী শত্রুদের উপর ঝাঁপিয়ে পড়লেন। যুদ্ধ শুরু হল, দুপক্ষই দৃঢ়পণ, চলল ভোর থেকে সূর্য ডোবা অবধি। শত্রুপক্ষ অবশ্য শেষ পর্যন্ত হেরে গেল, তাদের নিহতদের সংখ্যা সতের হাযার, বহু সংখ্যক বন্দী হল এবং বেশী সংখ্যক লোকই তাদের পাহাড়ী আস্তানায় পালিয়ে গেল। বন্দীদের জোয়াল যুক্ত করে আমার সামনে উপস্থাপিত করা হয়েছিল, তাদের গলায় ঝুলছিল যুদ্ধে নিহত সতের হাযার ব্যক্তির মাথার খুলি। এইসব বন্দীদের নিয়ে কি করা হবে, তা নিয়ে বেশ জল্পনা-কল্পনা করা হল। আমি ঠিক করলাম, তাদের প্রাণে মারা হবে না, আমার হাতীর দলের খোরাক আনার ব্যাপারে তাদের নিয়োগ করা হবে[৫১]।

এতদিন দস্যুদের দৌরাত্ম্যের দরুন কাবুলের সঙ্গে যোগাযোগ বন্ধ ছিল। লস্কর খানের জয়লাভের পর এখন যোগাযোগ পুনঃ প্রতিষ্ঠিত ও এমন নিরাপদ হল যে ঐ প্রদেশের সব রকমের ফল লাহোরে প্রায় রোজই পাওয়া যেত। অবশ্য দাম খুব সস্তা এবং প্রচুর পরিমাণে নয়। অতগুলি মানুষের রক্তপাত নিশ্চয়ই

---

৫১. এই লাইন কয়েকটি অনুমান নির্ভর। মূল একেবারে দুর্বোধ্য, পাঠোদ্ধারের অতীত।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

বেদনাদায়ক, কিন্তু অন্য পথের খোঁজ না পাওয়া পর্যন্ত, রক্তপাত না করে উপায় তো নেই। রাষ্ট্রীয় কাজ দুঃখজনক হলেও কঠোরতা ছাড়া সম্পন্ন করা সম্ভব নয় এবং মধ্যে মধ্যে মানুষের মৃত্যুদণ্ডও জরুরী। ঐ ধরনের জবরদস্তি ও শাস্তি না থাকলে পৃথিবী পশুর মত ভয়াবহ মানুষ জাতিতে ভরে যেত, পরস্পর পরস্পরের সঙ্গে যুঝছে প্রতিহিংসা ও বদলা নেওয়ার জন্য। আল্লাহ সাক্ষী সম্রাটদের জন্য কোন শান্তি নেই। রাষ্ট্রীয় ক্ষমতার সঙ্গে যে-যন্ত্রণা ও উদ্বিগ্নতা জড়িত, তার তুলনা নেই, কারণ রাষ্ট্রীয় ক্ষমতা যাঁর হাতে তাঁর জন্য পৃথিবীতে মুহূর্তের জন্যও বিশ্রাম নেই। সতর্কতা ও উদ্বিগ্নতা হচ্ছে রাজাদের ভাগ্য, কারণ কর্তব্যে এক লহমার ক্রটি হলে হাযারও রকম উৎপাত ঘটার সম্ভাবনা। এমন কি নিদ্রাও সম্রাটদের জন্য শান্তি আনে না, বিরোধী পক্ষ তার চক্রান্ত চরিতার্থ করবার জন্য অবিরাম কাজ করে চলেছে। একথা সত্যি যে রাজারা তাঁদের শরীরের লোমকূপেই দুশমনের সাক্ষাৎ পেয়ে থাকেন। 'আমার এই উপদেশ যেন রত্নের মত তোমার কানে শোভা পায়। আল্লাহ যদি তোমাকে সার্বভৌম ক্ষমতার অধিকারী করে থাকেন–তাহলে প্রজাসাধারণের কল্যাণের জন্য সর্বদা প্রয়াস নেও। সুবর্ণ-মণ্ডিত প্রাসাদের চেয়ে সুনাম রেখে যাওয়া ভাল।'

এ প্রসঙ্গে একথা আমি না ভেবে পারছি না যাঁকে আল্লাহ রাজসিক অতুল ঐশ্বর্য ও বৈভবের অধিকারী ও তাঁর সৃষ্ট জীবনের কাছে পুণ্য চরিত্রে বিভূষিত করেছেন, তিনি যদি তাঁর সিংহাসনের স্থায়িত্ব ও দীর্ঘায়ু জীবনযাপনের ইচ্ছুক হন, সেক্ষেত্রে তাঁর হাতে সমর্পিত প্রজাসাধারণের কথা ভুলে যাওয়া তাঁর পক্ষে কোন ক্রমেই উচিত নয়। জোরের সঙ্গে নিজের কথা বলতে পারি যে, আমি এখন পর্যন্ত কখনই দুনিয়াদারীর আরাম-আয়েসে নিজেকে হারিয়ে ফেলিনি, আমি ভুলিনি যে আরাম-আয়াস যতই মধুময় মনে হোক না কেন, তার ফলশ্রুতি মহাবিষের চেয়েও তিক্ত। হায়রে! যে অতুল ঐশ্বর্যের সমারোহ আমার চারপাশে, আমার চোখে তার কোন মূল্য নেই, ঐ ঐশ্বর্য ও ভোগস্পৃহা বিন্দুমাত্র আমার নেই। যৌবনের ললিত সৌন্দর্যের কথা আমি কি কখনও আনন্দের সঙ্গে ভেবেছি? ভোগের নিবৃত্তি ঘটেছে, আমার স্বভাব থেকে অবলুপ্ত হয়েছে। শিকার ও সামাজিক বিনোদন প্রায় ক্ষেত্রেই দুঃখ ও যন্ত্রণার কারণ হয়েছে। বুড়া হতে আমি চলেছি, তার মানে ছুটি নেওয়াই আমার বড় সান্ত্বনা, আমার নিশ্চিত শক্তির উৎস, যেখান থেকে আমি সবচেয়ে বেশী সুবিধা পেতে পারব। মোটকথা, পৃথিবীতে কোন কালেই স্থায়ী শান্তি ও সুখ পাওয়া যায় না। সবকিছুই ক্ষণিকের মোহমাত্র এবং মর। চোখের পলকে সেই মায়াময়ী পৃথিবী ও তার সেবকদের বন্দী করে ফেলে, গলা টিপে একটির পর একটিকে হত্যা করে; মানুষ তেমনি জীবনের দুর্বিপাকের কাছে উন্মোচিত, জীবন তাকে মাড়িয়ে চলে, কেউ হয়ত বলেও উঠতে পারে তার কোন অস্তিত্বই নেই। 'সেই পৃথিবী, যার পরিণামে দুঃখভোগ, অতসব নিরর্থক হানাহানির যোগ্য নয়।'

ভবিষ্যতের কথা ভেবে যদি আমি তস্কর কিংবা দস্যুদের সঙ্গে নির্মম আচরণ প্রবৃত্ত হয়ে থাকি, সে আমার শৈশব কিংবা সিংহাসনে অধিরোহণের পরেই হোক

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

না কেন, তার মধ্যে আর যাই হোক ব্যক্তিগত স্বার্থ অথবা উচ্চাশার লেশমাত্র ছিল না। পৃথিবীর বিশ্বাসঘাতকতা ও অস্থিরচিত্ততা আমার কাছে দিনের আলোর মতই স্পষ্ট। জীবন ভোগের জন্য যে জিনিসের সবচেয়ে প্রয়োজন সৌভাগ্যক্রমে তা আমার অধিকারে আছে। সোনাদানা, ধনরত্ন, মহার্ঘ পোশাক ও জগতের শ্রেষ্ঠ সুন্দরী, এসব ব্যাপারে আর কেউ কি আমাকে ছাড়িয়ে যেতে পেরেছে? আমি যদি তখন থেকে মনের বালাই ছেড়ে দিয়ে আল্লাহ যাদের সুখ শান্তি আমার হাতে সমর্পণ করেছেন তাদের শাসন করতাম, তাহলে ত আমি নীচুমনা জালিম বলে পরিগণিত হতাম।

লঘু প্রসঙ্গের কিছু অবতারণা করা যাক। যে সময়ের কথা আমি বলছি তখন বাংলা দেশে বাযীকরের দেখা পাওয়া যেত। তাদের খেলায় তারা এমন নিপুণ যে আমার স্মৃতিকথায় সে সম্পর্কে উল্লেখ করা হয়ত অপ্রাসঙ্গিক হবে না। একবার আমার দরবারে সাত জন বাযীকর এসে উপস্থিত, তারা বেশ গর্বের সঙ্গেই বলেছিল মানবীয় বুদ্ধির অগম্য অদ্ভুত সব খেলা তারা দেখাতে পারে। সত্যি বলতে কি যখন তারা খেলা দেখান শুরু করল, সে সবই আশ্চর্য ধরনের, না দেখলে ঐ সব যে হতে পারে তা ধারণার অতীত বলে মনে হয়; বস্তুত আমাদের যুগের বিস্ময়কর ঘটনা বলে এগুলিকে বিবেচিত করা যায়।

এক–তারা বলল, যে কোন গাছের নাম করা হলে তারা সেই গাছের বীজ মাটিতে পুতে দেবে এবং আমি আশ্চর্য এক ফলাফল প্রত্যক্ষ করব। উপস্থিত আমীরদের একজন, খানজাহান মন্তব্য করলেন, যদি তারা সত্যি কথা বলে থাকে, তাহলে তিনি তাঁর বিশ্বাস প্রতিপাদনের জন্য তুঁতগাছ দেখতে চান। বাযীকররা দ্বিধা না করে উঠে দাঁড়াল, দশটি বিভিন্ন জায়গায় মাটিতে বীজ পুঁতল, নিজেদের মধ্যে হিংটিং ছট কি সব আবৃত্তি করল, যাঁরা দাঁড়িয়ে ছিল তাদের বোঝার অগম্য, হঠাৎ দেখা গেল দশ জায়গা থেকে গাছ গজিয়ে উঠছে এবং প্রতিটি গাছই ঠিক খানজাহান যা চেয়েছিলেন সেই গাছ। এভাবে তারা আম, আপেল, সাইপ্রেস, আনারস, ডুমুর, বাদাম, সুপারি এবং অন্যান্য গাছ বানিয়ে দেখাল এবং কোন কিছুই গোপন না করে। সবারই চোখের সামনে গাছগুলি আস্তে আস্তে গজিয়ে মাটি থেকে এক ফুট কি দু'ফুট লম্বা হয়ে উঠল, তাদের পাতা গজাল, ডাল বেরল; বিশেষ করে আপেল গাছের ফল বেরল, সে ফল আমার কাছে নিয়ে আসা হল, তার গন্ধ সম্পর্কে আমি হলফ করে বলতে পারি।

আপেল গাছ সম্পর্কেই এ শুধু সত্য নয়। অন্যান্য গাছও পূর্ববর্ণিত ভাবে বানিয়ে তারা বলল, যদি আমি হুকুম দিই, তাহলে আমি প্রত্যেকটি গাছের ফলের স্বাদ নিয়ে দেখতে পারি। যে অদ্ভুত বিস্ময়ে আমরা অভিভূত হয়ে গিয়েছিলাম তা আরও গেল বেড়ে। তারা প্রতিটি গাছের চারপাশ ঘুরে ঘুরে কি যেন সব বলল এবং পলকের মধ্যেই আমগাছে আটি ছাড়া আম, বাদাম গাছে তাজা ও পাকা বাদাম, ডুমুর গাছে সুস্বাদু বড় ডুমুর, আনারস গাছে আনারস, অর্থাৎ কিনা যে সব গাছের বীজ তারা পুতেছিল প্রতিটি গাছেই সেই সেই ফল দেখা দিল, ফল পেড়ে

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

নিয়ে আনা হল আমার সামনে এবং সবাই সেই সব ফল চেখে দেখলেন। শুধু তাই নয়। গাছ সরিয়ে নেওয়ার আগে তার পাতায় এসে বসল পাখিরা, সুন্দর তাদের বর্ণ ও আকার, কি মিষ্টি তাদের গলা, পৃথিবীতে এমন পাখি আগে কেউ দেখেনি; পাখিগুলি যে ঠিক পাখি, তা বোঝানোর জন্যই পরস্পর তারা কিচির মিচির শুরু করে দিল, ডানা মেলে দিল, এ ডাল থেকে সে ডালে উড়ে উড়ে বেড়াল। খেলা শেষ হবার আগে, হেমন্তের পাতার মত, গাছের পাতা মলিন হয়ে এল এবং আস্তে আস্তে গাছগুলি মাটির ভেতর মিলিয়ে গেল, যেখান থেকে তারা উঠে এসেছিল। আমি শুধু এটুকু বলতে চাই, যে ঘটনার বর্ণনা আমি করলাম তা যদি আমার সামনে না ঘটত, তাহলে অমন যে হতে পারে আমি কিছুতেই বিশ্বাস করতাম না।

দুই–এক রাত্রির দ্বিপ্রহরে, যখন অর্ধেক পৃথিবী অন্ধকারে ঢাকা, ঐ সাত জনের মধ্যে এক বাযীকর, প্রায় উলঙ্গ দেহে, বারকয়েক ঘুরে ঘুরে চাদর দিয়ে শরীর নিল জড়িয়ে, চাদরের তলা থেকে বের করে আনল প্রজ্জ্বল একটি আয়না, তার আভায় তীব্র উজ্জ্বল এক আলোক তৈরী হল, চারপাশ আলোয় আলোময় হয়ে উঠল, বহুদূরে আলোকিত হয়ে উঠল, সে এতদূর যে বিশ্বাস করা যায় না, সে এতদূর যে মুসাফিররা পর্যন্ত বলেছে বিশেষ এক রাত্রে, দশ দিনের দূরত্বে, তারা আকাশ আলোকিত দেখেছে, সে আলো উজ্জ্বল দিনকেও বুঝি হার মানায়। সেই বিশেষ রাত কিন্তু বাযীকরের প্রদর্শিত আলোক-রশ্মির রাত। এটিও যুগের অন্যতম আশ্চর্য বলে আমার মনে হয়।

তিন–সাত বাজীকর দলবদ্ধভাবে দাঁড়িয়ে, তাদের ঠোঁট নড়ছে না; ঠোঁট না নাড়িয়ে গলা না খুলে, তারা এমন সুস্বর বের করল, মনে হল সাত জনের এক গলা, আশ্চর্য ঐক্যতান তৈরী হল এভাবে। সেইসঙ্গে এও নিশ্চিত ঐ ঐক্যতানে গলা কিংবা ঠোঁটের কোন যোগ নেই। এটিও সবার প্রশংসা অর্জন করল।

চার–বাযীকরেরা তাদের জন্য একশোটি হাওয়াই তীর তৈরী করল। তারা যেখানে দাঁড়িয়ে সেখান থেকে বেশ দূরে উঁচু জায়গায় সেগুলি রেখেছিল। তারা আমায় বলল, তারা যে কোন একটিতে অথবা আমি যদি বলি, তাহলে যতগুলি ইচ্ছা, ততগুলিতে জায়গা থেকে না সরে আমারই সামনে আগুন ধরিয়ে দিতে পারে। কথামত তারা তাই করেছিল। আমি যদি বলতাম একসঙ্গে দশটিতে আগুন ধরিয়ে দিতে তাহলে তাই করত।

পাঁচ–তারা আমার সামনে বিরাট একটি কড়াই রেখেছিল। তাতে কিছু পানি ঢেলে আট মন ছোট দানার ইরাকী চাল ছেড়ে দিয়েছিল। আগুন ছাড়াই কড়াইটি ফুটতে শুরু করল। অল্পক্ষণ বাদে তারা ঢাকনি তুলে ফেলল, ভেতর থেকে বের করে আনল প্রায় একশো পিরিচ ভর্তি মুরগীপোলাও। এটিকেও অত্যাশ্চর্য ঘটনা বলে ধরে নেওয়া যেতে পারে।

ছয়–শুকনো জায়গায় তারা বিশেষ একটি ফুল রেখেছিল। ফুলটিকে ঘিরে তারা তিনবার নেচে নেচে বেড়াল। ফুলটি থেকে উচ্ছ্বিত হয়ে উঠল পানি, সঙ্গে

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

সঙ্গেই গোলাপ বৃষ্টি পড়ল ছড়িয়ে চারধারে, কিন্তু মাটিতে এক ফোটা পানি পড়ল না। অলৌকিক এক নহর উচ্ছ্রিত হল এক ঘণ্টা ধরে, পরে তারা গোলাপটি সরিয়ে নিল, যেখানে ফুলটিকে রাখা হয়েছিল সেখানে এক বিন্দু পানি ঝরেনি। ফের তারা সেই একই ফুল রেখেছিল মাটিতে, এবার ফুলটি থেকে পানি ও পুষ্পআগুন পরপর উচ্ছ্রিত হল। দিনের এক প্রহরের দুই পল ধরে ঐ খেলা চলেছিল।

সাত–সেই সাত বাজীকরের একজন সোজা হয়ে দাঁড়াল, দ্বিতীয় জন তার মাথার উপর মাথা রেখে পা উপরে তুলে ধরল, তৃতীয় জন পা রাখল দ্বিতীয় জনের পায়ের উপর, এভাবে সাত জনই একজনের মাথার উপরে মাথা তার পরের জনের পায়ের উপর পা রেখে পর্যায়ক্রমে তৈরী করল এক মানুষী মিনার। সবার কাছে যা আশ্চর্য ঠেকল তা হচ্ছে এই, প্রথম ব্যক্তি যে বাকী ছয় জনের ভার বহন করে দাঁড়িয়ে, সে এক পা কাঁধ সমান উঁচু করে দাঁড়াল, তার মানে সে দাঁড়িয়ে এক পায়ে ভর করে। এত শক্তি সে কোথা থেকে পেল তা সত্যিই আমার বোধশক্তির অতীত।

আট–সেই সাত জনের একজন আগের মতই সোজা হয়ে দাঁড়িয়ে, পেছন থেকে একজন তার পাছা ধরে এবং এভাবে চল্লিশ জন প্রত্যেকের পাছা ধরে। প্রথম জন তার শক্তির পরীক্ষা দিল, বাকী সবাইকে টেনে আনল তার দিকে। শারীরিক বলের অমন অদ্ভুত পরাকাষ্ঠা দেখান রীতিমত বিস্ময়জনক ব্যাপার।

নয়–তারা জনৈক ব্যক্তির শরীর টুকরা টুকরা করে ফেলল, শরীর থেকে মাথাও বিচ্যুত করে দিল। টুকরা টুকরা দেহখণ্ড তারা মাটিতে দিল ছুঁড়ে। এভাবে কিছুক্ষণ কাটল। তারপর তারা চাদর দিয়ে জায়গাটি দিল ঢেকে। জনৈক বাযীকর চাদরের তলায় ঢুকে গেল। কয়েক মিনিট বাদে আগের সেই ব্যক্তিটি শুদ্ধ এল বেরিয়ে, যে ব্যক্তিটিকে দ্বিখণ্ডিত করা হয়েছে বলে ধরে নেওয়া হয়েছে, সে এল সুস্থ শরীরে বেরিয়ে, সে যে কখনও আঘাত পায়নি হলফ করে যে কেউ তা বলতে পারে।

দশ–ছোট একটি থলে বের করে তারা দেখাল থলেটি খালি। একজন বাযীকর থলেটির ভেতর হাত দিয়ে দুটি বনমোরগ নিয়ে এল বের করে। মোরগ দুটি বেশ বড় ও দেখতে সুন্দর। মোরগ দুটি লড়াই করা শুরু করে দিল, ভীষণ ও ভয়ানক ভাবে। এক এক ঠোক্করে তাদের ডানা থেকে আগুন বের হতে লাগল। এক ঘণ্টা অমন যুদ্ধ চলল। তারপর চাদর দিয়ে মোরগ দুটি ঢেকে দেওয়া হল। চাদর সরিয়ে নেওয়া হলে বেরিয়ে এল এক ঝাঁক তিতির পাখি। উজ্জ্বল সুন্দর তাদের লেজ। তারা মিষ্টি করে শুরু করে দিল কিচির মিচির গান, যেন মানুষজন সামনে কোথাও নেই, পাহাড়ে যেভাবে কা-কা করে তারা খায় সেভাবেই তারা পোকা খেয়ে বেড়াতে লাগল। চাদর দিয়ে আগের মতই তিতিরদের ঢেকে দেওয়া হল। চাদর তোলার পর, পাখিদের বদলে বেরিয়ে এল ভীষণ দুই কালো সাপ, লেপামোছা মাথা ও রক্তিম পেট তাদের। হা-করে, মাথা তুলে, বিড়া পাকিয়ে, তারা পরস্পরকে আক্রমণ করা শুরু করল, ভীষণ সে যুদ্ধ চলল অনেকক্ষণ, তারা অবসন্ন না হওয়া পর্যন্ত। আগের মতই চাদর দিয়ে ঢেকে দেওয়া হল সাপ দুটিকে। চাদর সরিয়ে নেওয়ার পর না দেখা গেল সাপ, না অন্য কিছু।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

এগার–বেশ বড় করে তারা মাটিতে পুকুর বা চৌবাচ্চা খুঁড়ল। তারা আমাদের অনুরোধ জানাল পানি দিয়ে চৌবাচ্চাটি ভরে দিতে। পানি ভরার পর, চৌবাচ্চাটির উপর তারা একটি ঢাকনা বিছিয়ে দিল। কিছুক্ষণ বাদে ঢাকনা সরিয়ে নেওয়া হলে পরে দেখা গেল পানি জমে বরফ হয়ে গেছে। তারা বলল মাহুতদের হাতী নিয়ে বরফের উপর হেঁটে যেতে। কথামত জনৈক মাহুত তার একটি হাতী নিয়ে এল। হাতীটি বরফের উপর হেঁটে গেল স্বচ্ছন্দে যেন শক্ত পাথরের উপর দিয়ে হেঁটে যাচ্ছে। হাতীটি বেশ কিছুক্ষণ বরফের উপর দাঁড়িয়ে থাকল, তাতে বরফে একটুও ফাটল ধরল না। পূর্বের মত, চাদর দিয়ে পুকুরটি ঢেকে দেওয়া হল। চাদরটি সরিয়ে নেওয়ার পর দেখা গেল বরফের কোন চিহ্ন নেই, এমনকি ভেজার কোন দাগ নেই, সবকিছুই হাওয়ায় মিলিয়ে গেছে।

বার–তারা দুটি তাবু তৈরী করল বেশ দূরে দূরে। দুটি তাবুর দরজাই মুখোমুখি। তাবুর চারপাশে তারা দেয়াল তৈরী করল এবং তাবু দুটি যে একেবারে খালি তা পরীক্ষা করে দেখবার জন্য তারা বলল। তাবু খাটিয়ে সাত জন বাযীকরের মধ্যে দুজন দুই তাবুতে প্রবেশ করল। বাকী পাঁচ জন কোথাও গেল না। এভাবে প্রস্তুত হওয়ার পর তারা বলল তাবু থেকে তারা যে-কোন পশু কি পাখি, যা আমরা দেখতে চাই বের করে আনবে এবং লড়াইয়ে প্রবৃত্ত করাবে। খানজাহান অবিশ্বাসের হাসি হেসে বললেন, তিনি আমাদের সামনে উটপাখির লড়াই দেখতে চান। কয়েক মিনিটের মধ্যেই বিশালকৃতি দুটি উটপাখি দুই তাবু থেকে এল বেরিয়ে এবং এমন ভীষণ ভাবে লড়াই করা শুরু করে দিল যে তাদের মাথা থেকে রক্ত ফিনকি দিয়ে বেরুতে লাগল। উটপাখি দুটি শক্তিতে সমান, কেউ কাউকে হারাতে পারছে না, লোকজন এসে তাই তাদের ছাড়িয়ে দিয়ে তাবুর মধ্যে নিয়ে গেল। আমার পুত্র খুররম তারপর নীল গাই দেখতে চাইল। সঙ্গে সঙ্গেই তাবু দুটি থেকে বেরিয়ে এল পোষ না মানা দুই নীল গাই, বিশাল, মোটা ও ভীষণাকৃতি, আগের মতই গাই দুটি যুদ্ধ শুরু করে দিল, গলায় কামড়াকামড়ি করে, একবার সামনে একবার পিছনে তারা এগিয়ে এল, এভাবে যোঝাযুঝি চলল দিনের দু'ঘণ্টা ধরে, তারপর তাদের ছাড়িয়ে তাবুতে নিয়ে যাওয়া হল। মোটকথা, যে-পশুর নাম আমরা করি না কেন তাবু থেকে তারা সেই পশুই বের করে আনে, আমাদের চোখের সামনেই ওভাবে যুদ্ধে তাদের প্রবৃত্ত করে। সব কথা বর্ণনা করতে আমি প্রয়াস পেয়েছি, যদিও চেষ্টা করেছি ঐ খেলার গোপন রহস্য উদ্ধারে, কিন্তু এখন পর্যন্ত পুরোপুরি ব্যর্থ হয়েছি।

তের–বাজীকরদের একটি ধনুক ও পঞ্চাশটি ইস্পাতমুখী তীর দেওয়া হল। সাত জনের মধ্যে একজন ধনুকটি হাতে নিয়ে শূন্যে একটি তীর ছুড়ল, তীরটি শূন্যে আটকে থাকল, এভাবে বাকী তীরগুলি আটকে শূন্যে পরস্পরের সঙ্গে, শেষ তীরটি ছোড়ার সঙ্গে ঐ জোড় গেল, ভেঙ্গে, মাটিতে সব তীরই গেল পড়ে। এটার রহস্যও বোঝা মুস্কিল।

চৌদ্দ-বেশ বড় একটি পাত্রে তারা পানি ভর্তি করল। পানি টলটলে, স্বচ্ছ।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

পাত্রটি তারা মেঝের উপর আমার সামনে রাখল। একজনের হাতে একটি লাল গোলাপ, সে বলল, আমি যে বর্ণ দেখতে চাই গোলাপটি পানিতে ডুবিয়ে সেই বর্ণই সে দেখাবে। কথামত সে গোলাপটি পানিতে ডুবাল, গোলাপের বর্ণ হল উজ্জ্বল হলদে। এভাবে নানা বর্ণ ও রং সে দেখাল, কখনও লাল, কখনও বা কমলা রং। মোটকথা, একশোবার ডুবালে একশো বিভিন্ন রংয়ের ফুল সে দেখাতে পারত। তারপর তারা পাত্রটির ভেতর একগাছি সাদা সূতা ডুবিয়ে দিল, প্রথমে সূতাটি হল লাল, পরে হলদে, এভাবে দেখতে বললে তারা প্রতিবারে, নানা রং দেখাতে পারত।

পনের–তারা একটি পাখির খাঁচা বের করল। খাঁচাটির যে অংশ আমার দিকে, সেখানে দেখি এক জোড়া তোতা পাখি মিষ্ট স্বরে গান করছে। খাঁচাটা ঘোরাল, খাঁচার মধ্যে কোন পর্দা টানা নেই, এখন দেখা গেল এক জোড়া সুন্দর সবুজ টিয়ে পাখি। আবার খাঁচাটা ঘুরান হল, এবারে দেখা গেল লাল রঙের একটি পাখি ডাকাডাকি করছে। ফের ঘুরান হল, এবারে আমরা দেখলাম একজোড়া তিতির, নানা রঙে চিত্রবিচিত্র সবচেয়ে আশ্চর্যজনক পাখিটির গান। খাঁচাটির চারদিকে ঘুরানোর সঙ্গে সঙ্গে এভাবে বেরিয়ে আসল বিভিন্ন পাখি। একশোবার ঘুরালেও অমনই হবে। এই খেলাটিও যথেষ্ট কষ্টসাধ্য বলে আমার মনে হয়।

ষোল–বিশ হাত লম্বা একটি কার্পেট তারা বিছিয়ে দিল। কার্পেটটি নানাবর্ণে-নক্সা করা। উপর দিকটা তারা ঘুরিয়ে ধরল, ফলে নক্সা ও বর্ণ দু-ই গেল বদলে। ঐ ভাবে যতবার তারা ঘুরাল, ততবারই কার্পেটটি নতুন নক্সা ও বর্ণে উদ্ভাসিত হতে লাগল।

সতের–তারা বড় একটি কলসী নিয়ে এল। আমার সামনেই কলসীতে পানি ভরল। উল্টা করে ধরল কলসীর মুখ, সব পানি গেল পড়ে। কলসীর মুখ ঠিক করে ধরা মাত্র দেখা গেল পানি ভর্তি। বহুবারে ঐ একই ফল হবে। এই খেলাটিও অদ্ভুত বলে আমার কাছে মনে হয়।

আঠার– বেশ বড় একটি বস্তা বের করল তারা, বস্তার দুদিকই খোলা। একদিক থেকে তারা একটি লেবু দিল ঢুকিয়ে, অন্যদিক থেকে এল বেরিয়ে একটি শশা। তারপর শশা অন্যদিক থেকে একগুচ্ছ আঙ্গুর হয়ে এল বেরিয়ে। ফের এই আঙ্গুর অন্যদিক থেকে আপেল হয়ে বেরিয়ে এল, ভাল আব্বাসী জাতের। একশোবার অমন করলে বারবারই নতুন পরিবর্তন দেখা দেবে। আশ্চর্যজনক ছাড়া আর কিইবা বলা যেতে পারে।

উনিশ–সাত জন বাজীকরের একজন আমার সামনে সোজা হয়ে দাঁড়িয়ে মুখ হা করল, সেখান থেকে বেরিয়ে এল তক্ষনি এক সাপের মাথা। অন্য একজন সাপের ঘাড় ধরে টেনে বের করল, দেখা গেল সাপটি চার হাত লম্বা। মাটিতে সাপটিকে ছুঁড়ে ফেলা হল। আর একটি সাপ আগের মতই বেরিয়ে এল। এইভাবে বেরল আটটি সাপ, সব কয়টি চার কি পাঁচ হাত লম্বা। মাটিতে ছোড়ার পর দেখা গেল সব কয়টি সাপই পরস্পরকে জড়িয়ে ধরেছে, হিসহিস করে লড়াই করছে। এই দৃশ্য যেমন ভয়াবহ তেমনি অদ্ভুত।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

কুড়ি–তারা আয়না নিল এক হাতে, অন্য হাতে একটি গোলাপ অথবা অন্য কোন ফুল। ফুলটিকে তারা আয়নার পেছনে ধরে রাখল পলকের জন্য, ফের যখন সামনে নিয়ে এল, দেখা গেল ফুলের রং গেছে বদল হয়ে। এইভাবে ফুলটির রং বদল হতে লাগল, সবুজ, লাল, কমলা, বেগুনী, কাল, সাদা। সত্যিই বিস্ময়কর।

একুশ–বাযীকররা আমার সামনে দশটা পোর্সেলিনের খালি বৈয়ম রাখল সাজিয়ে। উপস্থিত সবাই পরখ করে দেখল বৈয়মগুলি সত্যি সত্যি খালি আছে কিনা। আধ ঘণ্টা পরে তারা বৈয়মগুলির ঢাকনা খুলল এবং কি আশ্চর্য, একটি বয়ম দেখা গেল গমে ভর্তি, অন্যটিতে নানাবিধ ফল, আরেকটিতে চিনির মিষ্টি, আরেকটিতে বিভিন্ন ধরনের আচার, একটিতে বিশেষ একপ্রকার পিঠে, কোনটিতে বা জামীর ফল এবং কোনটিতে বা তেঁতুল, এমনি প্রত্যেকটা বৈয়মেই কিছু না কিছু খাবার জিনিস আছে। বৈয়মগুলি আমার সামনে পেশ করা হল। উপস্থিতিদের অধিকাংশই চেখেও দেখল। খানিকক্ষণ বাদে বাজীকররা শেষবারের মত ঢাকনা খুলল, দেখা গেল বৈয়মগুলি একেবারে খালি এবং এমন পরিষ্কার যে মনে হচ্ছে হাযারবার স্বচ্ছ ঝর্ণার পানিতে বৈয়মগুলি ধোয়া হয়েছে। এই খেলাটাও অদ্ভুত ও আশ্চর্যজনক।

বাইশ-তারা সাদীর গ্রন্থাবলী এনে আমার সামনে ছোট একটি থলের ভিতর ভরে দিল। থলেটি আগেই দেখেশুনে নেওয়া হয়েছে। বইটি তারা বের করে আনল, দেখা গেল দেওয়ান-ই-হাফিজের বইটি রূপান্তরিত হয়ে গেছে। ফের দেওয়ান-ই-হাফিজ থলের মধ্যে রাখা হল, বের করে আনার পর দেখা গেল দিওয়ানই-ই-সোলায়মান। প্রতিবারেই নতুন নতুন বই বেরিয়ে এল, যা পূর্বের বইটি থেকে ভিন্নতর।

AMARBOI.COM

তেইশ-পঞ্চাশ হাত লম্বা একটি শিকল এনে আমার সামনে তারা শূন্যে ছুড়ে দিল। সেই শূন্যে শিকলটি কিসে যেন আটকে ঝুলতে লাগল। একটি কুকুর এনে শিকলের প্রান্তে রাখা হল। কুকুরটি তরতর করে শিকল বেয়ে উপরে উঠে বুঝি হাওয়ায় গেল মিলিয়ে। ঐভাবে একটি শূকর, চিতা, সিংহ এবং বাঘ একের পর এক শিকল বেয়ে উপরে উঠে বুঝি হাওয়া হয়ে গেল। পরে তারা শিকল নামাল, থলের মধ্যে পুরল, কেউ বুঝে উঠতে পারল না কি করে ঐসব পশুগুলিকে অদৃশ্য করে দেওয়া হয়েছে। এই খেলাটি নিঃসন্দেহে আমি বলব অদ্ভুত ও বিস্ময়কর।

চব্বিশ–বাযীকররা আমার সামনে রেখে দিল বেশ বড় একটি ঝুড়ি, ঢাকনা দেওয়া। অবশ্য আগেই আমাকে দেখিয়ে নেওয়া হয়েছে ঝুড়িটি একেবারে খালি। আমাকে বলে তারা ঢাকনা তুলে নিল, দেখা গেল ঝুড়িটি ভাল ভাল মিষ্টিতে ভর্তি, খেতে সুস্বাদু। তারা ঢাকনা দিয়ে ঢেকে দিল। কয়েক মিনিট বাদে ঢাকনা তোলার পর দেখা গেল ঝুড়িটি বাদাম, কিসমিস, শুকনা ফল এবং সুগন্ধি মশলায় ভর্তি[৫২]।

---

৫২. তিনবারের বার যখন ঢাকনা খোলা হল, সে অংশটি দুর্বোধ্য হাতে লেখা। সেজন্য অনুবাদ করা হল না। ইং অনুবাদক।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

মোটকথা, যতবারই ঢাকনা খোলা হোক, ততবারই নতুন মিষ্টির দেখা মিলবে, আমাদের অবাক ও আনন্দিত করে।

পঁচিশ–বাযীকররা আমার সামনে বড় একটি জ্বালা এনে রাখল। জ্বালাটি ঢাকনা দেওয়া এবং পানি ভরা। ঢাকনা তুলে তারা দেখাল জ্বালাটিতে পানি ছাড়া কিছু নেই। ঢাকনা ফের তোলায় দেখা গেল জ্বালাটিতে দশ কি বারটি সবুজ পাতা ভাসছে। জ্বালাটি ফের ঢাকনায় ঢেকে দেওয়া হল। এবার তোলার পর দেখা গেল তিনটি কি চারটি বড় বড় সাপ জড়াজড়ি করছে জ্বালাটিতে। ফের ঢেকে দেওয়া হল। ঢাকনা তোলার পর জ্বালাটিতে পাঁচটি কি ছয়টি পানিকৌড়ী দেখা গেল। শেষবারের মত ঢাকনা তোলায় দেখা গেল জ্বালাটিতে পানি কিংবা কিছু নেই, একেবারে খালি।

ছাব্বিশ–বাযীকরদের একজন আমার সামনে এসে দেখাল তার কড়ে আঙ্গুলে একটি রুবীর আংটি আছে। আংটিটি সে অন্য আঙ্গুলে পরল, পাথরটি এবার পান্নায় রূপান্তরিত হল। ফের অন্য আঙ্গুলে পরার পর পান্না রূপান্তরিত হল হীরায়। আবার অন্য আঙ্গুলে পরার পর হীরা হয়ে গেল নীলকান্তমণি। এমনি করে প্রতিবারেই পাথরটি ভিন্ন রং ও রূপে বদলে যেতে লাগল।

সাতাশ–দুধারী তরবারি এনে বাঁটটি মাটিতে পুতে দেওয়া হল। বাযীকরদের একজন তার মুখ দিয়ে তরবারিটি ঘসল, কিন্তু একটি আঁচড়ও তার মুখে পড়ল না দেখে সবাই খুব আশ্চর্য হয়ে গেল[৫৩]।

আটাশ–তারা আমার হাতে শূন্য সাদা একটি বই দিয়ে দেখাল এর ভেতরে কোন ছবি কিংবা রঙিন পৃষ্ঠা নেই। আমি নিজে দেখলাম, তাদের কথাই ঠিক। অন্যদেরকেও দেখালাম। জনৈক বাযীকর বইটি হাতে নিয়ে পাতা উল্টাল। প্রথম যে পাতাটি উল্টান হল সেটা দেখা গেল উজ্জ্বল লাল, সোনালী আভা ছিটান, তাতে আঁকা গোলাকার ফাঁকা একটি ফলক। পরের পাতাটি আকাশনীল, স্বর্ণরেণু ছিটান, কোনায় নর-নারীর বিভিন্ন ভঙ্গিমার ছবি। বাযীকরটি আর একটি পাতা গুটাল, সে পাতাটি চৈনিক বর্ণের, একইভাবে সোনালী আভা ছিটান, তাতে আঁকা এক ঝাঁক গরু ও সিংহ, সিংহটি গরুর পালে ভয়ানক ভাবে আক্রমণোদ্যত, এমন ছবি আমি আগে দেখিনি। পরের পাতাটি ঘন সবুজ, সোনা ছিটান, তাতে চড়া রংয়ে আঁকা এক বাগানের ছবি, বাগানটিতে অনেক সাইপ্রেস ও গোলাপকুঞ্জ, নানা ফুল ফুটে আছে, আর বাগানের মধ্যে সুন্দর একটি প্যাভিলিয়ন। পরের পাতাটি কমলা রঙের, সোনা ছিটান, তাতে ভীষণ এক যুদ্ধের ছবি আঁকা, দুই রাজা মারাত্মক যুদ্ধে লিপ্ত। মোটকথা, প্রতিটি পাতাই ভিন্ন রঙের, তাতে আঁকা ভিন্ন ছবি এবং সেসব দেখতে অত্যন্ত মনোহর। বাযীকরদের সব খেলার মধ্যে, এই শেষ খেলাটিইও আমাকে সবার চেয়ে বেশী আনন্দ দিয়েছে, অনেক সুন্দর ছবি একসঙ্গে আমি দেখতে পেলাম, ফলে আমি বিচার করে উঠতে পারিনি। শুধু

৫৩. ফার্সী কপিতে এই অংশটি এমন দুর্বোধ্যভাবে লেখা যে অর্থ উদ্ধার কষ্টসাধ্য। ইং অনুবাদক।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

এটুকুই আমি বলব, পিতার দরবারে যদিও আমি অমন খেলা আগেও দেখেছি, তবু এই খেলাটির মত কিছু দেখিনি, খেলাটি সত্যিই অদ্ভুত, বাযীকরদের সহজ নৈপুণ্যে মুগ্ধ হয়ে যেতে হয়। তাদেরকে পঞ্চাশ হাযার টাকা ইনাম দিয়ে বিদায় করে দিলাম। সেইসঙ্গে দরবারের আমীরদের কাছে বলে পাঠালাম, একহাযারী থেকে উচ্চতম পদাধিকারী সবাই যেন বাযীকরদের কিছু কিছু করে দিয়ে দেয়।

যতই কেন আমরা বলি না এই সব বাযীকরদের খেলা ছল চাতুরী বৈ কিছু নয়, তবু তাদের মধ্যে মানবীয় শক্তির বহির্ভূত কিছু নিশ্চয়ই আছে। এইসব খেলায় অননুকরণীয় দক্ষতা পরিস্ফুট। যদি অত স্বচ্ছন্দ সহজই হত ব্যাপারটা তাহলে অন্য সবার ঐ খেলা দেখাতে বাধা কোথায়? আমি বলতে শুনেছি এই কৌশলকে সেমনানিয়ান[৫৪] বলা হয়ে থাকে। আমাকে জানান হয়েছে ইউরোপের নানা দেশেও এ্ খেলার চল ও চর্চা আছে। একথা অবশ্য বলা যায়, কিছু কিছু লোকের মধ্যে এমন ক্ষমতা থাকে, যার দরুন সাধারণ মানুষের আয়ত্তাতীত কাজ তারা স্বচ্ছন্দে সমাধা করে। ফলে হতচকিত হয়ে যাওয়া ছাড়া উপায় থাকে না[৫৫]।

এখানে একটি ঘটনার আমি উল্লেখ করব। আরব দেশের জনৈক বাশিন্দা, চল্লিশ তার পেরিয়ে গেছে, রাজধানীতে তাকে নিয়ে আসা হয়েছিল আমার সমীপে তাকে হাযির করবার জন্য। দেখলাম তার কাঁধ থেকে একটি হাত কাটা। তাকে আমি জিজ্ঞাসা করলাম জন্মসূত্রে না যুদ্ধের ফলে তার অমন হাত কাটা গেছে। প্রশ্নটি শুনে সে বেশ বিব্রত হল। তবে বলল যে দুর্ঘটনার ফলে তার হাত কাটা গেছে সেটি অদ্ভুত, অবিশ্বাস্য ধরনের, বললে তাকে হয়ত হাস্যাস্পদ হতে হবে। সে প্রতিজ্ঞা করেছে ঘটনাটির বর্ণনা সে কখনও করবে না। আমি তাকে অনুরোধ করলাম, বললাম আমার আশ্রয়ে থেকে গোপন করার কোন কারণ নেই। সে রাযী হল শেষে এবং বলল :

আমার যখন পনের বছর বয়স, পিতার সঙ্গে হিন্দুস্তান সফরে আমাকে একবার আসতে হয়েছিল। সমুদ্রে আমরা পথ ভুলে ঘুরে বেড়িয়েছি, এভাবে প্রায় ষাট দিন কেটে যাওয়ার পর প্রবল ঝড়ের মুখে গিয়ে আমরা পড়লাম। সে ঝড় চিরকালের মত আমার মনে গেঁথে রয়েছে। তিন দিন তিন রাত সে ঝড়ের মাতন থাকল, সমুদ্রের ঢেউ ফুলে ফুলে উঠতে লাগল, বৃষ্টি ঝরতে লাগল প্রবল ধারায়, বজ্রের আওয়াজ ও বিদ্যুৎ ঝলকানির বিরাম নেই, ভয়ের যেন চূড়ান্ত পর্যায়। সেই আতঙ্কের যেন সম্পূর্ণতা করবার জন্যই মাস্তুলটি গেল ভেঙ্গে, ডেকের উপর পড়ায় বেশ কয়েকজন খালাসি মারা গেল। মাস্তুলটি ছিল এত মোটা যে দুজন মানুষ হাত বেড় দিয়েও ধরতে পারত না। জাহাজটি তাই ডুবার মুখে, কিন্তু ঝড় তিন দিনের দিন কমে এল, আমরা মৃত্যুর কবল থেকে বেঁচে গেলাম, কিন্তু গন্তব্যের দিক থেকে আমরা বহুদূরে এখন সরে এসেছি।

---

৫৪. খুব সম্ভবত আসমানিয়া বা গায়েবী।

৫৫. অনুচ্ছেদটির শেষ অংশটুকু ফার্সী পাণ্ডুলিপির নকল নবীশের অসাবধানতায় বোধের অগম্য। ইং অনুবাদক।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

বেশ কয়েক দিন জাহাজ অজানার দিকে পানি কেটে চলল। হঠাৎ সমুদ্রের মধ্যে বিরাট এক পর্বত আমরা দেখতে পেলাম। কাছে এসে বোঝা গেল এটি একটা দ্বীপ, দালান-কোঠা, গাছপালা, নদীতে ভরা। জাহাজে আমাদের খাবার পানি প্রায় গিয়েছিল ফুরিয়ে, সেজন্য ডাঙ্গার কাছে জাহাজ নিয়ে এলাম। কয়েক জন জেলে নৌকা নিয়ে বেরিয়েছিল, তাদের কাছ থেকে জানতে পারলাম দ্বীপটি পর্তুগীজদের অধিকারে, দ্বীপটি বসতিবহুল এবং মুসলমান নেই। তাছাড়া বিদেশীদের সঙ্গে দ্বীপবাসীদের কোনই যোগাযোগ নেই।

সংক্ষেপে বলছি। যেইমাত্র জাহাজ নোঙ্গর ফেলল, একজন পর্তুগীজ ক্যাপ্টেন অফিসার জাহাজে এল উঠে এবং সঙ্গে সঙ্গেই জাহাজের সবাইকে, যাত্রী ও নাবিকশুদ্ধ, নৌকায় তুলে নিল, জাহাজ দেখার কেউ রইল না, তারা জানাল ভয় পাওয়ার কোন কারণ নেই, বিশেষ একটা প্রয়োজনে একজন লোক তারা খুঁজছে, তাকেই তারা আটক করবে, কেন সে কৈফিয়ৎ তারা দিল না অবশ্য বাকী সবাইকে কোন কিছু না করেই তারা ছেড়ে দেবে। বন্দর তাদের, আমরা তাদের দয়ার প্রত্যাশী, সেজন্য তারা যা বলবে আমরা মানতে তা বাধ্য। তাই জাহাজের বার শত লোক, বণিক, দাস, জাহাজী, সবাইকে এনে জড়ো করা হল এক বাড়ীতে।

সেখান থেকে তারা এক একজন করে আমাদের ডেকে পাঠাতে লাগল, একেবারে উলঙ্গ করে তাদের হেকিম আমাদের শরীরের প্রতি অঙ্গের পুঙ্খানুপুঙ্খ পরীক্ষা করে ছেড়ে দিতে লাগল। আমার না আসা পর্যন্ত তারা অমন করল। আমার সঙ্গে আমার ভাইও ছিল, কিন্তু আমাদের পরীক্ষা করে হেকিম পরিচারকদের হাতে আমাদের সমর্পণ করে দিল। তখন কি ভয় ও হতাশা আমাদের। পরিচারকদের হুকুম দেওয়া হল আমাদের পর্দার অন্তরালে রাখার জন্য, যাতে মানুষের সঙ্গে আমরা কোন যোগাযোগে সক্ষম না হই। আমি আর আমার ভাই বাদে, জাহাজের আর সবাইকে ছেড়ে দেওয়া হল। তাদের শরীরে ঐ দাগ তারা খুঁজে পায়নি। আমার পিতা কেঁদে কেটেও তাদেরকে সঙ্কল্প থেকে টলাতে পারলেন না। তিনি বারবার জানতে চাইলেন তাঁর ছেলেরা কি দোষ করেছে, যার জন্য জাহাজের বার শত লোকের মধ্যে তাদের শুধু আটকে রাখা হয়েছে। জবাবে তারা ভ্রু কুঞ্চিত করল মাত্র, পিতার মিনতিতে কান না দিয়ে।

তারা আমাদের দুই ভাইকে এক বাড়ীতে নিয়ে মুখোমুখি দুই কামরায় থাকার ব্যবস্থা করে দিল। রোয ভোরে তারা আমাদের খাবারের জন্য মুরগীর কাবাব, মধু, সাদা রুটি নিয়ে আসত। এভাবে দশ দিন কেটে গেল। দশ দিনের পর নওখোদা (জাহাজের অধিনায়ক) অনুমতি চাইলেন নোঙ্গর তোলার। পিতা মিনতি জানালেন সফর স্থগিত রাখার জন্য, দু'তিন দিন যাই হোক না, যদি পর্তুগীজরা তাঁর ছেলেদের ছেড়ে দেয় সেই আশায়। তিনি বন্দরের শাসকের কাছে হাযির হয়ে বিনীত অনুরোধ জানালেন আমাদের মুক্তি চেয়ে; কিন্তু কিছুই হল না।

সেই হাকিম যার রিপোর্টে আমাদের বন্দী করা হয়েছে, সে দশ জন

AMARBOI.COM

পর্তুগীজসহ ভাই যে-কক্ষে সেখানে এল। ফের তাকে উলঙ্গ করে টেবিলের উপর তাকে শুইয়ে আগের মতই পরীক্ষা করা হল। তাকে ছেড়ে দিয়ে তারা এল আমার কাছে, আগের মতই আমাকে টেবিলে শুইয়ে তারা আমার শরীর দেখল খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে। ফের তারা আমার ভাইয়ের কাছে এল। দরজা মুখোমুখি হওয়াতে সবকিছুই আমি স্পষ্ট দেখতে পেলাম। তারা বড় একটা পাত্র ও ছুরি চেয়ে পাঠাল। ভাইয়ের কান্না ও মিনতিতে না গলে তারা পাত্রের উপর মাথা রেখে তাকে শুইয়ে গলায় কোপ দিয়ে তার মাথা দেহচ্যুত করে ফেলল। রক্ত ও মাথা দুইই তারা রেখে দিল পাত্রটিতে। রক্তপাত বন্ধ হয়ে গেল তারা পাত্র ভর্তি রক্ত নিয়ে গিয়ে ফুটন্ত তেলের পাত্রে ঢেলে দিল। হাতা দিয়ে রক্ত ও তেল তারা নাড়াচাড়া করতে লাগল যতক্ষণ পর্যন্ত সে সেগুলি মিশে গেল পুরোপুরি। কেউ কি বিশ্বাস করবে, এরপর তারা মাথাটি নিয়ে শরীরের সঙ্গে জোড়া লাগাল, রক্ত-তেল তারা মালিশ করতে লাগল, সেগুলি ফুরান না পর্যন্ত। এই অবস্থায় ভাইকে ফেলে তারা দরজা বন্ধ করে চলে গেল।

এই ঘটনার তিন দিন পরে তারা আমাকে বন্দীগৃহ থেকে ডেকে পাঠাল। তারা বলল, ভাইকে দিয়ে তারা তাদের উদ্দেশ্য হাসিল করে নিয়েছে। তারা ভূগর্ভের একটি পথের দিকে আমাকে আঙ্গুল দিয়ে দেখাল এবং বলল ওখানে আছে অনিঃশেষিত ধনরত্নের ভাণ্ডার। সেখানে আমাকে যেতে হবে বলে তারা আমাকে জানাল। আমার শক্তিতে যা কুলায় সে-পরিমাণ ধনরত্ন আমি সেখান থেকে নিয়ে আসত পারব। প্রথম প্রথম আমি তাদের কথা বিশ্বাসই করলাম না। ভাবলাম কোন দুরূহ কাজে আমাকে তারা পাঠাবে বলে ঠিক করে রেখেছে; কিন্তু তারা জোর করায় মেনে নেওয়া ছাড়া গত্যন্তর থাকল না।

AMARBOI.COM

আমি দরজা খুলে ভেতরে ঢুকলাম এবং প্রায় পঞ্চাশ ধাপ সিঁড়ি বেয়ে নামবার পর চারটি কক্ষের খোঁজ পেলাম। প্রথম ঘরটিতে ঢুকে, কি আশ্চর্য আমার ভাইকে সুস্থ শরীরে দেখলাম। তার পরনে ফিরিঙ্গীদের পোশাক, মাথাই সেই জাতীয় টুপি, মুক্তা ও দামী পাথর বসান, রত্নখচিত তরবারি পাশে ঝুলছে, বগলে কারুকার্য করা যষ্টি। যেইমাত্র আমাকে দেখল তক্ষণি সে মুখ নিল ফিরিয়ে, যেন ঘৃণায়, তবু আমার বিস্ময় কমে গেল না। অমন ব্যবহারে আমি বরং ভীত হয়ে উঠলাম, যদিও সে আমার আপন ভাই, তবু মেরুদণ্ডের তলে আমার শিরশির করে উঠল। দুনম্বর ঘরে সাহস করে আমি দেখলাম, সেখানে হীরা, রুবী, মুক্তা, চুনী, অন্যান্য দামী পাথর ঠাসা। তিন নম্বর ঘরে সোনার স্তূপ। চার নম্বর ঘরে তাল তাল রূপা।

কি ছেড়ে কি নিই ভেবে আমি মুশকিলে পড়ে গেলাম। পরে আমি ভেবে দেখলাম সোনার স্তূপের চেয়ে একটি হীরার মূল্য বেশী, তাই আমি জামা ভর্তি করে রত্ন ভরে নেব বলে ঠিক করলাম। ঐ চকচকে পাথর নেওয়ার জন্য হাত বাড়াতেই, অদৃশ্য থেকে কে যেন সজোরে আমার হাতে বাড়ি মারল, সে বাড়ি খেয়ে আমার মাথা গেল ঘুরে। ঐ আঘাত এত সাংঘাতিক ছিল যে আমি আর ওখানে দাঁড়াতেই সাহস করলাম না। ফেরবার পথে যে ঘরে আমার ভাইকে

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

দেখেছিলাম সেখান দিয়ে যেতে হয়। যেইমাত্র আমাকে সে চলে যেতে দেখল, তরবারি খুলে ভীষণ এক কোপ মারল। হঠাৎ সরে গিয়ে ঐ কোপ এড়িয়ে যাওয়ার চেষ্টা করলাম, কিন্তু পারলাম না। কোপ গিয়ে লাগল আমার ডান হাতের কাঁধে, ফলে হাতটি আমার গেল খসে। আহত ও রক্তাক্ত অবস্থায় আমি ধনরত্নের কোষাগার ছেড়ে ভয়ে আতঙ্কে দৌড়ে পালালাম, দরজার মুখে এসে সেই হেকিম ও তার সঙ্গীদের দেখতে পেলাম, যারা কি রহস্যজনক ভাবে আমার ভাইয়ের ভাগ্য নিরূপিত করে দিয়েছে। তাদের কেউ নীচে গিয়ে আমার কর্তিত হাত নিয়ে এল। দরজা পাথর দিয়ে বন্ধ করে তারা আমাকে পর্তুগীজ গবর্নরের সামনে নিয়ে এল, তখনও আমার হাত থেকে রক্ত ঝরছে, ছেলেমেয়ে নরনারী সবাই ঐ আশ্চর্য দৃশ্য দেখবার জন্য দলবেধে এল ছুটে।

কাঁধ থেকে রক্ত আমার ঝরছে। গবর্নরের কাছ থেকে ক্ষতিপূরণ বাবদ তিন হাযার তোমান রত্নভূষিত অশ্বসজ্জা সহ একটি অশ্ব, বেশ কয়েকটি পুরুষ ও মহিলা দাসদাসী ভবিষ্যতে আরও ইনাম পাওয়ার প্রতিশ্রুতিতে পর্তুগীজ চিকিৎসককে আমার জন্য ডেকে পাঠান হল। এ চিকিৎসক ঘায়ে রক্ত-নিবারক মলম দিল লাগিয়ে, ঘা গেল তাড়াতাড়ি শুকিয়ে এবং এত ভাল ভাবে, মনে হতে পারে জন্ম থেকে আমি বাহুহীন। আমাকে তারপর বিদায় দেওয়া হল। কিছুদিন বাদে অন্য জাহাজে উঠে, যাত্রা করার এক মাস বাদে, আমার গন্তব্য বন্দরে এসে আমি পৌঁছেছিলাম।

ঐ সম্পর্কে এটুকু আমি বলতে চাই, খুব সম্ভব ঐ অত্যাশ্চর্য ঘটনা ভাল হয়েছে কিমিয়ার রসায়ন-শাস্ত্রের প্রয়োগে। কিমিয়ার প্রয়োগের বহুল চল ফ্রাঙ্কদের মধ্যে আছে। ঐ কিমিয়াতে বাংলাদেশের বাযীকরদের বেশ দক্ষতা আছে।

আর একটি অদ্ভুত ঘটনার বর্ণনা আমার আখ্যানে করতে চাই। সেটি হচ্ছে মাণ্ডুর বিশাল দুর্গ প্রসঙ্গে। ঐ দুর্গটি হিন্দুস্তানে নামকরা। দুর্গটির নির্মাণের পিছনে নিম্নলিখিত ঘটনা আছে বলে আমাদের বলা হয়েছে।

হিন্দুস্তানের এক শহরে গরীব একজন লোক বাস করত। পাশের পাহাড়ের বনে সে রোয কাঠ কাটতে যেত। রাত্রে সে কাঠ শহরে এনে বিক্রী করে কষ্টে সে ঘরসংসার চালাত। মাঝে মাঝে, দরকার হলে সে কামারের কাছে গিয়ে তার কুড়ুলের ধার করিয়ে আনাত। একবার তার কুড়ুলের ঘা জ্বালানি কাঠ থেকে সরে গিয়ে পড়ল এক পাথরের উপর। ঐ পাথরটির লোহাকে সোনায় রূপান্তর করার গুণ ছিল। ফলে তার কুড়ুলটির ফাল সোনায় রূপান্তরিত হল। না জেনে বোকামি করে সে ফের নিয়ে গেল তার কুড়ুল কামারের কাছে। বলল, 'তুমি, খুব কাজ করেছ। আমার কুড়ুলের ধার ত ভোঁতা হয়েছেই, তাছাড়া যে কুড়ুল দিয়ে আমি খেয়ে পরে বাঁচি সেই কুড়ুলই গেছে তোমায় বদলে।' কামার তার খদ্দেরের চেয়ে বেশী খোঁজখবর রাখে। তাই সে বলল যে তার কুড়ুল সারাবার উপায় নেই। সে যদি চায় তবে তার যে ক্ষতি হয়েছে তার পূরণ করে দিতে কামার রাযী, নতুন একটি কড়ুলই দেবে। কিন্তু যে পাথরে লেগে তোমার কুড়ুল তামা হয়ে গেছে সে পাথরটি দেখাতে হবে।' সেই বোকা

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

লোক কোন দ্বিধা না করে কামারকে ঠিক জায়গায় গেল নিয়ে এবং পাথরটি দেখিয়ে দিল। চতুর কামার মনের আনন্দে পাথরটি তক্ষণি বাড়িতে নিয়ে এল। স্ত্রী, পুত্র বা অন্য কারও কাছে এই গোপন সম্পদের কথা না জানিয়ে পাথরটি তার সিন্দুকে তুলে সাবধানে তালাচাবি বন্ধ করে রাখল। সে অবশ্য ঐ গরীব কাঠুরেকে কথামত নতুন একটি কুড়ুল দিয়ে বিদায় করে দিল।

সেই সৌভাগ্যবান কামার এখন আস্তে আস্তে তার কাছে যত লোহা ছিল সবকে সোনায় পরিণত করা শুরু করল। বেশ কিছুদিন বাদে সে নিজের জন্য তৈরী করল বিরাট এক প্রাসাদ। বহু সৈনিককে সে তার চাকুরিতে নিযুক্ত করল, সবাই বর্মপরা, সবাই যুদ্ধনিপুণ, এবং তাদের প্রায় সবারই বাৎসরিক ভাতা দুই থেকে তিনশো তোমান ঠিক করে দিয়েছিল। মোটকথা, যারা তার চাকরি গ্রহণ করেছিল তাদের প্রতি তার দানদাক্ষিণ্যের কথা সর্বত্র ছড়িয়ে পড়েছিল, তাই প্রতিভাবান ও সাহসী লোক সবাই ছুটে আসছে তার কাছে, সবাই নিশ্চিত দয়াবান অভ্যর্থনা পাবে বলে।

এর দ্বারা তার ধনভাণ্ডারের সম্বন্ধে প্রায় কিছুই ধারণা করা যায় না, কারণ ঐ ভাণ্ডারের উৎস যে অপরিমাণ। সে অবশ্য চিন্তিত হয়ে পড়ল তার নিজের ও ভাণ্ডারের নিরাপত্তা সম্পর্কে, যদি কখনও কোন শক্তিমান তাকে আক্রমণ করে বসে তাই ভেবে। তাই সে চারটি পাশাপাশি বড় পাহাড় বেছে নিল, ঐ পাহাড়ের চূড়াগুলি আকাশে উঠে গেছে, মাঝখানে বিশাল এক সমতল ভূমি। এই জায়গা সে সমরবিদ্যা ও আত্মরক্ষা বিজ্ঞানের দিক থেকে প্রাচীর বেষ্টিত করবার সঙ্কল্প গ্রহণ করল।

মোটকথা, দেরি না করে সে কাজ শুরু করে দিল। কুড়ি হাযার রাজমিস্ত্রী ও মজুর তার পরিচালনাধীনে একদিক থেকে কাজ আরম্ভ করল, অন্যদিক থেকে ঐ একই সংখ্যক রাজমিস্ত্রী ও মজুর নিয়ে তার পুত্র কাজ আরম্ভ করল। ত্রিশ বছর বাদে[৫৬] পিতাপুত্রের এক জায়গায় এসে সাক্ষাৎ ঘটল এবং ঐ বিরাট দুর্গের দুইকোণা এইভাবে এসে যুক্ত হল। প্রাকার তোলা সমাপ্ত হল, তার পরিধি চৌদ্দ ফারসাং, অর্থাৎ কিনা বিয়াল্লিশ মাইল[৫৭]। এই দুর্গ তৈরী করতে যে ব্যয় হয়েছে তা হিসাবের বাইরে।

বাইরের সঙ্গে যোগাযোগ রাখার জন্য দুর্গের দশটি বড় তোরণ এবং চারটি সৈন্য নির্গম দ্বার চারদিকে ছিল। সেই বিশালায়নতন তোরণ থেকে পাথর কেটে পর্বতের উপর থেকে নীচু পর্যন্ত সিঁড়ি বানান হয়েছে। সেই সিঁড়ির ধাপ সবশুদ্ধ পঞ্চাশ হাযার। তার মানে প্রতিটি প্রধান তোরণদ্বারের সিঁড়ির ধাপ পাঁচ হাযার। দুর্গমধ্যে সে নির্মাণ করল বিশাল এক মসজিদ। সেই মসজিদে এক হাযার কক্ষ,

---

৫৬. তিন হওয়া উচিত, কারণ ত্রিশ বছর কামারের জীবনের সঙ্গে বেমানান হয়ে যায়।

৫৭. মাণ্ডুর প্রাচীর বিরাট পরিধি নিয়ে। তবে চৌদ্দ ক্রোশ সত্যের কাছাকাছি চৌদ্দ ফারসং-এর চেয়ে; বিয়াল্লিশ মাইলের বদলে একুশ মাইল হওয়া উচিৎ।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

প্রতি কক্ষে একটি করে মিম্বর খুৎবা পড়া ও শুক্রবারের ধর্মীয় রীতিকরণ পালনের জন্য। এত অল্প সময়ের মধ্যে এত লোক এসে ঐ দুর্গমধ্যে জড়ো হয়েছিল যে, জুম্মা কি ঈদের সময় এক হাযার একটি ঘর লোকে বোঝাই হয়ে যেত। মসজিদের সমান্তরালে কিংবা তার সংলগ্ন একটি বিরাট সরাইখানাও সে তৈরী করিয়েছিল। আর তৈরী করিয়েছিল একটি গম্বুজ, তার পারিবারিক গোরস্তান বলে। বর্ণিত আছে, এই গম্বুজের নীচে চারটি উষ্ণ প্রস্রবণের ব্যবস্থা করা হয়েছিল, সেই প্রস্রবণ কণা আস্তে আস্তে যাতে ঝরে পড়ে তারও ব্যবস্থা ছিল, সেই কণা জমে জমে শক্ত হয়ে যেত, সেই জমাট পাথর দিয়ে তার সন্তান-সন্ততিদের কবরের উপরে স্মৃতিস্তম্ভ করা হত। ঐ পাথর মার্বেলের চেয়ে স্বচ্ছ ও বহুগুণ ভাল।

কাহিনী সংক্ষেপ করে আনা যাক। বিরাট উপাসনালয় এবং সংলগ্ন ভবনাদি নির্মাণ করা হয়েছে। এক মাসের পথ পরিমিত ভূভাগ সৌভাগ্যবান সেই কামারের ক্ষমতাধীনে এসে গেছে। তখন বুরহানপুরের রাজার কাছ থেকে জনৈক দূত এসে হাযির হল মাণ্ডুতে, বুরহানপুরের রাজপুত্রের সঙ্গে তার কন্যার বিয়ের প্রস্তাব নিয়ে। প্রস্তাবে সম্মতি দিয়ে, কিছু সময় চেয়ে সে কণের জন্য উপযোগী জিনিসপত্র তৈরী করতে দিল। তারপর মেয়েকে বুরহানপুরে নিয়ে যাওয়ার জন্য দূতের কাছে দিয়ে দিল। কন্যার যাওয়ার সময়, সেই রাজকীয় কর্মকার তার পাল্কীতে সোনার থলেতে পুরে দিয়েছিল দুর্লভ সেই স্বর্ণসৃষ্টিকারী পাথর। রাজাকে এই কথা কয়টি বলবার জন্য মেয়েকে সে বলল, ঐ পাথরটি বাজে মনে হতে পারে; কিন্তু পাথরটির একটি কণা পেলে হাযার তোমান সোনা সে গ্রহণ করত না। তবু, মেয়েকে সে গভীরভাবে ভালবাসে বলেই দুর্লভ এই রত্ন সে মেয়েকে দিয়েছে। মেয়েকে সে একই সঙ্গে পাথরটির আশ্চর্য গুণের কথাও বুঝিয়ে বলল। সে ভেবেছিল পাথরটির দুর্লভ গুণের কথা শুনেই বুরহানপুরের রাজা বুঝে উঠতে পারবেন কি রহস্যময় গোপন গুণ এই পাথরটিতে লুকিয়ে আছে।

দূতের নেতৃত্বে, যে বুরহানপুর রাজদরবারের হেজাব ও মাণ্ডুর রাজকন্যা, উপযুক্ত সহচরী ও লোকলশকর পরিবৃত হয়ে বুরহানপুরের অভিমুখে চলল। বুরহানপুর তাপ্তী নদীর উপর। একটি নদীর কাছে এসে (নিঃসন্দেহে সে-নদী নর্মদা) এবং এ শহর থেকে চার দিনের পথে, রাজকন্যার সঙ্গে দেখা হল বুরহানপুরের রাজার। রাজার সঙ্গে অসংখ্য পারিষদ। নদীর ধারে রাজকীয় বিশাল তাঁবু গাড়া হল রাজকন্যাকে অভ্যর্থনা করবার জন্য। রাজকন্যা ও তাঁর সঙ্গের লোকজনকে প্রথামত খেলাৎ ও ঘোড়া এবং অন্যান্য জিনিসপত্র প্রচুর ভাবে উপঢৌকন দিলেন তিনি; কিন্তু রাজকন্যার সঙ্গে আনা জিনিসপত্র দেখে তিনি একটু মনঃক্ষুণ্ন হলেন, এমন কিছুই নেই যা রাজকীয় কনের মর্যাদানুযায়ী। তিনি মন্তব্য না করে পারলেন না যে, রাজকন্যার সঙ্গে তার পিতা বিয়ের যৌতুক দেয়নি, ভবিষ্যতে সেই ত্রুটি নিশ্চয়ই তার পিতা শুধরে নেবে।

শাহীকর্মকারের মেয়ে ভাবল এখন সেই সময় এসেছে বুরহানপুরের রাজাকে

পিতার কথিত বক্তব্য নিবেদন করার। পিতা তার বিদায়ের কালে তাকে সোনার থলেতে একটি রত্ন দিয়েছে, তার এক কণার মূল্য একশো প্রদেশের রাজস্বের সমান। সেই সঙ্গে তাকে বলে দেওয়া হয়েছে যদি তার প্রত্যাশিত গহনাপত্রের কথা জিজ্ঞাসা করা হয়, সে যেন তখন বুরহানপুরের রাজার কাছে ঐ থলেটি পেশ করে। এই বলে রাজকন্যা তার ভাবী শ্বশুরের সামনে থলেটি মেঝের উপর রাখল। বুরহানপুরের রাজা থলে খুলে পাথরটি ছাড়া কিছুই পেলেন না। পাথরটি দেখতে এমন কিছু নয়। তাই তিনি বেশ উষ্মা প্রকাশ করলেন, সন্দেহ করলেন সোনার থলেতে পাথর পাঠান তাঁর চরিত্রের প্রতি ইঙ্গিতবহ, রেগে তিনি রাজকন্যার কাছ থেকে পাথরটি ছিনিয়ে নদীর মধ্যে দিলেন ছুঁড়ে। সেই জায়গা থেকে, তিনি রাজকন্যাকে বিদায় দিয়ে তার পিতার কাছে মাণ্ডুতে ফেরৎ পাঠিয়ে দিলেন।

মাণ্ডুর অধিপতি, কন্যার অমন অসম্মানজনক প্রত্যাবর্তনে অপমানিত বোধ করে বুরহানপুরের রাজার কাছে একটি চিঠি পাঠান ছাড়া আর কিছুই করলেন না। চিঠির মর্ম, যে জিনিস আমার মেয়ের হাতে আপনার কাছে পাঠিয়েছিলাম, তার মূল্য বোঝার মত সাধারণবোধ আপনার নেই, তা দিয়ে রোয আপনি স্তূপ স্তূপ সোনা বানাতে পারতেন। নর্মদার বুকে নির্বোধের মত আপনি তা ছুঁড়ে দিয়েছেন, যেখান থেকে উদ্ধারের কোন আশাই নেই। বুরহানপুরের রাজার অনুশোচনা ও গ্লানি বর্ণনার দরকার নেই। চিঠি পাওয়ার পর তিনি তাঁর ভুলের মাত্রা বুঝতে পারলেন, যদিও নদীর মধ্যে থেকে পাথরটি উদ্ধারের জন্য যথাসাধ্য চেষ্টা করলেন, কিন্তু ঐ দুর্লভ পাথরটি পাওয়াই গেল না।

বহু যুগ পরের কথা। আমার পিতা আকবর বুরহানপুরের জনৈক রাজার বিরুদ্ধে অভিযানে বেরিয়েছেন। শাহী হাতীবাহিনীর মধ্যে একটি হাতী ছিল বন্য ও দুরন্ত মেজাজের, সেজন্য হাতীটির পায়ে ভারী শিকল বেঁধে দেওয়া হয়েছিল। নর্মদা পেরোবার সময় শিকলটি সেই হারান রহস্যময় পাথরের ছোঁয়া পায়, অন্য পাড়ে উঠার পর দেখা গেল শিকলটি জমাট সোনায় বদলে গেছে। এই ঘটনা পিতার কাছে সঙ্গে সঙ্গেই জানান হল। লোকজনকে লাগিয়ে দেওয়া হল পাথরটি খুঁজে বের করবার জন্য; কিন্তু কিছুই হল না, হতাশ হয়ে তাই খোঁজাখুঁজির বাতিল করে দেওয়া হল।

দুর্ভেদ্য এই মাণ্ডু দুর্গ সম্পর্কে এইটুকু মাত্র আর বলবার আছে, দুর্গটির অবস্থান ও দুর্ভেদ্যতা সত্ত্বেও, পিতা ছয় মাস অবরোধের পর দুর্গটি অধিকার করতে সক্ষম হন। তিনি তোরণ, মিনার ও প্রাকার মধ্যস্থ শহরশুদ্ধ দুর্গটি ধূলিসাৎ করে দিয়েছিলেন। কারণ দুর্গটি যার অধিকারে থাকে সেই তার সম্রাটের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করে থাকে। মাণ্ডুর ধ্বংসসাধন সত্ত্বেও বসত ও জমিজমা আগের মত না হলেও, সমৃদ্ধিশালী হয়ে উঠে।

আমার আরও কিছু বলবার আছে। দক্ষিণ ভারতের বিদ্রোহী শাসকদের শিক্ষা দেওয়ার জন্য আমার বিজয় পতাকা প্রতিষ্ঠা করার দরকার, সেই সময় আমি এই বিখ্যাত স্থানের কাছাকাছি এসেছিলাম, বিশাল ভগ্নস্তূপ অবলোকন করবার জন্য

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

পাহাড়ে আরোহণ করেছিলাম। দেখলাম দেয়ালগুলি আংশিকভাবে ভেঙ্গে দেওয়া হয়েছে। আবহাওয়া ও জলবায়ু আমার পছন্দ হওয়াতে শহরটি পুনঃ প্রতিষ্ঠিত করার সঙ্কল্প আমি নিয়েছিলাম। সেই কারণে আমি নির্দেশ দিয়েছিলাম প্রাচীন এই শহরের ভগ্নস্তূপের ভেতরকার বিশাল ও বৈচিত্র্যময় বিভিন্ন ভবনের ভিত্তি চিহ্নিত করার জন্য। প্রত্যাশিত সময়ের আগেই ঐসব ভবনের সংস্কার করা হয়েছিল। পুরা একটি বছর আমি এখানে কাটিয়েছিলাম সেই সময়ের মধ্যে সুন্দর নহর ও প্রপাত শুদ্ধ কয়েকটি বাগান তৈরী করিয়েছিলাম। আমার দরবারও শিবিরের সবাই সম্রাটের অনুসরণে শহরের সর্বত্র সুন্দর সুন্দর বাগান ও প্রাসাদ নির্মাণ করিয়েছিল।

আমার প্রিয় পুত্র খুররম, আদেল খান ও দাক্ষিণাত্যের রাজন্যবর্গের সঙ্গে এক সন্ধিপত্র স্বাক্ষর করেছিল। সেই সন্ধি অনুযায়ী তারা আমার প্রতিনিধিদের অধিকারে ঐ দেশের সবচেয়ে সমৃদ্ধিশালী ভূভাগ ছেড়ে দিতে সম্মত হয়েছিল। তাদের মধ্যে পত্তন নগরীও আছে। এই নগরীটি সোনালী কাজ করা বস্ত্রের জন্য বিখ্যাত, ভূভারতে তার তুলনা নেই। প্রায়ই পিতা বলতেন যদি এই নগরীটি তাঁর অধিকারভুক্ত হয়, তাহলে তিনি এর দেয়ালগুলি সোনায় ও রূপায় মুড়ে দিতেন। সত্যি কথা বলতে কি, যতই ব্যয় হোক, নগরীটি অমন মেঘলাবৃত হওয়ার যোগ্যও। আরেকটি নগর সন্ধিসূত্রে আমাদের দেওয়া হয়েছিল। সেটি আহমেদ নগর, হোসেন নিজাম শাহের রাজধানী। খানপুরও আমাদের অধিকারে এসেছিল। জেলাটি নৈসর্গিক দৃশ্য ও জলবায়ুর দিক থেকে তুলনাবিহীন। সন্ধিসূত্রে বেরার প্রদেশও আমাদের অধিকারভুক্ত হয়েছিল। প্রদেশটির পরিধি এক মাসের ভ্রমণপথের সমান। প্রদেশটি সমৃদ্ধিবহুল জনসংখ্যা ও অসংখ্য শহরের দিক থেকে হিন্দুস্তানের যে কোন অংশের সঙ্গে তুলনীয়। এই সবকিছুই যখন আমার অধিকারভুক্ত হয়েছিল, সেই সঙ্গে চারশো হাতীর একটি দল, সাহস ও আকারে প্রথম শ্রেণীর, সব হাতীগুলিই হাওদা, শিকল, গলা-বন্ধনী, ঘণ্টা সজ্জিত, এই সবকিছুই স্বর্ণ নির্মিত, প্রতিটি জিনিস হিন্দী পাঁচ মন ওজনের কম নয়, যা কিনা ইরাকের পঞ্চাশ মন সোনার সমান। হাতীগুলির উপরে যে চন্দ্রাতপ, তাতে মুক্তার কারুকার্য করা নানা পশুর ছবি আঁকা।' এই উপলক্ষে যে উপঢৌকন আমার কাছে পেশ করা হয়েছিল তার মধ্যে আছে তিনটি মুক্তার মালা, এক একটি মালার দাম কম করেও ষাট হাযার টাকা এবং আরও আছে নানা জাতের দুর্লভ পাথর, হীরা, রুবী, চুনী, আমার কোষাগার ও বস্ত্রাগারে এত অপরিমিত ভাবে ঐ সব এসেছে যে তার বর্ণনা করা সত্যিই দুরূহ এবং নিরর্থক।

খুররমের হস্তক্ষেপের দরুন, ঐ উপলক্ষে তাঁর মাধ্যমেই পরাজিত রাজন্যবর্গের আর্জি আমার কাছে পেশ করা হয়েছিল, আমি তাদেরকে গুটিকয় জেলা ও শহর ছেড়ে দিতে এবং তাঁদের রাজকীয় মর্যাদা কিছু পরিমাণে পুনঃ প্রতিষ্ঠিত করতে সম্মত হই। আমি অতীতের ঘটনাবলী ভুলে গিয়েছিলাম এবং যতদূর সম্ভব বিবাদের কারণ দূর করতে সচেষ্ট হয়েছিলাম। বস্তুত, আমার

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

সেনাবাহিনী যুদ্ধে জয়ী হয়ে যে ভূভাগ অধিকার করেছিল তার অনেকাংশই আমি ফিরিয়ে দিয়েছিলাম, শুধু মুদ্রা ও খোৎবার অধিকার রেখে। সেইসঙ্গে বিজিত ভূভাগগুলির শাসনকার্যের ভার অসীম ক্ষমতা সহ খানখানানের হাতে অর্পণ করেছিলাম। তাঁকে বহুদিন থেকেই আমি নিজের পুত্র কিংবা ভ্রাতা বলেই মনে করে থাকি।

সুলতান খুররম যখন বুরহানপুর থেকে আমার সঙ্গে দেখা করতে এল, সঙ্গে নিয়ে এসেছিল উস্তাদ মুহম্মদ নাই (বংশী বাদক)-কে। তার পরিচয় খুররম দিয়েছিল যুগের শ্রেষ্ঠ সঙ্গীতজ্ঞ বলে। তিনি নতুন একটি সুর সৃষ্টি করেছেন যার নামকরণ করেছেন আমার নামে[৫৮]। বিশেষ করে বাঁশীতে তাঁর দক্ষতা কীর্তিমণ্ডিত, অবশ্য তাঁর নামেই তা স্পষ্ট। সত্যি কথা বলতে কি, যখন সে বাঁশী আমার সামনে বাজাতে শুরু করল, বাঁশীর সে সুর তরঙ্গের পর তরঙ্গে আমার কানে বেজে উঠতে লাগল, এমনি আশ্চর্য তাঁর বাঁশী বাজাবার ক্ষমতা। আমি বাঁশী শুনে এত খুশী হয়েছিলাম যে দাঁড়িপাল্লা আনাবার হুকুম দিলাম আমি, তাঁকে ওজন করিয়ে সে পরিমাণ সোনা তাঁকে উপঢৌকন দেব বলে ঠিক করলাম। কোন কথা না বলেই আচমকা লোকটি উঠে গেল আমার সামনে থেকে, খানিকক্ষণ বাদে এল ফিরে, এক হাতে বাঁশী, অন্য হাতে তাঁর ছয় বছরের মেয়ে। কারণ হিসাবে বলল, যখন সে সুরটা তৈরী করেছিল তখন মেয়েটি ছিল তার কোলে এবং আমার দাক্ষিণ্য থেকে মেয়েটি বঞ্চিত হবে কিছুতেই সে মেনে উঠতে পারছিল না। আমি তার কথায় সম্মতি জানালাম। পাল্লার এক ধারে সে, অন্যধারে সোনা, ওজন করে দেখা গেল তার ওজন হিন্দুস্তানী পাঁচ মন। ফের তাকে ওজন নিতে বললাম এবং সেই পরিমিত সোনা তার মেয়েকে দিতে বললাম।

কিন্তু লোকটির লোভের সীমা যেমন ছিল না তেমনি ছিল না কোন শালীনতা বোধ। খাজাঞ্চীদের প্রতিবাদ সত্ত্বেও সোনার ওজন বৃদ্ধির হাস্যকর প্রয়াস থেকে তাকে কিছুতেই নিবৃত্ত করা গেল না। তার অশালীনতা ও অশ্রদ্ধা এমন পর্যায়ে গিয়ে পৌঁছল যে আমি তা উপেক্ষা করতে না পেরে তাকে শিবির থেকে তৎক্ষণাৎ বের করে দেবার জন্য হুকুম দিয়েছিলাম। ঐ হুকুম জারী করবার আগে সেই লোকটি আমার কাছে এই প্রতিশ্রুতি চেয়েছিল তাকে রোয এক উট বোঝাই পানি সরবরাহ করা হয় সে সম্পর্কে যেন আমি নির্দেশ দিই। তাতে লোকটির ঔদ্ধত্যের যে সীমা নেই আমি সে ব্যাপারে আরও নিশ্চিত হলাম। তার লোভ তার গুণকে এভাবে ঢেকে দিয়েছিল। একথা ভুলে যাওয়া উচিত নয়, মানুষের মধ্যে প্রশান্ত মর্যাদাবোধের অভাবের চেয়ে খারাপ আর কিছু হতে পারে না। যে গুণটা সম্রাটদের সঙ্গে অপরিহার্য ভাবে থাকা বিধেয়। পরে জানা গেল, লোকটি এই প্রথম তার বোকামির শাস্তি ভোগ করেনি। আদেল খানও লোকটির সীমাহীন লোভের জন্য তাঁর রাজধানী থেকে বিতাড়িত করে দিয়েছিল।

---

৫৮. নুর-ই-জাহাঙ্গীরি।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

মাণ্ডুতে থাকাকালীন আমার কানে এসে পৌঁছল মীর্জা রুস্তম কি ভাবে যেন চার হাযার তোমানের[৫৯] মত ঋণ করে বসে আছেন। তাঁর মহানজনরা ঋণ পরিশোধের জন্য তাঁকে অত্যন্ত পীড়াপীড়ি করছে। আমার দাক্ষিণ্য ও উপঢৌকন বাদেও, পাঁচ হাযারী মনসবদারীর পদমর্যাদা ও বার্ষিক প্রায় বত্রিশ লক্ষ টাকা আয় সত্ত্বেও মীর্জা রুস্তম ঋণে আকণ্ঠ ডুবে আছেন। এই ঋণ অতিরিক্ত খরচের স্বভাবের জন্য, কিংবা নিজের সম্পত্তির বাজে বিলি বন্দোবস্তের জন্য হোক, তার থেকে খুব সম্ভব তিনি কোনকালেই পরিত্রাণ পাবেন না। তিনি যে গান বাজনায় আসক্ত, সে সম্পর্কে আমি কোনদিনই হদীস পাইনি। তার দরুন আমার সন্দেহ হল তাঁর কর্মচারীরাই তাঁর শ্রমবিমুখতার সুযোগ গ্রহণ করেছে। এই ঋণের ভারে তাঁর সব শক্তি হ্রাস পাবে মনে করে আমি তাঁর সব মহাজনদের আমার কাছে ডেকে পাঠালাম। তাঁর ঋণ সব শোধ করে দিলাম। সেই সঙ্গে পাওনাদারদের আমি বলে দিলাম যদি কেউ ভবিষ্যতে মীর্জা রুস্তমকে যে অবস্থাতে হোক টাকা ধার দেয়, তাহলে তার জন্য তাকে শাস্তি পেতে হবে।

বহুদিন হল গুজরাট প্রদেশ পরিদর্শন করা আমার হয়ে ওঠেনি। গুজরাটের সাম্প্রতিক হালচাল দেখার ইচ্ছা আমার মনে জেগে উঠল, তাছাড়া তার কাছেই আমি যখন আছি। যথোপযুক্ত ব্যবস্থা করে মাণ্ডু ছেড়ে আমি তাই গুজরাট অভিমুখে রওয়ানা হলাম। পিতা ঐ প্রদেশটি সম্পূর্ণ করতলগত করার পর, তাঁর দরবারের সব সভাসদকে নির্দেশ দিয়েছিলেন ঐ সীমান্তবর্তী অঞ্চলের সর্বত্র বিশ্রাম ও বিনোদনের জন্য বাগানশুদ্ধ দালানকোঠা তৈরী করতে। প্রাদেশিক রাজধানীর কাছে যে জায়গায় আমি শিবির ফেলেছিলাম, সে জায়গাটি হচ্ছে খানখানানের বাগানবাড়ি, আহমেদাবাদের শহরতলীর কাছেই। খয়রুননেসা বেগম ঐ সভাসদের কন্যা যিনি আমার হারেমের একজন অন্তঃপুরিকা। তিনি এসে বললেন, তাঁর পিতার বাগানে তিনি আমার অভ্যর্থনার ব্যবস্থা করতে চান, তাই তিনি আমাকে কয়েক দিন এখানে থাকতে অনুরোধ জানালেন, যাতে করে আমার অভ্যর্থনার সব ব্যবস্থা তিনি ত্বরান্বিত করতে পারেন। সে অনুরোধের আড়ালে এমন অনুরাগ ছিল যে তাকে আমি উপেক্ষা করতে পারলাম না, তার দরুন সেখানে আমি থেকে যেতে রাযী হলাম। প্রসঙ্গক্রমে আমি উল্লেখ না করে পারছি না, সময়টা তখন শীতের, হিমে গাছ ও কুঞ্জের সব পাতা ঝরে গেছে, ফলফুল কিছুই নেই।

পাঁচ দিনের মধ্যে আহমেদাবাদের পাঁচ হাযার লোক নিযুক্ত করে বাগানের চেহারাই পাল্টে দেওয়া হল। তারা সবাই সাজানর কাজের বিভিন্ন কারিগর, রঙ্গীন কাগজ ও মোমে মুড়ে এমন করা হল, বোধ হল গাছ ও কুঞ্জ পাতা, ফুল ও ফলে ভরা, বসন্তও গ্রীষ্মের সব সমারোহই উপস্থিত যেন। ফলের গাছের মধ্যে আছে কমলা, লেবু, পীচ, ডালিম ও আপেল। ফুলের মধ্যে আছে গোলাপের সব জাত,

---

৫৯. তোমান প্রতি তেত্রিশ টাকা ধরলে প্রায় ৬০৫,০০০ টাকা হবে।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

সব রকমের ফুল। বাগানের ভোল এমন ভাবে বদলে দেওয়া হয়েছিল আমি যখন বাগানে প্রথম প্রবেশ করি, ভুলেই গিয়েছিলাম বসন্ত চলে গেছে, ফলেরও মৌসুম নয়, আমি বোকার মত ফুল ও ফল তুলতে শুরু করলাম। কারিগররা নিসর্গের এমনি নিপুণ ভাবে প্রতিবিম্বিত করেছিল। কোন দ্বিধা না করেই আপনি বলে বসবেন তাজা ও পক্ক ঐ ফুল ফল। বাগানের নানা পথ বিচিত্র তাবু ও চন্দ্রাতপে সাজান হয়েছিল, তাবু ও চন্দ্রাতপের রং গাঢ় সবুজ, এইসব সবুজ ঘাসের রঙে মিলে গেছে, আর গোলাপ ও নানা ফুলের রঙের সঙ্গে মিলে আশ্চর্য বৈসাদৃশ্য তৈরী করেছে, ঐ সমারোহের বৈচিত্র্যে আমি অভিভূত হয়ে পড়েছিলাম, অন্য কোথাও, অন্য কোন বাগানে, গোলাপের ঋতুও অমনভাবে আমার ইন্দ্রিয়ে সাড়া জাগায়নি।

অমন মন ও নয়ন হরণকারী দৃশ্য থেকে আমি চলে যেতে চাইলাম না, তাই তিন দিন তিন রাত সেখানে থেকে গেলাম; সুস্বাদু ভোজোৎসব বাদে, আমার সঙ্গে যেসব অন্তঃপুরিকা এসেছিল, তাদের সংখ্যা চারশো, তাদের প্রত্যেককেই খুরাসানের তৈরী সোনার বুনন করা চার খণ্ড কাপড় থলিতে করে উপঢৌকন দেওয়া হয়েছিল। সেইসঙ্গে দেওয়া হয়েছিল মূল্যবান কারুকার্য করা একটি করে আতরদান। প্রত্যেকটি উপঢৌকনের আলাদা দাম কম করেও তিনশো তোমান। ঐ উপলক্ষে বেগম আমাকে যেসব উপঢৌকন দিয়েছিলেন তার দাম কমপক্ষে চার লক্ষ টাকা। তিনি দিয়েছিলেন মণিমুক্ত, ব্যবহারের জন্য দুর্মূল্য কাপড়, তেজী ঘোড়া। বদলে আমি তাঁকে উপহার দিয়েছিলাম পাঁচ লক্ষ টাকা মূল্যের মুক্তার একটি মালা এবং তিন লক্ষ টাকা মূল্যের রুবী। মুক্তার মালাটি আমার জন্য কেনা হয়েছিল। তাঁর পিতার পদমর্যাদা আমি আরও এক হাযার উন্নীত করে দিয়েছিলাম। মোটকথা, আমার বিনোদনের জন্য খানখানানের কন্যা এক সপ্তাহে যা করেছিলেন, একশো পুরুষ তাদের দক্ষতা ও নিপুণতা দিয়েও কখনও তা করে উঠতে পারবে না।

পিতা গুজরাট শহরের প্রায় জায়গায়ই দালানকোঠা তৈরী করিয়েছিলেন। শহরে প্রবেশ করার পর যে সব সৌধ তাঁর স্মৃতির অযোগ্য মনে হল, সে সব ভেঙ্গে আরও বিশাল ভবন তৈরী করার নির্দেশ দিয়েছিলাম। পাঁচ মাসের মত আমি গুজরাটে ছিলাম। শিকার করে আর দেশটির নানা জায়গায় ঘুরে বেড়িয়ে আমি সময় কাটাতাম। এ কথা বলতেই হবে প্রদেশের প্রধান শহর গুজরাট হিন্দুস্তানের প্রধান শরহগুলির অন্যতম এবং একথা স্মরণযোগ্য, বিদ্রোহী মীর্জাদের আমলে, যারা আমার পিতাকে উত্যক্ত করে তুলেছিল, শাহী নাকাড়া বা নহবৎ শহরের নানা জায়গা থেকে বেজে উঠত, তার মানে বহু স্বাধীন রাজাদের বাসভবন সেসব; শহরটির সমৃদ্ধির পক্ষে আরও একটি তথ্য এই যে শহরটি ঘিরে ছিল একষট্টিটি শহরতলী, সব শহরতলীই ছোটখাট নগর বিশেষ এবং সবগুলিই পৃথক নগরপাল দ্বারা শাসিত হত। সে সময়ে, শহরের বিভিন্ন বাজারে কম করেও ছিল পাঁচ হাযার বাট্টার দোকান। সব দিক থেকে বিচার করে শহরটি সমৃদ্ধি স্বীকার করতেই হয়।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

জনবহুল শহরটিতে অবশ্য ছিল অসংখ্য চোর ও নানা জাতের ভবঘুরে, ডাকাতি ও খুনাখুনিতে উস্তাদ, চরম শাস্তির ব্যবস্থা করার পরও তাদেরকে ঐ বীভৎস জীবনযাপন থেকে নিবৃত্ত করতে পারিনি। এমনকি মধ্যে মধ্যে দুশো থেকে তিনশো মাথা কাটার নির্দেশ দেওয়া সত্ত্বেও। এই সবের দরুন গুজরাটের পথঘাটে জনসাধারণের নিরাপত্তা বিপজ্জনক হয়ে উঠেছিল, যার ফলে কবির লীলাভূমি সিরাজ নগরীর এক ব্যক্তি আগ্রা এসে তার মনোভাব চার লাইনে এভাবে ব্যক্ত করেছিল, তাঁর দোওয়ায়, যিনি কারও কাছে দায়ী নন, আমি সেই সব পথঘাটে ঘুরে বেড়িয়েছি, যা মানুষের রক্তে ভেজা। গুজরাটের বিপদ আপদ থেকে যিনি বেঁচে আসতে পারেন তিনি পুনর্জীবন লাভ করেছেন বলতেই হয়।

গুজরাট প্রসঙ্গে আমার বক্তব্য শেষ করছি। প্রদেশটির পরিধি এক মাসের ভ্রমণপথের সমান। সীমান্তভূমি বনজঙ্গল ও পাহাড়ে ঢাকা, মানুষের অনধিগম্য, বন্যপশু যেখানে চরে বেড়ায়। মাণ্ড থেকে যখন আমি এই প্রদেশে এসে প্রবেশ করি, যে প্রসঙ্গে আগেই উল্লেখ করেছি, আমি নূরউদ্দীন কুলীখানকে নির্দেশ দিয়েছিলাম রাজকোষ থেকে যত অর্থের দরকার নিয়ে শাহী সৈন্যের রাস্তা অরণ্যের মধ্যে দিয়ে তৈরী করতে। ঐ রাজকর্মচারী বিশ হাযার শ্রমিক নিয়ে খুব অল্প সময়ের মধ্যে করাত ও কুড়ুল চালিয়ে অরণ্যের মধ্যে সড়ক তৈরী করেছিল। ঐ সড়ক দিয়ে নিরাপদেই আমরা যেতে পেরেছিলাম।

আহমেদাবাদ থেকে সমুদ্রতীর মাত্র তিন দিনের পথ। বহুদিন ধরে আমার সমুদ্র দেখার ইচ্ছা, তাই আমি ক্যাম্পে এসে হাযির হলাম। ক্যাম্পেতে আমি সমুদ্রের মধ্যে মাইল তিনেক গভীরে একটি জেটি বানিয়েছিলাম, হাযার দুয়েক মনের নোঙ্গর ফেলে সমুদ্রের তরঙ্গ থেকে জেটিটির নিরাপত্তা সাধনের ব্যবস্থা করেছিলাম। এখানে আমি সাত দিন সাত রাত দাড়বাহী নৌকায় চড়ে মাছ ধরার আনন্দে মশগুল ছিলাম।

ক্যাম্পে ও তার সমুদ্রচুম্বিত তীর ছেড়ে আমি চলে এলাম উজ্জয়নীতে। উজ্জয়নী হিন্দুস্তানের প্রাচীন শহরগুলির অন্যতম। শহরের পাশেই সুপেয় বিশাল একটি হ্রদ। হ্রদের ঢেউ এসে আছড়ে পড়ে দুর্গদেয়ালে। ঐ হ্রদের কিনারে আমার থাকবার জন্য বিরাট একটি প্যাভিলিয়ন নির্মাণ করিয়েছিলাম। প্যাভিলিয়নটি দেশের শ্রেষ্ঠ একটি স্থাপত্যশিল্প। উজ্জয়নীতে আমি ছিলাম চল্লিশ দিন, শিকার করে ও শহরের চারপাশে ঘুরে বেড়িয়ে দিন কাটাতাম।

উজ্জয়নীতে থাকাকালীন বীভৎস একটি রক্তাক্ত ব্যাপার অনুষ্ঠিত হয়েছিল। অপরাধের ইতিহাসে তার নযীর মেলা ভার।

জনৈক মোগল বেশ কিছুদিন ধরে উজ্জয়নীতে এক বাজার এলাকায় বাস করত। সে মদ্যাসক্ত মেয়েদের আমন্ত্রণ জানাত, তাদেরকে কাছাকাছি এক বাগানবাড়িতে পার্টি দিয়ে সে বলত এমন জমকাল পার্টি দেবে যা তাদের ধারণাতীত।

যে সব মহিলারা আমন্ত্রিত হত, তারা দামী গহনাপত্র পরে আসত পার্টিতে।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

তাদেরকে ঐ শয়তান মদ খাইয়ে মাতাল করে খুন করে গহনাপত্র কেড়ে নিয়ে ফিরে আসত নিজের বাড়িতে। বেশ কয়েক সপ্তাহ অমন করে বেড়াল লোকটি। অমন হীন কাজ করে লোকটি জমিয়েছিল পয়তাল্লিশ হাযার তোমান[৬০]।

অবশেষে ঐ ধরনের জনৈকা মহিলাকে সে আমন্ত্রণ করেছিল। মহিলাও যথারীতি, সবচেয়ে দামী অলঙ্কারপত্রে সেজেগুজে নির্দিষ্ট জায়গায় এসেছিল সঙ্গে একজন পরিচারিকা ও সহিস নিয়ে। নির্দিষ্ট জায়গায় মহিলা সেই মোগলকে দেখতে পেল তার জন্য অপেক্ষা করছে। পোড়াকপালি ঐ মহিলাকে মধ্যরাত পর্যন্ত আদর আপ্যায়ন করল লোকটি, তারপর মহিলাকে সে মদ খাওয়াল, পরিচারিকা ও সহিসকে সে হত্যা করে ফেলল। তারপর ধনুকের ছিলা মহিলার গলায় ফাঁসের মত জড়িয়ে তাকে হত্যা করে লোকটি তার অসৎ উদ্দেশ্য হাসিল করে রক্তরঞ্জিত গহনাপত্র নিয়ে ফিরে এল তার আবাস ভবনে।

তার ঐ দুর্বৃত্তপনা, যে ভাবেই হোক শেষ পর্যন্ত জানাজানি হয়ে গেল। যে মহিলাকে সে হত্যা করেছে তার দেহ ও গহনাপত্র শুদ্ধ পিশাচকে হাযির করা হল আমার কাছে। আমি কোতওয়ালকে নির্দেশ দিলাম খুনীর বাড়িঘর তালাশ করবার জন্য, এই ভেবে যে তার হাতে মৃত আরও অনেকের গহনাপত্রের খোঁজ হয়ত পাওয়া যাবে। যা ভেবেছিলাম তাই হল। তারা সেখান থেকে নিয়ে এল দুটি সিন্দুক। আমার সামনে সিন্দুক দুটি খোলা হলে পর দেখা গেল মহিলাদের কমপক্ষে সাতশো জোড়া সোনার গহনাপত্র আছে, ঐ পোড়াকপালিদের কাছ থেকে কেড়ে নেওয়া, যারা তার ঘৃণ্য লোভের কাছে আত্মাহুতি দিয়েছে। যেইমাত্র এই ঘটনা সবাই জানল, মৃতদের আত্মীয়-স্বজন গয়নাগাটির দাবী জানাল, তাদেরকে ফিরিয়ে দেয়া হল সেসব। আমি নির্দেশ দিলাম অমন জঘন্য দুর্বৃত্তপনার নায়ককে প্রকাশ্যে, ভবিষ্যতের ভীষণ উদাহরণ হিসাবে, গরম লৌহশলাকায় বিদ্ধ করে হত্যা করার জন্য।

উজ্জয়নী থেকে আমি আগ্রার পথে ফিরে চললাম। যথা সময়ে এসে পৌছলাম ফতেপুরে। এখানে আমি চার মাস থেকে গেলাম। আগ্রায় তখন ভয়ংকর মড়ক লেগেছে। মড়ক থেমে গেলে ও আবহাওয়া ভাল হলে পর ফতেহপুর ছেড়ে আমি দোরা বাগানে এসে আস্তানা গাড়লাম। এই বাগানগুলি রাজধানীর ধারে। পিতার রাজত্বকালের শুরুতে তৈরী করা হয়েছিল। বাগানে আছে চারটি দীঘিকা, প্রতিটি দৈর্ঘ্যে প্রস্থে এক হাযার পদক্ষেপ লম্বা এবং প্রতিটির পাড়ে বেশ বড় একটি করে প্যাভিলিয়ন। বাগানগুলি পুরান সাইপ্রেস গাছের জন্যও বিখ্যাত। তাছাড়া আছে নাশ জাতের প্রচুর ফলের গাছ।

বাগান ছেড়ে আগ্রায় প্রবেশ করবার আগে সেকেন্দ্রায় গিয়ে পিতার কবর যিয়ারত করা পবিত্র কর্তব্য বলে মনে করলাম। কবরের উপর সমাধিভবন তৈরী করার যে নির্দেশ আমি আগেই দিয়েছিলাম তার নির্মাণ এখন শেষ হয়েছে। সত্যি

---

৬০. তেত্রিশ টাকায় এক তোমান, তার মানে চৌদ্দ লক্ষ পঁয়তাল্লিশ হাযার টাকা।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

কথা বলতে কি সমাধি ভবনটি দেখতে হয়েছে নয়ন সুখকর। প্রথমত, তার চারপাশে ঘিরে আছে শ্রেণীবদ্ধ স্তম্ভ। ঐ স্তম্ভগুলির উপর আট হাযার হাতী ও সেই সংখ্যক ঘোড়া দাঁড়াতে পারে। স্তম্ভগুলি দাঁড়িয়ে আছে খিলানের উপর এবং খিলানগুলি কোঠায় ভাগ করা। প্রধান তোরণ যার ভেতর দিয়ে আপনি প্রবেশ করবেন সেটা ত্রিশ হাত প্রশস্ত, উচ্চতাও তেমনি। তার উপর আছে একটি মিনার, চারটি বিরাট খিলানের উপর দাঁড় করান, সে গিয়ে মিলেছে বৃত্তাকৃতি একটি গম্বুজে। গম্বুজটি একশো বিশ হাত উঁচু, ছয়তলা; ছাদ থেকে তলা পর্যন্ত সোনা ও নীলকান্ত মণিতে মোড়ান। ঐ স্তম্ভশ্রেণীর চার কোণায় তিন তলা সমান উঁচু একটি করে মিনার আছে। মিনারটি পাথর কুঁদে তৈরী। প্রবেশ পথ থেকে যে ভবনে পিতার নশ্বর দেহ রক্ষিত, তার দূরত্ব পৌনে এক ফারসাঙ্গের মত, প্রবেশ পথটি একটি স্তম্ভসারিতে ছড়ান, মসৃণ লাল পাথরের, পাঁচ হাত চওড়া। স্তম্ভসারির দুপাশে বাগান, সেখানে সাইপ্রেস, বুনো পাইন, সুপারি গাছ সারি সারি এবং দুপাশের বাগানে অল্প দূরত্বে ফোয়ারা, ঐ ফোয়ারার পানি দশ হাত উঁচুতে উচ্ছ্রিত, প্রধান প্রবেশ পথ থেকে মাযার পর্যন্ত আমাদের দশটি ফোয়ারা পেরিয়ে যেতে হয়। মাযারের উপরে সাত তলা উঁচু একটি প্যাভিলিয়ন, উপর দিকে ক্রমশই সরু হয়ে গেছে, সাত তলাটা গম্বুজে রূপান্তরিত হয়েছে, ঐ গম্বুজটি অন্যান্য ভবনের সঙ্গেও প্রাকারের সঙ্গে সংযুক্ত, সবগুলিই আগাগোড়া মসৃণ মার্বেলে তৈরী এবং সৌধভবনগুলির মোট খরচ একশো আশি লক্ষ টাকা। ঐ বাদেও আমি রোয দুশো পাত্র খাদ্য ও দুশো পাত্র মিষ্টি মাযার থেকে গরীবদের ভেতর বিতরণের ব্যবস্থা করে দিয়েছিলাম। কোন আগন্তুককে, তার সহচরদের সংখ্যা হাযার হলেও, নিজেদের খাদ্য তৈরী করার দরকার পড়ত না।

পিতার নশ্বর দেহ যেখানে রক্ষিত সেখানে প্রবেশ করার পর আমার মনে হল পরলোকগত সম্রাট বুঝি বেঁচে আছেন, তিনি সিংহাসনে বসে, আর আমি সেখানে এসেছি আমার বিনতি ও শ্রদ্ধা জানাতে। কবরের পাদদেশে আমি উপুড় হয়ে শুয়ে আন্তরিক অনুশোচনায় অশ্রু বিসর্জন করলাম। ঐ তীর্থভূমি ছেড়ে আসার পর এবং পবিত্র সেই স্মৃতির কথা মনে রেখে আমি ওখানকার চারপাশের গরীবদের ভেতর বিতরণ করে দিলাম পঞ্চাশ হাযার টাকা। ঘোড়ায় চড়ে আমি তারপর আগ্রা দুর্গের ভেতরে এসে হাযির হলাম, হাযির হলাম আমার প্রাসাদে, যে প্রাসাদ নির্মাণ করতে আগেই নির্দেশ দিয়েছিলাম।

ঐ প্যাভিলিয়নটি যমুনা নদীর দিককার তোরণটির উপরে, তৈরী করা হয়েছে পঁচিশটি খিলানের উপর দাঁড়িয়ে। খিলানগুলি সোনার পাতে মোড়ান, তাতে রুবী, নীলকান্ত মণি ও মুক্তার কাজ করা। বাইরের দিকের ছাদটি গম্বুজের আকারে বানান, তাও সোনার পাতে মোড়া, গম্বুজের নীচের সিলিং দুর্লভ পাথরের অপরূপ কারুকাজ করা। কাছের মিনারটি চার তলা সমান উঁচু, পূর্ববর্ণিত ভাবে মহার্ঘ কারুকাজ করা, উপর থেকে নীচু পর্যন্ত মিনারটি অষ্ট ভুজ বিশিষ্ট। ঐ মিনার সংলগ্ন ছোট্ট একটি করোকা, যমুনার দিকে মুখ করা, সেখান থেকে, ইচ্ছা হলে

AMARBOI.COM

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

আমি হাতী, নীল গাই, হরিণ ও অন্যান্য বন্য পশুর লড়াই অবলোকন করতে পারি। নদীর সঙ্গে সমান্তরাল ঐ দালানটির অন্য একটি তলায় বসে আমি আমার দরবারের সভাসদদের মধ্যে মধ্যে আমোদ-প্রমোদের সময় আমার পানপাত্র থেকে মদ বিতরণ করতাম। এই করোকাতে বিরল সৌভাগ্যবানদের আমার সামনে বসবার অনুমতি দেওয়া হত।

তাছাড়া আরও একটি বৃহৎ কক্ষ আছে, যেখানে উঁচু নীচু সব স্তরের লোকদের অবাধ প্রবেশাধিকার ছিল, কিন্তু এখানে সোনার জাফরিকাটা দেয়াল তুলে একটি অংশ আলাদা করা ছিল, দরবারের সামনের দিকের একটি অংশে মানুষ সমান উঁচু করে তৈরী করা হয়েছিল মঞ্চ, মঞ্চটি সোনায় মোড়া, সেখানে দরবারের বিশিষ্ট পারিষদ, শাহযাদা, একহাযারী থেকে পাঁচহাযারী মনসবদারদের বিশেষ বিশেষ উপলক্ষে দাঁড়িয়ে থাকতে হত। সমস্ত যমিনটি ত্রিশ থেকে চল্লিশ হাত কার্পেটে মোড়া এবং উপরে সোনার কাজ করা ভেলভেটের ত্রিতল চন্দ্রাতপ, মধ্যাহ্ন সূর্যের প্রখর কিরণ থেকে রেহাই পাওয়ার জন্যই ঐ চন্দ্রাতপের ব্যবস্থা। জাফরির কাজ ও মঞ্চ দুইই নিখাদ সোনার। এমন ভাবে তৈরী যে খণ্ড খণ্ড করে সব জায়গায় নিয়ে যাওয়া চলে, তার দরুন রাজকীয় সামানের এটি অঙ্গ বিশেষ, প্রয়োজনবোধে সব জায়গায় তৈরী করা যায়। শুধু এটুকু আমি বলব রাজকীয় দরবারের এই জিনিস তৈরী করতে লেগেছে তিন হাযার মন সোনা।

আগ্রায় স্থায়ী ভাবে বসার পর, এলাহাবাদে আমার পুত্র সুলতান পারভেযের কাছে বার্তা পাঠালাম আমার সঙ্গে দেখা করবার জন্য। পারভেয এলাহাবাদে থাকত। যখন খবর এসে পৌছল সে আগ্রা থেকে একদিনের পথে এসে গেছে, আমি সাম্রাজ্যের সব আমীর ও সভাসদদের নির্দেশ দিয়েছিলাম রাজধানী ছেড়ে তাকে গিয়ে এগিয়ে নিয়ে আসার জন্য। এই উপলক্ষে যে আনন্দ-উৎসবের ফরমান আমি দিয়েছিলাম তা নিম্নরূপ : তারা যখন শাহাযাদা ও তাঁর সহচরদের কাছাকাছি এসে পৌছবেন ঘোড়া থেকে নেমে তাঁরা দাঁড়িয়ে অভিবাদন করতে থাকবে যতক্ষণ পর্যন্ত শাহাযাদা তাদের ঘোড়ায় চড়ার ফের অনুমতি না দেবে' শুধু তাদের ভেতর ইতমদ্দৌলা বাদে, তিনি নেমে অভিবাদন করার পর আর কিছু না করেই ঘোড়ায় চড়তে পারবেন। এভাবে আমার দরবার ও সেনাবাহিনীর বিশ হাযার ব্যক্তিকে পাঠান হল শাহাযাদাকে তাজিমের সাথে আমার কাছে নিয়ে আসার জন্য সে এলে পর তাঁকে গুলফেসান বাগানে থাকার নির্দেশ দেওয়া হল।

পরদিন আমি নির্দেশ দিলাম আগ্রা দুর্গ থেকে শাহাযাদা যে বাগানে রাত কাটিয়েছে, এই পথটুকুতে, যার দূরত্ব অর্ধ ফারসাং, কুড়িটি নাকাড়ার দলকে পরপর দাঁড়িয়ে থাকতে, শাহযাদার আগমনের সঙ্গে সঙ্গেই যেন নাকাড়া উঠে বেজে। ঐ একই সময়ে শহরের প্রায় সবাই, নরনারী নির্বিশেষে ভাল পোশাক পরে ছুটে চলল শাহযাদাকে অভ্যর্থনা জানাতে। যে পথ দিয়ে শাহযাদা আসবে তার দুধারে সারি বেঁধে দাঁড়িয়ে আমার সেরা তিন হাযার হাতী, মুক্তা ও সোনার সাজ পরে। আরও আমার ওয়ার্ডরোব থেকে তাঁকে পাঠিয়েছিলাম এক প্রস্থ

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

পোশাক, হীরক-খচিত আমার নিজের কিরিচবন্দ, যার দাম চার লাখ টাকা; আমার নিজের হীরক-খচিত পাগড়ি চূড়া, যার দাম এক লাখ টাকা এবং পাঁচ লাখ টাকা দামের মুক্তার একটি মালা। শুধু তাই নয়। আমার দরবারের সব স্তরের সভাসদদের আমি নির্দেশ দিয়েছিলাম, যদি তারা আমার ঘনিষ্ঠ হতে চান তাহলে তারা যেন সাধ্যানুযায়ী শাহযাদাকে নযর পেশ করেন। পরে যে ফর্দ আমার কাছে পেশ করা হয়েছিল তার থেকে জানা গেছে শাহযাদা এই উপলক্ষে ঐ নির্দেশের দরুন সোনা, রত্ন, ঘোড়া, হাতী মিলিয়ে দুকোটি টাকার মত অর্থ লাভ করেছিলেন।

ঐ দিনেই তারা পারভেযকে যমুনা পার করে আগ্রা দুর্গের অভ্যন্তরে নিয়ে এল এবং উপস্থিত করল আমার সামনে। যেইমাত্র আমার নয়নপথে তিনি এলেন, কিছুটা দূর থেকেই তিনি মেজেতে কপাল ঝুঁকিয়ে কুর্ণিশ করতে করতে এলেন। সাত বারের বার কুর্ণিশ করে তিনি খাড়া হয়ে দাঁড়ালেন আমার সামনে, দুই হাত বুকের উপর রেখে। এরপর আমি সাদেক মুহম্মদ খান ও আমার জনৈক বখশী খোজা আবুল হুসাইনকে আদেশ করলাম শাহযাদাকে দুবাহু ধরে তুলে ধরার জন্য, যাতে তিনি আমার পায়ে চুমা খেতে পারেন। তারপর তাঁকে আমার ডান পাশে আসন গ্রহণ করতে বললাম, কেননা আমার বা পাশে পুত্র খুররম ঐ উপলক্ষে বসেছিলেন। তাঁর অভ্যর্থনার জন্য মুহব্বত খানের প্রাসাদ খালি করে দেওয়ার জন্য আমি নির্দেশ দিয়েছিলাম। মুহব্বত খান তখন উপস্থিত ছিলেন না, কাবুল সীমান্তের হাঙ্গামা দমাতে তিনি সেখানে গিয়েছিলেন। তার পরিবার পরিজনদের আমার নির্দেশক্রমে অন্য বাসভবনে স্থানান্তরিত করা হল।

তারপরের দিন পারভেয আনুষ্ঠানিক ভাবে বিনতি জানাতে এল। ঐ উপলক্ষে তিনি আমাকে যে সব মহার্ঘ উপঢৌকন দিয়েছিলেন তার তালিকা এভাবে দেওয়া যায়! আশিটি সেরা জাতের শিক্ষিত হাতী; ইরাকী ভাল জাতের দুশো ঘোড়া, তাদের সাজসজ্জা সোনায় মোড়া; এক হাযার দ্রুত গতি উট, গুজরাটের গুটিকয়েক সাদা ষাড়, চারশো সোনালী ব্রোকেড, ভেলভেট, সার্টিন ও দুর্লভতম বস্ত্র, বার থালা ধনরত্ন, তাদের ভেতর আছে হীরা, রুবী, মুক্তা ও নীলকান্তমণি। সবশুদ্ধ চারকোটি টাকার উপঢৌকন। আমিও তাঁর গলায় দশ লক্ষ টাকার মুক্তার মালা দিয়েছিলাম পরিয়ে। সেই সঙ্গে দশহাযারী থেকে ত্রিশহাযারী মনসবদারীতে উন্নীত করে দিয়েছিলাম।

পারভেযের আগ্রা আসার এক মাস পরের কথা। হঠাৎ একদিন গলায় কাপড় জড়িয়ে পারভেয আমার সামনে এসে আমাকে অবাক করে পায়ের উপর লুটিয়ে পড়ে অঝোরে কাঁদতে শুরু করল। বিস্ময়াহত হয়ে তাঁকে আমি স্নেহপ্রবণ কণ্ঠে জিজ্ঞাসা করলাম সে কি চায়–তার এই দুখের কারণ কি, কি তার অভিযোগ করার আছে? উত্তরে সে বলল এটা তার ভাবনাতীত যে সে ও তার অন্যান্য তিন ভাই শিকার করে নানা রকম আমোদ-প্রমোদের ভেতর দিয়ে হাল্কা ও স্বচ্ছন্দ মনে দিন কাটাবেন, অথচ তাঁদের সবচেয়ে বড় ভাই, আজ পনের বছর হল নি:সঙ্গ

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

জেলখানায় দুঃখ ভারাক্রান্ত অস্তিত্বের ভারে স্তব্ধ হয়ে আছেন। একেবারে নির্দোষ হওয়া মানবীয় স্বভাব নয়; কিন্তু সবক্ষেত্রে দয়া করা রাজজনোচিত গুণ। সেজন্য তাঁর একান্ত প্রার্থনা যেন আমি তাঁকে মার্জনা করে দিই, তাঁকে দু:খকর কয়েদ থেকে মুক্ত করে দিই এবং আমার শাহী নযরে তাঁকে তুলে ধরি। অমন প্রার্থনা মঞ্জুর করা হঠাৎ করে সহজ নয়, সেজন্য আমি দাবী জানালাম কমবখত খসরু ভবিষ্যতে যাতে ফের রাজদ্রোহিতা না করে, সে ব্যাপারে পারভেয দায়ী থাকতে রাযী কিনা। যদি তা-ই হয়, তাহলে খসরুকে ছেড়ে দিতে আমি রাযী হতেও পারি। পারভেয তক্ষণি কাগজে কয়েক লাইন লিখে দিল, জামিননামার মত, আমিও তাই কথামত খসরুকে মুক্তি দিতে সম্মত হলাম।

এই মুক্তি যাতে আনুষ্ঠানিক হয় তার দরুন আমি দোরাবাগে বিরাট উৎসবের আয়োজন করতে নির্দেশ দিয়েছিলাম। দোরাবাগের কথা আগেই উল্লেখ করেছি। সেখানে আমি নির্ধারিত দিনে আগ্রার প্রাসাদ থেকে এসে হাযির হলাম। সেখান থেকে আমি আসফ খান ও খানজাহানকে নির্দেশ দিয়ে পাঠালাম যথারীতি ভর্ৎসনা করে তারা যেন খসরুকে বন্দী দশা থেকে মুক্ত করে আমার সমীপে এনে হাযির করে। ইতোমধ্যে আমি আমার নিজের পোশাক কক্ষ থেকে তার জন্য পুরা এক প্রস্থ পোশাক আনিয়েছিলাম, কোমরবন্দ ও মুক্তা বসান পাগড়িচূড়া শুদ্ধ। তাছাড়া একটি সজ্জিত ঘোড়া ও খোপারা হাতীটি, যার জন্য আমার পিতাকে কমপক্ষে চার লক্ষ টাকা ব্যয় করতে হয়েছে, যে হাতী এতদিন আমার শাহী পিলখানায় ছিল তাও তাকে দিয়েছিলাম। হাতীর উপর হাওদা তৈরী করতে প্রায় ত্রিশ লক্ষ টাকা খরচ পড়েছে। ঐ টাকা ইরাকের নব্বই হাযার তোমানের সামিল।

শাহযাদার পদমর্যাদা অনুযায়ী তাকে আমি আরও দিয়েছিলাম, শাহী আস্তাবলের ভাল জাতের দুশো তিনটি ঘোড়া; আমি নির্দেশ দিয়েছিলাম সর্বস্তরের আমীরদের, যাদের তাকে বিনতি জানাতে যেতে হবে, যথোপযুক্ত উপঢৌকন না নিয়ে তারা যেন তাঁর কাছে না যায় এবং সবাইকে তাঁর কয়েদ ঘর থেকে দোরাবাগ পর্যন্ত পদব্রজে তাঁর সঙ্গে হেঁটে আসতে হবে। কয়েদঘর থেকে দোরাবাগের দূরত্ব পৌনে এক ফারসাঙ্গ। অবশ্য সুলতান পারভেয ও ইতমদ্দৌলার ক্ষেত্রে এই শর্ত প্রযোজ্য হবে না। পনের বছর আমার সম্মুখ থেকে দূরে থাকার পর অমন ভাবে শাহীনযর ও শানশওকাতের সঙ্গে তাকে অভ্যর্থনা করা হয়েছিল। খসরুকে আমি অনুমতি দিলাম আমাকে বিনতি জানাতে।

যখন সে দর্শন-কক্ষে এসে হাযির হল সিংহাসন থেকে কিছু দূরে, তার চোখে ঝরঝর করে পানি এল বারবার মেজের উপর শুয়ে পড়ে পড়ে সে আমার কাছে উপস্থিত হল। একেবারে কাছে এসে সে আমার পায়ের উপর মাথা রেখে, মাথা না তুলে, পুরা এক ঘণ্টা থাকল, বারবার আমি তাকে অনুরোধ করার পরও। সে বলে উঠল, 'কোন মুখে আমি আপনার শাহী চোখের দিকে তাকাব? যে হীনতম অপরাধে আমি দোষী, তার জন্য কি মার্জনা ভিক্ষা করা যায়?' অনেকক্ষণ কাঁদার পর সে অবশ্য উঠে দাঁড়াল, তার আর্তির বাণী রূপ পেলো কয়েক ছত্র কবিতায়,

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

কবিতা বলে সে পূর্ব অপরাধের জন্য দয়া ও ভবিষ্যতের জন্য অনুগ্রহ প্রার্থনা করল। এতক্ষণ ধরে তার অনুতাপের প্রমাণ দেওয়ার পরও, সে নতজানু হয়ে মেজেতে গভীর বিনয়ে দাঁড়িয়ে রইল, দুই হাত বুকের উপর জড়ো করা। সে আবার বলল তার আচরণের কখনই মার্জনা নেই, লজ্জাবোধ থেকে উদ্ধার নেই, যদি দিনরাত অনুতাপে দগ্ধ হয়ে আমার সামনে দাঁড়িয়ে থাকে, তবু।

আমি এক সুরাহী মদ ও দুর্লভ পাথরে মিনে করা একটি পানপাত্র আনবার নির্দেশ দিলাম। আমার চার ছেলে খসরু, খুররম, পারভেয ও শাহরীয়ারকে একত্রে বসবার নির্দেশ দিলাম এবং বললাম পানপাত্র পরস্পরকে দেওয়ার জন্য, আর আমি নিস্পৃহভাবে তাকিয়ে থেকে এই নতুন মিলন প্রত্যক্ষ করলাম। আমার পঞ্চম ও সর্বশেষ সন্তান সুলতান বখত, সেই সময়ে বাংলাদেশে ছিল ঐ প্রদেশের বিদ্রোহীদের দমনের জন্য। চার ভাই কথামত পানপাত্র পরস্পরের হাতে দিল তুলে এবং খুশীর আতিশয্যে পরস্পরকে আলিঙ্গন ও চুমা খেতে শুরু করে দিল। সে যাই হোক, আমার পদতলে নিজেকে লুটিয়ে দিয়ে পারভেয তাঁর বর্ণনাতীত কৃতজ্ঞতা আদায় করেছিল, কিন্তু পারভেয বলল আর একটি জিনিস পূর্ণ হলেই তাদের খুশী পূর্ণ হয়। সে আর তার দুটি ভাই যথাক্রমে চল্লিশ, ত্রিশ ও বিশহাযারী অশ্বের অধিনায়ক। অমন পদমর্যাদা যদি তাঁদের বড় ভাইকেও দেওয়া হয়, তাহলে তাদের সকল দুঃখের অপসারণ ঘটবে। পারভেযের ভ্রাতৃসুলভ আবেদনেরই অবশেষে জয় হল, আমি খসরুকে বিশহাযারী আমীরের পদমর্যাদায় অভিষিক্ত করলাম। এই ক্ষেত্রে আমি না ভেবে পারিনি যে, আমার পর সাম্রাজ্যের দায়ভাগ শাহযাদা খসরুর উপরই বর্তাবে, তৈমুর বংশে এই প্রথা প্রচলিত যে, বড় ছেলে বর্তমানে রাজতখত কনিষ্ঠে বর্তাবে না। ঐ সব ভেবেই তার অপরাধ আমি সম্পূর্ণভাবে মার্জনা করে দিলাম, তার পূর্ব সম্মানে তাকে ভূষিত করলাম, তাকে শিকার ও অন্যান্য আমোদপ্রমোদের জন্য রাজধানী থেকে দশ থেকে বিশ দিনের পথে ঘোরাফেরা করার অনুমতি দিলাম। সুস্থ সমর্থ পুরুষ সন্তানের উপরই শাহী শক্তির স্থায়িত্ব নির্ভরশীল; তার বিপরীত পন্থা সঠিক কর্মপদ্ধতির সঙ্গে খাপ খায় না এবং যে ক্ষমতা আমি পরিচালনা করছি তার কাছে সেটা একেবারেই অযোগ্য।

যে সময়ের কথা আমি উল্লেখ করছি, তখন কাশ্মীরের ফুল ফোটা জাফরানের ক্ষেত দেখার ইচ্ছা আমার মনে জেগে উঠল। গঙ্গা, যমুনায় যে ধরনের নৌকা চলে, তেমন চারশো নৌকা তৈরী করার জন্য আমি নির্দেশ দিয়েছিলাম। আমার ইচ্ছা জলপথে যাওয়া, অন্তত পাহাড়ের পাদদেশ পর্যন্ত। দুমাসের মধ্যেই নৌকা বানান হয়ে গেল। সবগুলিতেই বাহারী পর্দা দেওয়া। কারুকাজ করা। দশ লক্ষ টাকা নূরউদ্দীন কুলী বেগের কাছে আগাম পাঠিয়ে দেওয়া হল, ঝোপঝাড় পরিষ্কার ও নদীর উপর সেতু নির্মাণের জন্য, প্রয়োজন মত শাহী সৈন্যদলের চলাচল সুগম করার উদ্দেশ্যে।

বেশ কয়েক মাস নিরবচ্ছিন্নভাবে আগ্রাতে আমি থেকেছিলাম। সেখান থেকে দিল্লীর পথে যমুনা ধরে উজান বেয়ে একদিনের পথ যাওয়ার পর, চর এসে বার্তা

জানাল মগধের রাজা বন্দুকধারী দুলক্ষ সৈন্য নিয়ে সমুদ্রপথে বাঙ্গালায় এসে অপ্রত্যাশিত ভাবে হামলা করেছে কাসেম খানকে। কাসেম খান ঐ প্রদেশে আমার পুত্র সুলতান বখতের সেনাপতি হিসাবে অধিষ্ঠিত। খবরে আরও জানা গেল দুশমনদের সঙ্গে বজরা বোঝাই দুর্ধর্ষ গোলন্দাজবাহিনী ও বেসুমার গোলাবারুদ আছে। অতর্কিতে কাসেম খানের উপর অমন দুর্ধর্ষ বাহিনী এসে আক্রমণ চালিয়েছে। মঘদের রাজা তাকে চারধার থেকে ঘিরে ধরেছে, ঐ রাজা আগেই ধরে নিয়েছে কাসেম খান নৌপথে ও স্থলপথে সৈন্য জমায়েত করার প্রয়াস পাবে। শরীরের চার জায়গায় ভয়ংকর ভাবে আঘাত পেয়ে কাসেম খান যুদ্ধে হেরে গেছে এবং সেনাবাহিনীকে তাদের ভাগ্যের হাতে ছেড়ে দিতে সে বাধ্য হয়েছে। সে অবশ্য প্রদেশের কোন একটি দুর্গ বেষ্টিত শহরে গিয়ে আশ্রয় নিয়েছে, দুশমনের হাতে ঐ শহর ছেড়ে দিতে সে কিছুতেই রাযী নয়।

ঐ দু:সংবাদ শোনার সঙ্গে সঙ্গেই আমি মুকারেব খান, উযীর খান এবং সুজাত খানকে ষাট হাযার উজবেক অশ্বারোহী সহ তিনশো কামান ও বিশ হাযার পদাতিক বারুদীদের নিয়ে কাসেম খানের সাহায্যার্থে অবিলম্বে রওয়ানা হওয়ার জন্য নির্দেশ দিয়েছিলাম। তারা তিনজনই সাতহাযারী পদমর্যাদার অধিকারী এবং বহু রক্তক্ষয়ী যুদ্ধে বিজয়ী। ঐ তিন অধিনায়কদের আমি আরও নির্দেশ দিলাম যে বাংলায় পৌছে তারা যদি দেখে শত্রু বাহিনীর শক্তি তাদের চেয়ে বেশী, তাহলে ঐ খবর যেন দেরি না করে আমার কাছে পৌছে দেয়, তাহলে, পুত্র পারভেয এক লক্ষ অশ্বারোহী নিয়ে তাদের সাহায্যার্থে চলে যাবে।

মালদহে পৌছবার আগেই ঐ তিন সেনানায়ক চরমুখে খবর পেলেন যে, প্রদেশের সব জায়গা থেকে আমীরদের জড়ো করে কাসেম খান এক লক্ষ অশ্বারোহী ও পদাতিক নিয়ে, তারা সবাই আগ্নেয়াস্ত্র সজ্জিত ও যুদ্ধে নিপুণ, শত্রুপক্ষের উপর চারদিক থেকে ঝাঁপিয়ে পড়ে শত্রুপক্ষের ত্রিশ হাযার সৈন্য নিহত করেছেন, বাকী সব পালিয়ে গেছে, তাদের অনুসরণ করছে কাসেম খানের বিজয়ী সৈন্যদল। শত্রুপক্ষের অমন হওয়ার কারণ প্রাথমিক পর্যায়ের যুদ্ধে জয়ী হয়ে তারা মত্ত হয়ে উঠেছিল। কাসেম খান শত্রুপক্ষকে তাদের দেশ পর্যন্ত অনুসরণ করে, পলাতকদের পঞ্চাশ হাযার ছেলেমেয়ে ও সন্তানসন্ততিদের বন্দী করে নিয়ে আসে। পরে ত্রিশ হাযার শত্রু সৈন্যের কর্তিত মস্তিষ্কের সঙ্গে ঐ পঞ্চাশ হাযার বন্দীদের আমার কাছে পাঠিয়ে দেওয়া হয়। অমন সাহসিকতাপূর্ণ কাজের স্বীকৃতি হিসাবে, কাসেম খানের বর্তমান পদমর্যাদার সঙ্গে আরও এক হাযার জুড়ে দিলাম, সেই সঙ্গে তার কাছে উপঢৌকন পাঠালাম কোমরবন্দ, তরবারি, দুর্মূল্য পাথর বসান পাগড়িচূড়া, কারুকাজ করা সাজসহ একটি ঘোড়া এবং একটি হাতী। হাতীটি কেনা হয়েছিল আমার শাহী পিলখানার জন্য। তার দাম পড়েছে কম করেও চার লক্ষ টাকা। তাছাড়া আমার ওয়ার্ডরোব (পোশাকাগার) থেকে তার জন্য এক প্রস্থ পোশাকও পাঠিয়েছিলাম।

কাসেম খানের সাহায্যার্থে যে তিন জনকে পাঠান হয়েছিল, তাদের নির্দেশ

দেওয়া হল সমবেত শক্তি নিয়ে তারা যেন মগধের দেশে প্রবেশ করে। আল্লাহর মহিমা এবং আমার জয়ী শাহী নিয়তির কৃপায় শত্রুপক্ষের শক্তি যে সমূলে বিনষ্ট হবে, সে ব্যাপারে আমার সন্দেহ মাত্র নেই। তাছাড়া, মগধের দেশে যে ভাল জাতের প্রচুর হাতী পাওয়া যায়, একথা সবার জানা। যত হাতী তাদের হাতে পড়বে, অবিলম্বে সেইসব হাতী আমার কাছে পাঠিয়ে দেওয়ার জন্য নির্দেশ দিয়েছিলাম।

আগ্রা ছাড়ার এক মাস পর আমি দিল্লীতে এসে পৌছলাম। এখানে এসে আমি শুনতে পেলাম কনৌজের কিছু বিপথগামী ব্যক্তি বিদ্রোহের ঝাণ্ডা উড়িয়েছে, আমার সরকারের কর্মচারীদের কতক পরগণা থেকে তাড়িয়ে দিয়েছে, বিদ্রোহপ্রবণ ও চক্রান্তমূলক তাদের পরিকল্পনা। আমার দরবারের অন্যতম সাহসী ও কর্মদক্ষ ব্যক্তি আবদুল্লাহ খান। ঐ বিদ্রোহীদের দমনের জন্য আবদুল্লাহ খানকে নিয়োগ করব বলে আমি ঠিক করলাম। তার সৈন্যবাহিনী পরিদর্শন করবার সময় দেখা গেল তার বাহিনীতে অভিযানে অংশ নেয়ার মত কোন হাতী নেই। তার দরুন তাকে আমি পাঁচটি বড় হাতী উপঢৌকন দিলাম। সেই সঙ্গে আরও দিলাম ইরাকের ভাল জাতের তিনটি ঘোড়া, দ্রুতগামী তিন হাযার উট এবং দশ লক্ষ টাকা। এই সবকিছু তাকে দেওয়া হল যথোপযুক্ত সাজসরঞ্জামের ব্যবস্থা সে যেন করতে পারে এবং বিদ্রোহীদের বিরুদ্ধে দৃঢ়পণ হয়ে যে যেন এগুতে পারে।

অভিজ্ঞতালব্ধ বাণীর উপদেশ হচ্ছে যখন কাজের সময় তোমার সেনাপতিদের বিপদের মুখে ঠেলে দেও, তখন তাদেরকে তোমার দাক্ষিণ্যের নমুনা হিসাবে সোনা, ঘোড়া ও অন্যান্য জিনিসপত্র দিয়ে দিও, যাতে রাষ্ট্রীয় কার্য সাহস নিষ্ঠার সঙ্গে তারা সম্পন্ন করতে পারে, তাদের প্রেরণা যোগাতে কোনকিছুর যাতে অভাব না হয়। প্রায় ক্ষেত্রে দেখা যায় সরকারী কর্মচারীরা তাদের ইক্তিয়ারভুক্ত এলাকার সম্পদ বিলাস ও অমিতব্যয়িতায় নষ্ট করে এবং সেইজন্য, বিপদের মুহূর্ত যখন আসে তারা নিজেদের ও তাদের কর্তব্য দুইই বিস্মৃত হয়। সেই বিপদ মুহূর্তে আমিও যদি আমার দাক্ষিণ্য থেকে বিচ্যুত হই তাহলে হাযারও রকমের দুর্ভোগের শিকার হবে প্রজাসাধারণ, যাদেরকে দুর্ভাগ্যবশত ঐ সব কর্মচারীদের হাতে অর্পণ করেছি, সব রকমের কুশাসন ও অরাজকতা সহ্যের বাইরে চলে যাবে এবং রোয কিয়ামতের দিনে কী ভীষণ দায়িত্ব ভার আমার ঘাড়ে চাপবে। সেইজন্য বিপদকাল দেখা দিলে একটিমাত্র পথ খোলা থাকে–সেটি হচ্ছে ধনরত্ন বিতরণ করে দেওয়া, তাতে পুরা ভাণ্ডারও যদি লাগে, লাগুক।

ফের যখন আবদুল্লাহ খান আমার সাথে দেখা করল, সে অনুরোধ জানাল তার ভাইকে যেন তার সঙ্গে যোগ দেওয়ার অনুমতি আমি প্রদান করি। তার যুক্তি হচ্ছে যদি শত্রুপক্ষ বহুগুণ শক্তিশালী সৈন্য নিয়ে আক্রমণ করে এবং পরাজয়ের হাত থেকে যদি রক্ষা পেতে হয়, সেক্ষেত্রে অমন ঘনিষ্ঠ একজন আত্মজনের সমর্থনের গুরুত্ব অনেকখানি। তার ভাই তিনহাযারী মনসবদার। অমন যুক্তিনিষ্ঠ অনুরোধ উপেক্ষা করা সম্ভব নয়। যে সেনাবাহিনীর নেতৃত্ব তাকে দেওয়া হল তা

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

এখন দাঁড়াল গিয়ে ত্রিশ হাযার অশ্বারোহীতে, চতুরঙ্গ শ্রেণীর এবং দশ হাযার উষ্ট্রারোহী গোলন্দাজে।

আবদুল্লাহ খান বিদ্রোহীদের মুখোমুখি এসে দাঁড়াল। এক লক্ষের কিছু কম সব রকমের অশ্ব ও পদাতিক বাহিনী নিয়ে, দৃঢ় সংকল্প হয়ে সে যুদ্ধের জন্য প্রস্তুত হল। অগ্রগামী বাহিনী হাওই ও গোলা ছোড়া আরম্ভ করল। আবদুল্লাহ তার ভাইকে বলল অপ্রত্যাশিত কোন জায়গা থেকে আক্রমণ করবার জন্য। তারপর তার নিজের বাহিনী নিয়ে ভীষণ বেগে গিয়ে ঝাঁপিয়ে পড়ল শত্রুর সম্মুখে। এই যুদ্ধে বিশ হাযার বিদ্রোহী নিহত হয়েছিল। বাদবাকী ভয়ে যুদ্ধক্ষেত্র থেকে পালিয়ে গিয়ে সম্ভবত তাদের দুর্গ কনৌজে আশ্রয় নিয়েছিল। দুর্গের প্রাচীর ও মিনার থেকে তারা গোলাবারুদ ছুঁড়তে লাগল আবদুল্লাহ খানের বাহিনীর উপর। শত্রুপক্ষের ঐ গোলাগুলি উপেক্ষা করে, আবদুল্লাহ খান সাহস ও উপস্থিত বুদ্ধি নিয়ে দৃঢ় সংকল্প তাদের, একজন মারা গেলে অন্য জন এসে তার জায়গায় আসে, ফলে প্রধান তোরণ তারা দখল করে নিতে সক্ষম হল। আত্মরক্ষা করতে গিয়ে আরও দশ হাযার বিদ্রোহী নিহত হল, তাদের সেনাপতি জ্যান্ত ধরা পড়ল আবদুল্লাহ খানের হাতে।

বিদ্রোহী নায়কের মুকুটে যে হীরা জহরৎ ছিল তার মূল্য দশ লক্ষ টাকা। ঐ মুকুট, বর্শাবিদ্ধ দশ হাযার বিদ্রোহীদের মস্তক এবং তাদের যে সব সেনানায়কদের জীবিত অবস্থায় বন্দী করা হয়েছিল তাদের শুদ্ধ আমার কাছে পাঠিয়ে দেওয়া হয়েছিল। আবদুল্লাহ খান পদানত জেলা সমূহের কর্তৃত্ব ভার নিয়ে থেকে গেল। তাদের সম্রাট ও উপকারীর প্রতি অমন বিদ্রোহ ও কৃতঘ্নতা রোধ করার উদ্দেশ্যে, কনৌজ রক্ষা করতে গিয়ে যে সব বিদ্রোহী নিহত হয়েছিল তাদের মৃতদেহ চারপাশের সড়কে মাথা নীচের দিকে দিয়ে গাছে গাছে ঝুলিয়ে রাখার জন্য আমি নির্দেশ দিয়েছিলাম। নিহতদের সংখ্যা হবে দশ হাযার। এখানে আমি দুঃখের সঙ্গে না বলে পারছি না যে, থেকে থেকে রক্তাক্ত হত্যাকাণ্ড সত্ত্বেও হিন্দুস্তানের বিদ্রোহ প্রবণ লোকের সংখ্যা যেন কিছুতেই শেষ হয়ে আসে না। পিতার অথবা আমার আমলে সাম্রাজ্যের এমন কোন প্রদেশ নেই, যেখানে যুদ্ধে কিংবা জল্লাদের তরবারিতে পাঁচ থেকে ছ হাযার লোককে বিভিন্ন সময়ে বিদ্রোহের দরুন হত্যা করা হয়নি; কিন্তু কোন না কোন জায়গা থেকে অভিশপ্ত দুর্বৃত্ত মাথা চাড়া দিয়ে উঠে, বিদ্রোহের পতাকা উড়িয়ে দেয়, সেই কারণে হিন্দুস্তানে কখনও সম্পূর্ণ শান্তি দেখা দেয়নি।

যে সময়ের কথা আমি বলছি, তখন আমি লস্কর খানকে আগ্রার শাসনভার অর্পণ করেছিলাম। দুর্গ এবং ঐ শহরে ফেলে আসা হারেমের তদারকের ভার তার উপর ছিল। তার জামাতার নাম বাবা নীরাট। সাহসী লোক সে, অনেকবারই সে তার শৌর্যবীর্যের পরিচয় দিয়েছে। বিশেষ করে কাবুল সীমান্তে, যেখানে সে শরীরের দশ জায়গায় আঘাত পেয়েছিল। অবশ্য চল্লিশজন দুশমনের মাথা কেটে ফেলতে সে কসুর করেনি। তাকে আমি এখন আগ্রার কোতওয়ালের পদে মনোনয়ন করলাম।

এবারে, শহর ছেড়ে আসবার সময়, যমুনায় আমার সঙ্গে বজরাতে আমার হারেমের চারশো অন্তঃপুরিকা ছিল। কখনও কখনও কোন জায়গায় এসে বজরা ভিড়াতাম, যেখানে পশু ও পাখিতে ভরা এবং শিকার করে আনন্দে দিন কাটাতাম। আমাদের সঙ্গের সেনাবাহিনী সমান্তরাল ভাবে এগিয়ে চলেছিল কাশ্মীর অভিমুখে–নদীর পাড়ি থেকে তিন ফারসাঙ্গ দূরত্ব দিয়ে।

যমুনা দিয়ে উজান বেয়ে আমরা এসে পৌছলাম মথুরায়। মথুরা হিন্দুদের পবিত্র তীর্থভূমি। আমার কানে এসে পৌছল কুড়ি বছর ধরে কাছেই এক দরবেশ বাস করছেন। আরও শুনলাম সারা বছরের প্রতি শুক্রবার সন্ধ্যায় তাঁর মাথায় দুই মিসকাল পরিমাণ সোনার আশরফি বৃষ্টি হয়। যে আশরফি বৃষ্টি হয় তার মোট সংখ্যা পাঁচশো। এই অলৌকিকতা সঙ্গে সঙ্গে আমি বিশ্বাস করতে পারলাম না। তার সত্যাসত্য নির্ধারণের জন্য আমি দরবেশের সঙ্গে সাক্ষাৎ করতে রওয়ানা হলাম। তাঁর খানকায় এসে দেখি চর্মপরিহিত চারশো শিষ্য পরিবৃত হয়ে তিনি বসে আছেন। সেই শিষ্যদের একজন আগেই আমার আগমনবার্তা জানিয়েছিল। তাঁর খানকায় প্রবেশ করে দেখি সেটি একটি গুহা বিশেষ। তিনি নড়লেন চড়লেন না, আমাকে প্রথামত অভিবাদন করলেন না, বিনতি জানানোর কোন প্রয়াসই দেখালো না। তাঁকে সালাম জানিয়ে আমি আমার বিনম্র শ্রদ্ধা জ্ঞাপন করলাম। আমি বিনীতভাবে তাঁকে আলোচনায় প্রবৃত্ত করার প্রয়াস পেয়েছিলাম। অবশেষে তিনি মুখ খুলতে রাযী হলেন। তাঁর প্রথম বাক্য হচ্ছে, 'আমি সেই রাজার সেবা করি, যিনি জগতব্যাপী আপনার মত বহু রাজাকে প্রতিপালন করেন।' তাঁর এই মন্তব্য শুনার পর তাঁকে আমি অনুরোধ জানালাম কিছু বলতে যা শুনে জ্ঞানীদের বচন আমার মনে পড়ে যায়। আপনার হাতে আল্লাহর সৃষ্ট যে সব জীবের ভার আছে তাদের শান্তি ও নিরাপত্তার জন্য কাজ করে চলুন। তিনি বলে উঠলেন, আরাম বিনোদ পরিহার করুন, আপনার গুনাহকে ঐ গুণই ঢেকে দেবে। ক্রোধপরায়ণ হবেন না। আপনার সাম্রাজ্যের বিভিন্ন প্রদেশের শাসনকল্পে যাদের নিয়োগ করবেন, তাদের ভিতর যারা যালিম ও লুণ্ঠক, তাদের বাদ দেবেন। যতক্ষণ ক্ষমতা আছে, যারা বৃদ্ধ ও যাঁরা দরবেশ তাঁদের শ্রদ্ধা করবেন। তারপর তিনি ছ লাইনের একটি কবিতা আবৃত্তি করলেন। তার অন্তঃসার এই, 'দুঃখের ভারে যে সব বৃদ্ধ নুয়ে পড়েছে তাদের ঘৃণা করবেন না। ভগ্ন-হৃদয় যাদের তাদের শোকাগ্নি ফের প্রজ্জ্বলিত করবেন না। এক সময় চপল, অন্য সময় গম্ভীর হবেন না। হাল্কা কথাবার্তা বলবেন না। মনে খারাপ চিন্তার প্রশ্রয় দেবেন না, পাছে আপনার কথাবার্তা খারাপ হয়ে উঠে। ভৎর্সনার হাত যদি এড়াতে চান; তাহলে পরচর্চায় মত্ত হবেন না। আবৃত্তি শেষ হলে পর তিনি বলে উঠলেন, আপনার জ্যেষ্ঠ পুত্রের প্রতি আপনার ব্যবহার ভাল করুন। কারণ সে আপনার উত্তরাধিকারী হবে[৬১]।'

---

৬১. দরবেশের ভবিষ্যদ্বাণী অসত্য বলে প্রমাণিত হয়েছে। জ্যেষ্ঠ পুত্র খসরু নয়, মধ্যম পুত্র খুররম জাহাঙ্গীরের পর সিংহাসন লাভ করেছিলেন।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

এক ঘণ্টার মধ্যেই রাত নেমে এল। জনৈক শিষ্য গেল আযান দিতে। গুটি কয়েক মোমবাতি জ্বালান হল। শ্রদ্ধেয় দরবেশ গেলেন নামায পড়তে। আটবার সেজদার মাধ্যমে তিনি নামায শেষ করলেন। তারপর পাঁচজন প্রধান শিষ্য প্রবেশ করে দরবেশের সামনে সোজা হয়ে দাঁড়ালেন। দরবেশ আকাশ পানে হাত তুললেন, হাত তোলার সঙ্গে সঙ্গেই আকাশ থেকে স্বর্ণবৃষ্টি শুরু হল, ঝরতে লাগল তাঁর মাথার উপর, সেগুলি সংগ্রহ করা হলে পর দেখা গেল তার পরিমাণ সাতশো আশরফি। এই আশরফি সমান দুই ভাগে তিনি ভাগ করলেন। এক ভাগ তিনি উপঢৌকন হিসাবে আমাকে দিলেন এই বলে যে আমার কোষাগারের বৃদ্ধির জন্য ঐ আশীবাদপুত আশরফি আমি যেন রাজস্ব বিভাগের কর্মচারীদের মধ্যে বিতরণ করে দিই। অন্য ভাগ তিনি অন্যান্য উপস্থিত দরবেশদের সঙ্গে ভাগ করে নিলেন। সবকিছুই আমি মনোযোগের সঙ্গে লক্ষ করেছিলাম। তাই আমি দরবেশকে না বলে পারলাম না, তাঁর সহচর দরবেশদের খাওয়াপরার দরুন তাঁকে খানকা সন্নিহিত গ্রামটি আমি দান করতে চাই। ঐ গ্রামটির বার্ষিক খাজনা পঞ্চাশ হাযার টাকা। তিনি বললেন, 'যারা মানুষের দয়ার উপর বেঁচে আছে তাদেরকে ঐ টাকা দিয়ে দিন। আমার অর্থের দরকার নাই কারণ ইহলোকের কোনকিছুই আমার কাম্য বস্তু নয়[৬২]।'

এই প্রসঙ্গে কথা আর না বাড়িয়ে আমি দরবেশের কাছ থেকে বিদায় নিয়ে চলে এলাম। গুহা ছাড়িয়ে অল্প দূর আসার পর আমার মনে হল বিদায় নেওয়ার সময় তাঁর হস্তচুম্বন করে আসা আমার উচিত ছিল যেইমাত্র আমার মনে ঐ কথা ভেসে উঠল, তখনই দরবেশের জনৈক প্রধান সহচর কাছে এসে দরবেশের সালাম জানালেন এবং বললেন দরবেশ আমার ভাবনার বিষয় অবগত আছেন, তিনি ঐ দান গ্রহণ করেছেন এবং এতদূর চলে আসার পর ফিরে যাওয়া আমার পক্ষে শুভ নয়। দরবেশের আর একটি মাত্র অনুরোধ জানাবার আছে, তার জন্য তাঁর পরিচিত জনৈক দরবেশ যিনি দিল্লিতে বাস করেন তাঁকে যেন আমি রক্ষণাবেক্ষণ করে চলি। মানুষের মনের কথা জানবার ক্ষমতার পরিচয় পেয়ে তাঁর বুজর্গীতে আমার শ্রদ্ধা গেল সহস্রগুণ বেড়ে। আমি দরবেশের খানকার দিকে ফিরে মাটিতে উপুড় হয়ে শুয়ে তাঁর পুণ্য চরিত্রের কাছে ভবিষ্যতের জন্য সাহায্য প্রার্থনা করলাম।

আর একটি ঘটনা উল্লেখ করেই আমি এই প্রসঙ্গে ইতি টানব। দরবেশের খানকা ছেড়ে শাহী শিবিরে ফিরে এলে পর আমাকে জানান হল, খান দুরানের পুত্র ঐ উপলক্ষে আমার আচরণ নিয়ে ঠাট্টা করার সাহস পেয়েছে। সে বলেছে, 'সম্রাটের কি ছেলেমানুষী ঐ ভণ্ড দরবেশের কথায় মোহমুগ্ধ হয়ে গেছেন। আমার এখানে বলে রাখা ভাল মনের গহনে প্রবেশ করবার ক্ষমতার প্রমাণ আমি যদি না পেতাম, তাহলে শুধুমাত্র স্বর্ণবৃষ্টি আমার কাছে বিশ্বাসযোগ্য বলে বোধ হত না;

---

৬২. এই অনুচ্ছেদটি অনুমান নির্ভর। পাণ্ডুলিপির পাঠোদ্ধার সম্ভব নয়? কেননা বহু জায়গায় মতই এখানকার লিপি দুর্বোধ্য।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

কিন্তু যে অসম্মানজনক উক্তি ঐ ব্যক্তি করেছে তা উপেক্ষা করার নয়। তার দরুন আমি নির্দেশ দিলাম তার মাথা ও মুখের একদিকের চামড়া তুলে দিয়ে সারা শিবির ঘোরাবার জন্য, সেইসঙ্গে একথাও ঘোষণা করে দিতে যে, সম্রাটের প্রতি যিনি তাদের প্রতিপালক, অসম্মানজনক ভাষা ব্যবহার করার এমনি শাস্তি। আমার কঠোরতা বৃদ্ধির কারণ খানে দুরানের এই পুত্রই আগে একবার দরবেশের সঙ্গে দেখা করতে গিয়ে বড় অভদ্রজনোচিত ব্যবহার করেছিল। দরবেশ ঐ ব্যবহারে ক্ষুব্ধ হয়ে বলেছিলেন যে তার যেন মাথা কাটা যায়, একথা তিনি বলবেন না, কারণ তার বয়সোচিত ঔদ্ধত্য তাঁর নযরের বাইরে; কিন্তু, তোমার মাথা কামিয়ে ফেলা হবে দরবেশ এই কথা বলেছিলেন। দরবেশের কথা এইভাবে অক্ষরে অক্ষরে ফলে গেল। সত্যি কথা বলতে কি, অমন ব্যক্তিরাই সবসময়ই আমাদের সম্মানের পাত্র, যদিও পূণ্যাত্মা ব্যক্তিগণ ফেরেশতা নন; তবে তাঁরা ফেরেশতা থেকে কমও কিছু নয়।

মথুরায় পুত্র পারভেয শাহী সেনাবাহিনী থেকে আলাদা হয়ে আমার নির্দেশে এলাহাবাদে তাঁর কর্মস্থল অভিমুখে রওয়ানা হয়ে গেল। প্রথমত অন্যান্যদের ক্ষেত্রে যেমন হয়েছে, তাঁকেও তেমনি দুহাযারী পদে অভিষিক্ত করা হয়েছিল; কিন্তু পরে চূড়ান্তভাবে তাঁকে আমি বিশহাযারী মনসবদারীতে উন্নীত করে দিয়েছিলাম। এখানে একথার উল্লেখ করা সঙ্গত যে, তার উপস্থিতিতে কিংবা অনুপস্থিতিতে, কোন সময়ই তার কাছ থেকে এমন কোন ব্যবহার পাইনি যা আমার বিরক্তি ও ক্রোধের উদ্রেক করতে পারে। সেইজন্যই আমি একান্তভাবে কামনা করি যে জীবনের যে কোন ক্ষেত্রে তার ইচ্ছা যেন পূর্ণ হয়। ছোট্টখাট একটি ব্যতিক্রমের উল্লেখ হয়ত আমি করতে পারি। এবারে বিদায় নিয়ে চলে যাওয়ার কিছু পরে সে আমার কাছে অভিযোগ করে পাঠাল, পূর্ববর্ণিত সেই সেনাপতি আবদুল্লাহ খানের শিবির থেকে দুই মঞ্জিলের দূরত্বের মধ্য সে আসা সত্ত্বেও আবদুল্লাহ খান তার সঙ্গে দেখা করে বিনতি জানাতে আসেনি, যে বিনতিতে আমার পুত্র হিসাবে তার অধিকার আছে বলে সে মনে করে। তাকে আমি জবাবে জানালাম, তাঁর শুদ্ধ অহংকার চরিতার্থের জন্য আবদুল্লাহ খান যে দেখা করতে আসেনি, তা আমার নির্দেশ মুতাবেকই এবং তার আচরণ কর্তব্যপরায়ণ প্রজাসুলভের ন্যায়ই হয়েছে : কারণ আবদুল্লাহ খান যদি তার অন্যায় করত, তাহলে তার প্রগলভ ও নিবুদ্ধিকর আচরণের প্রায়শ্চিত্ত হিসাবে ত্রিশটি বছর গোয়ালিয়রের দুর্গে বন্দী থাকতে হত। অন্যপক্ষে, একথা আমি উল্লেখ না করে পারছি না, যতই কেন শাহযাদা পারভেজ মনক্ষুণ্ন হোক না, তার শিশুসুলভ অহংকার তৃপ্তির জন্য আর আবদুল্লাহ খানের অভিযানে সামান্যতম দেরি আদৌ কোন যুক্তিসঙ্গত প্রশ্ন নয়। আবদুল্লাহ খানের আচরণ যথার্থই হয়েছে।

দিল্লীর উপকণ্ঠে আমি যখন ছিলাম, সেখানকার লোকজন আমাকে বলল এক ধরনের পাখি এখানে পাওয়া যায়, যার লেজ দেখতে সুন্দর, যার গোশত খেতে অত্যন্ত সুস্বাদু। কিন্তু বিশেষ করে একটি ব্যাপার আমার দৃষ্টি আকষণ করল। সেটি হচ্ছে পাখিরা যে ভাষায় কথা বলে সেটি শুধু কাশ্মীরিদেরই জানা আছে।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

তারা শিষ দিয়ে ডেকে পাখিদের ধরে থাকে। অমন করে হাযার হাযার পাখি তারা ধরে। কাছেই এক সমতলভূমি, সেখানে ঝাঁকে ঝাঁকে হাযার হাযার ঐ পাখি উড়ে আসে। পরীক্ষা করবার জন্য প্রায় হাযার খানেক কাশ্মীরীদের, যারা ঔই বিদ্যায় পটু, তাদের লাগিয়ে দিলাম ঐ নৈপুণ্য প্রদর্শনের জন্য। আমি নিজেও এসে উপস্থিত হলাম দেখার জন্য। যেমন বলা হয়েছে, তেমনি জনবিশেক কাশ্মীরী একত্র হল, তুলল গুঞ্জনধ্বনী, ঐ ধ্বনি শুনে পাখিদের ভেতর সাড়া জাগল, তারা আস্তে আস্তে মানুষের নাগালের ভেতর চলে এল ঝাঁকশুদ্ধই ধরা পড়ল। একথা ভেবে আমার খারাপ লাগল নিরীহ ঐ পাখির দল অমন প্রতারণার শিকার হয়েছে, তারা সুরের প্রেমিক বলেই তাদের ঘাতকদের শিকারে পরিণত হয়েছে এবং আমিও হয়ত অলস কৌতূহলে তাদের জবাই করার হুকুম দেব। পরদিন, তার দরুন, যে বিশ হাযার পাখি ধরা হয়েছিল, তাদের আমি দিলাম ছেড়ে। ব্যাপারটার সত্যতা এই ঘটনা থেকেই বোঝা গেল। এর পরে পাখিগুলিকে জবাই করা আমার পক্ষে হৃদয়হীনতার কাজ হত।

শিরহিন্দে পৌঁছে আমি খাজা ওয়াসীর বাগান দেখতে বেরিয়েছিলাম। বাগানটি আমার নির্দেশে কিছুদিন আগে বানান হয়েছিল। খাজা ওয়াসী দক্ষ স্থপতি। বাগান করায়ও তার দক্ষতা কম নয়। তিনি এক্ষেত্রে যে বাগান তৈরী করেছেন, তার সুন্দর রচনা সত্যি আমাকে আনন্দিত করেছে। বিশেষ করে একটি ব্যাপার আমি উল্লেখ করব। বাগানে ঢুকেই আমি দেখলাম একটি ছায়াবীথিকায় হাযির হয়েছি, ঐ বীথির দুপাশে রক্ত গোলাপের গাছ, দূরে সাইপ্রেস, ফার, পাইনের চিরসবুজ মেলা; কিন্তু যা প্রায় অবিশ্বাস্য তা হল এই সবকিছুই চল্লিশ দিনের মধ্যে বানান হয়েছে। এইসব পেরিয়ে আমরা এসে পৌঁছলাম মূল বাগানে, বিচিত্র ফুলের সারি নানা রঙে রঙীন। এই বিচিত্র ফুলের সারির মধ্যে, সুন্দর এক ফোয়ারা, ফোয়ারার কেন্দ্রে বিশাল ও সুউচ্চ এক প্যাভিলিয়ন, বসবার কক্ষ আছে, সেখানে দুশো লোক স্বচ্ছন্দে বসতে পারে, চারপাশ ঘিরে সুন্দর স্তম্ভসারি। প্যাভিলিয়নটি দু-তলা সমান উঁচু, নয়নসুখকর ছবিতে শোভিত। ফোয়ারাটি পাথর কুঁদে তৈরী, তাতে প্রায় দুহাযার জলপায়রা উড়ে উড়ে বেড়াচ্ছে। নানা জাতের ফুল ও কুঞ্জ চারদিকে ফুটে আছে, সে দৃশ্য যেমন নয়নসুখকর, তেমনি ফুলের গন্ধে আচ্ছন্ন হতে হয়। তার কাজে খুশী হয়ে আমি খাজা ওয়াসীকে ঐ জায়গাতেই সাতশো থেকে একহাযারী মনসবদারীতে উন্নীত করে দিয়েছিলাম।

বাগান পরিদর্শন করার পরের দিন একটি ঘটনা ঘটেছিল যা আমার দৃষ্টি এড়াল না। বলা হল শিরহিন্দের সুবাদার একটি দরখাস্ত আমার কাছে পেশ করবার জন্য উদগ্রীব হয়ে আছে। আমি তাই তাকে ডেকে আনার জন্য নির্দেশ দিয়েছিলাম। দরখাস্তে উল্লেখ করা হয়েছে এই সুবাদার মুসলিমদের সম্পত্তিতে হস্তক্ষেপ করার কোন ইচ্ছা পোষণ করে না; বরং তার উদ্দেশ্য সমৃদ্ধশালী হিন্দুদের উপর ন্যায়সঙ্গত কর ধার্য করার। তার দরুন আমি যদি তার মতানুযায়ী একটি ফরমান জারী করি, তাহলে শাহী কোষাগারে যাকাতের কর যাতে সঞ্চিত

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

হতে পারে তার ব্যবস্থা সে করবে, যেমন আমার পিতা আকবরের আমলে ছিল, দিনে তিন মন সোনা সে কর থেকে পাওয়া যেত। তাছাড়া তিন বছরের আগাম সে দিতে রাযী, আগামের পরিমাণ কম করেও তের শত মন সোনা। এই প্রসঙ্গে তার যা বক্তব্য আমি মনোযোগের সঙ্গে সব শোনার পর তাকে ফিরে গিয়ে টাকা নিয়ে আসার নির্দেশ দিলাম, যে কাজের জন্য সে অমন ত্যাগ করতে পারে সেই কাজের ভার তাকে দেবার জন্য। সুবাদারটি শিরহিন্দের সবচেয়ে ধনী বাশিন্দা। সে আমার কাছ থেকে গেল চলে। খানিকক্ষণ বাদে সে ফিরে এল, সঙ্গে সোনা, পাঁচশো উটের উপর বোঝাই করা, প্রতিটি মোট ইরাকের সবচেয়ে ভাল লাল সালুতে মোড়ান। যারা উপস্থিত ছিল তাদের ভেতর দশটি বোঝা বিতরণ করে দেওয়ার নির্দেশ দিলাম। বাকী মোট খাজাঞ্চীখানায় থাকবে। তারপরে ঐ সুবাদারকে চলে যেতে বললাম তখনকার মত, পরের দিন তাকে আসতে বললাম, তখন তাকে নিয়োগপত্র দেওয়া হবে।

পরদিন ভোর বেলা। সূর্য তখনও ভাল করে উঠেনি। সুবাদারটি জমকাল পোশাক পরে, আশায় উদ্দীপ্ত হয়ে আমার কাছে বিনতি জানাতে এল নিয়োগপত্রের জন্য। তার গলায় মুক্তার একটি মালা, তার দাম এক লক্ষ টাকা। আমি জানতে চাইলাম, যে সোনা সে দিয়েছে তার চাকরির বাবদ, সে কি তার নিজের সম্পত্তি, না তার অংশ বিশেষ অন্যান্য হিন্দুদের? তার চাকরির লাভে অন্যান্য হিন্দুদের ভাগ আছে কিনা? জবাবে সে বলল, তার পিতা মৃত্যুশয্যায় তাকে বলেছিল কোন একটি বিশেষ জায়গায় মাটির নীচে কলসীতে ভরা ধনরত্ন লুকান আছে। অসুবিধায় পড়লে ঐ ধনরত্ন সে যেন কাজে লাগায়। সে তাই বলল, 'হুজুর আমার চাকরির জন্য আপনার কোষাগারে যে অর্থ দিয়েছি তার দ্বিগুণ এখনও আছে ভূগর্ভস্থ কক্ষে। সেই কারণেই টাকা ধার করার কথা উঠতেই পারে না। তার কথায় বিশ্বাস করতে না পেরে স্পষ্টই তাকে বললাম যে সে মিছে কথা বলছে। তবে যদি সত্য কথা বলে থাকে তাহলে ঐ জায়গা যেখানে ধনরত্ন লুকান আমার বখশী সাদেক মুহম্মদ খানকে দেখাতে আপত্তি করা উচিত নয়। কোন দ্বিধা না করেই সে চলে গেল সাদেক মুহম্মদকে নিয়ে যেখানে ঐ বিশাল ঐশ্বর্য লুকান। জায়গা দেখানোর পালা সাঙ্গ করে তারা দুজনই এল ফিরে। আমি ভাবলাম স্বেচ্ছায় যে অর্থ সে আমাকে দিয়েছে তা আমি রাখতে পারি; কিন্তু তার বাড়িতে যে অর্থ লুকান, সে যদি কেড়ে নেই তাহলে অনর্থক অন্যায় হবে, বিশেষ করে তার সন্তানসন্ততি ক্ষতিগ্রস্ত হবে।

এই পরিস্থিতিতে একটি উট নিয়ে আসার জন্য নির্দেশ দিলাম এবং ডেকে পাঠালাম নূর উদ্দীন কুলীকে। তাকে আমি বললাম, হিন্দুর পরনের পোশাক ও গলার মুক্তার মালা, সবই তার। তবে তাকে এই হতভাগা লোকটাকে শহরের বাইরে নিয়ে গিয়ে পেট কেটে ফেলতে হবে, তারপর উটের পাশে বেঁধে সারা শিবির ঘুরিয়ে বেড়াতে হবে। এই মর্মে একটি ঘোষণা জারী করা হল, লোকটার অমন শাস্তির কারণ, সম্রাট তাঁর প্রজাসাধারণের কল্যাণের জন্য চৌদ্দ বছর ধরে যাকাত মাপ করে দিয়েছেন, সেই কর পুনঃ ধার্য করবার প্ররোচনা ঐ ব্যক্তি দিয়েছে এবং এভাবেই

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

প্রজার হিতাকাঙ্ক্ষী প্রতিপালকের চরিত্রে অত্যাচারীর স্পর্শ আসার প্রয়াস পেয়েছে। এ শাস্তি যেন তাদের কাছে উদাহরণস্বরূপ হয় এবং তাদের বাধা দেয় যারা সম্রাটকে কুমন্ত্রণা দিতে চায়, যার ফলে প্রজার অকল্যাণ ও সম্রাটের অবমাননা হতে পারে।

এ অবশ্য সৌভাগ্যই বলতে হবে যে, আজকের দিনে নিজেদের সুবিধার্থে সম্রাটকে অপরাধ ও দায়িত্বের ভারে বিজড়িত করার মত লোকের দেখা কমই মেলে। সম্রাটের কাছ থেকে সেই মহাবিচারের দিনে সবকিছুর হিসাব নিকাশ নেওয়া হবে। স্বর্ণ, ধনরত্ন অথবা কি এমন সম্পত্তি আমি হারিয়েছি যার জন্য পরিশ্রমী বণিকের আয়ে ভাগ বসাব–হাযারও অসুবিধা এবং দূর দূর ভ্রমণের দরুন যে আয়ের সঞ্চয়ন ঘটেছে? অমন ভীষণ অন্যায় কি আল্লাহ শাস্তিবিহনে ছেড়ে দেবেন? প্রবাদে আছে : পাপপূণ্য আল্লাহর কাছে ছেড়ে দিয়ে তুমি তোমার প্রজার রক্ষক হও।

দুটি জিনিস যা কিনা সেই বিখ্যাত ম্যাসিডনিয়ানও আয়ত্তে আনতে সক্ষম হননি মানবীয় অহঙ্কার পরিত্যাগ কর; এই হচ্ছে জ্ঞানের আলো। তোমার চরিত্রসুলভ জ্ঞানের অনুশীলন কর; পড়ুয়ার জোড়াতালি দেওয়া জ্ঞান নয়। ক্ষণস্থায়ী এই জীবনে নিদ্রাকাতর হয়ো না–তোমার সময়ের সদ্ব্যবহার কর, তোমার স্রষ্টার তাই ইচ্ছে। সাহস ও করুণাযুক্ত মানবিকতাই হচ্ছে বিজ্ঞানের অন্তঃসার। তোমার যদি এই গুণ না থাকে তাহলে মানুষের চেহারা তুমি মূর্তি বৈ কিছু নও। বিজ্ঞানের অনুশাসনের অনুমাত্রও কাজে প্রয়োগ করনি। দর্শন চর্চায় তুমি যদি তোমার কর্তব্য অবহেলা কর, তাহলে তুমি পত্রহীন বৃক্ষশাখা বৈ কিছু নয়। প্রভূত পরিশ্রম ও প্রয়াস করেই মানুষ সম্মানের অধিকারী হয়। তুমি যদি ইন্দ্রিয়ের দাস হও, তাহলে কি করে তুমি পুণ্য চরিত্রের অধিকারী হবে। তুমি যদি চিরন্তন সুখের অভিলাষী হও, তাহলে নিজের গুণের স্বরূপ সম্পর্কে অবহিত হও। এই হচ্ছে আসল গুণ, রূপান্তরের সোনার কাঠি।

নানা আমোদপ্রমোদের মধ্যে এই বাগানে সপ্তাহখানেক কাটিয়ে দেওয়ার পর আমি খাজা ওয়াসীকে ডেকে পাঠালাম। তাকে আমার নিজের একটি পোশাক ও ত্রিশ হাযার টাকা উপঢৌকন দিয়েছিলাম। শিরহিন্দ ছেড়ে তারপর আমি রওয়ানা হলাম কাশ্মীর অভিমুখে। সেখানকার জাফরান ফোটা মাঠ দেখার জন্য আমি ব্যাকুল হয়ে উঠেছি। লাহোর শহরের তিন দিনের দূরত্বের মধ্যে আসার পর পুত্র খুররম আমার কাছে নিবেদন করে পাঠাল তাকে যেন দশ দিনের ছুটি দেওয়া হয় ঐ শহর পরিদর্শনের জন্য। দুবছর হল ঐ শহর সে দেখে এসেছে। শহরের নতুন রূপান্তরের জন্য আমি যে নির্দেশ দিয়েছি, সে অনুসারে বাগান, সৌধমালা তৈরীর কাজ কতদূর এগিয়েছে, তাও জানার তার ইচ্ছা। গিরিপথে প্রবেশ করবার আগেই সে এসে আমার সঙ্গে মিলিত হবে।

অমন আবেদন নামঞ্জুর করার মত আপত্তি আমার তরফ থেকে নেই। তার পরিদর্শন যাতে যথোচিত মর্যাদার সঙ্গে হয় সে ব্যাপারে আমি উৎসুক ছিলাম। তার দরুন শাহাযাদাকে নির্দেশ দেওয়া হল দুশো উটবাহী সাজসজ্জা, কোমরবন্ধ, কিরিচ, তরবারি, উষ্ণীষ, কাচের লণ্ঠন, আয়না এবং অন্যান্য জিনিসপত্র সঙ্গে করে নেওয়ার জন্য সব জিনিসপত্রই মুক্তা ও দুর্লভ পাথরে মিনে করা। ঐ সব জিনিসপত্র লাহোরের

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

কাছাকাছি এলে শহর কোতওয়ালের হাতে সমর্পণ করে দেওয়ার কথা বলা হল। তাছাড়া আমার নিজের সাজসরঞ্জামের মধ্য থেকে এক হাযার উট বহন করতে পারে তেমন সোনার কাজ করা খুরাসানের কাপড়, গুজরাট ও কাসানের ভেলভেট, সূক্ষ্ম টুকরা কাপড় নিতে বলা হল। এগুলি শুদ্ধ কোতওয়ালের হাতে দেবার জন্য। লাহোরের বাশিন্দাদেরও নির্দেশ দেওয়া হল শাহযাদাকে এই উপলক্ষে যে অভর্থ্যনা দেওয়া হচ্ছে তাতে সহযোগিতা করবার জন্য। তাদের নির্দেশ দেওয়া হল রাস্তাঘাট ও বাজার সোনালী কার্পেট এবং চীন ও ইউরোপের রঙ্গীন পর্দা ও শহরের চার ক্রোশ পরিধি জুড়ে সোনালী কাপড়ের চাঁদোয়া দিয়ে সজ্জিত করবার জন্য। চার কি পাঁচ দিন ধরে শহর কোতওয়াল এই সাজসজ্জা প্রস্তুত রাখবে।

লাহোরের প্রবেশ মুখেই আলমগঞ্জ। এখান থেকে সুলতান খুররম হাতীতে চড়ল। তার আগে আগে তিন হাযার হাতী; সব হাতীই সোনালী কাপড় ও ভেলভেটে মোড়া, তাতে ছড়ান মুক্তোচূর্ণ, প্রতি হাতীতে পাঁচ মন হিন্দুস্তানী সোনার কারুকাজ। হাতীর দলের পিছনে ছিল আরব, ইরাক ও বাদাকশানের ভাল জাতের পনের শ ঘোড়া, সব ঘোড়াই দামী সাজে সজ্জিত এবং প্রতি ঘোড়ার জন্য একজন করে সহিস। শাহাযাদার পিছনে থাকল চল্লিশটি হাতী, তাতে কাড়ানাকাড়া এবং তাঁর সামনে আশি জন শিঙ্গা ও পঞ্চাশ জন ড্রামবাদক, তারা তুলল অপূর্ব ঐক্যতান। তাদের ঘিরে চলল বিশ হাযার অশ্বারোহীর ব্যূহ। সব অশ্বারোহীই বর্মে সজ্জিত তাদের বর্শার গোড়া সিল্কে মোড়া এবং তাদের ঘোড়া কারুকাজ করা কাপড়ে মোড়া, অজগর ও বাঘের চামড়া জড়ান, সিন্ধুঘোটকের লেজ ঘোড়ার গলায় ঝোলান। অমন জমকাল মিছিল করে শহরের রাস্তাঘাট ও বাজার দিয়ে তারা চলল। যে পথ দিয়ে শাহাযাদা গেল তার চার ক্রোশের মধ্যে হাতীর হাওদায় ছিল টাকার অসংখ্য থলে, আর শাহাযাদা মাঝে মাঝে ছড়িয়ে যেতে লাগল তাঁর দুপাশে মুঠো মুঠো সোনার ও রূপার আশরফি এবং টাকা তার পরিমাণ হবে দশ লক্ষ রূপার টাকা, যা কিনা ইরাকের ত্রিশ হাযার তোমানের সমান।

অমন জমকাল ভাবে শাহাযাদা খুররম চলল রাভী নদীর পাড়ির দিকে, সেখানে অসংখ্য তাঁবু খাটান হয়েছে সমারোহের সঙ্গে তাকে অভ্যর্থনা করবার জন্য। সেখানে সে তিন দিন থেকে গেল। গায়ক ও বাদক এবং যারা দেখা করতে গিয়েছিল তাদেরকে সে স্ব স্ব যোগ্যতা অনুযায়ী অকৃপণ ভাবে পুরস্কৃত করেছিল। চতুর্থ দিনে সে লাহোর ছেড়ে আমার কাছে ফেরার জন্য রওয়ানা হল।

লাহোর থেকে হাসান আবদাল[৬৩] যেখানে আমি শিবির গেড়ে বসে আছি তার দুরত্ব পাঁচ দিনের পথ। এই পথটুকু সে একদিন একরাতে অতিক্রম করে, দশ দিনের অনুপস্থিতির পর হাযির হল আমার কাছে। দশ দিনের ছুটি সে পেয়েছিল লাহোর থেকে ঘুরে আসার জন্য। এবারে সে যখন কুর্ণিশ করে দাঁড়াল, তার উপঢৌকনের

---

৬৩. হাসান আবদাল কালানুর থেকে পশ্চিমে বেশ দূরে। সম্রাট জাহাঙ্গীর নিশ্চয়ই পথ ছেড়ে বহু দূর চলে গিয়েছিলেন। পরে কালানুরে ফিরে এসেছিলেন। কালানুর থেকে বেম্বার গিরিপথের দিকে সোজা সড়ক গেছে।

পরিমাণ হল কুড়ি লক্ষ টাকার ধনরত্ন, আরব ও ইরাকের তিনশো ঘোড়া, এক হাযার বার্তাবাহী উট এবং পাঁচটি প্রথম শ্রেণীর হাতী। প্রতিটি হাতীর দাম তিন লক্ষ টাকা। বদলে তাঁর বর্তমান পদমর্যাদা চল্লিশ হাযার থেকে পয়তাল্লিশ হাযারে উত্তীর্ন করে দিয়েছিলাম। হাসান আবদালে আমি থেকেছিলাম সপ্তাহখানেক। সেখানে থাকাকালীন এক ভোজসভায় শাহযাদা খুররমকে আমি উপঢৌকন দিয়েছিলাম এক ছড়া মুক্তার মালা, যে মালা কিনতে খরচ পড়েছে আটচল্লিশ লক্ষ টাকা।

হাসান আবদাল ছেড়ে মার্চ করবার নির্দেশ দিলাম যখন, তখন শুরু হল প্রবল বৃষ্টি। সে বৃষ্টি চলল একটানা তিনদিন তিন রাত। বৃষ্টি থামলে পর আমরা রওয়ানা হলাম কালানুর অভিমুখে। সেখানে নদীতে বন্যা দেখা দিয়েছে বৃষ্টির দরুন, শাহী বাহিনীর চলাচলই দায়। পরদিন আমি নির্দেশ দিলাম সব শ্রেণীর সেনাই হাযির হওয়ার পর আর এগুবে না, বন্যার পানি সরে না যাওয়া পর্যন্ত। তারপর তাদের পক্ষে নির্বিঘ্নে এগনো সম্ভব হবে। তবু যাদের বড় জাতের হস্তী আছে, তারা জিনিসপত্র ও তাদের লোকলশকর অন্যপাড়ে নিয়ে যাওয়ার প্রয়াস পেলো। আর যাদের শক্তিশালী ও তেজী ঘোড়া আছে তারা ভাবনাচিন্তা না করেই ঝাঁপিয়ে পড়ল নদীর বুকে।

এভাবেই মীর্জা রুস্তমের পুত্র, সবে সে শৈশব পেরিয়েছে, তার দশ সহচর সহ ঝাঁপ দিয়ে পড়েছে নদীর বুকে। নদীর পানি সেখানে দুই বর্শা সমান গভীর, আর স্রোত এত তীব্র যে তেজীয়ান হাতী পর্যন্ত যাবে ভেসে। নদীর মাঝখানে ছেলেটি পড়ে গেল ঘোড়া থেকে, স্রোতে নিয়ে চলল তাকে ভাসিয়ে; তার সহচররা চেষ্টার কমতি করল না তাকে সলিলসমাধি থেকে বাঁচাতে, কিন্তু সব প্রয়াসই ব্যর্থ হল, হতভাগা ছেলেটির কোনই খোঁজ পাওয়া গেল না। ছেলেটি সাঁতার জানত না; কিন্তু সাঁতার যদি তার জানাও থাকত, তাহলেও নদীর তীব্র স্রোতের দরুন তার পক্ষে বেঁচে আসা সম্ভব হত না। যে দশ জন তাকে বাঁচার চেষ্টা করেছিল তারা শুদ্ধ গেল হারিয়ে।

ঐ দুঃসংবাদ শুনে আমি গভীর শোকে অভিভূত হয়েছিলাম। সারারাত আমি খাইনি ঘুমাইনি; ঐ ছেলেটির প্রতি আমার ভালোবাসার সীমা ছিল না। প্রায়ই, হাতীতে চরবার সময় সে আমার সঙ্গে থাকত, আমার সামনে বসত মাহুতের অঙ্কুশ হাতে নিয়ে এবং হাতীটি পরিচালনা করত। বয়সের তুলনায় অনেক বেশী গুণে সে ছিল ভূষিত। ছমাস মাত্র হয়েছে তাকে আমি বিয়ে দিয়েছিলাম ইতমদ্দৌল্লার কন্যার সঙ্গে[৬৪]। জিনিসপত্র শুদ্ধ তাকে পাঁচ মিসকাল আশরফির[৬৫] বিশ লক্ষ আশরফি মূল্যের যৌতুক দিয়েছিলাম। সব দিক থেকেই সে ছিল তার বাবা, ভাই, আত্মীয়স্বজনের বিপরীত। সম্প্রতি তাকে আমি গ্রহণ করেছিলাম নিজের দত্তক পুত্র হিসাবে। কঠোর ভাষায় তার অবিবেচক পিতাকে আমি ভর্ৎসনা করেছিলাম, ছেলেটিকে নদীতে ঝাঁপ দেওয়ার ব্যাপারে বারণ না করবার জন্য,

---

৬৪. খুব সম্ভব নূরজাহানের বৈমাত্রের বোন।

৬৫. এক আশরফি নয় টাকা হিসাবে ধরলে তার পরিমাণ দাঁড়ায় গিয়ে এক কোটি আশি লক্ষ টাকা, পনেরো টাকা হিসাবে তিন কোটি টাকা।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

অমন অপরাধের কোনই মার্জনা নেই বিশেষ করে যখন তার নিজেরই পঞ্চাশ কি একশো হাতী ছিল। নিয়তির দুর্লঙ্ঘ্য নির্দেশেই বোধ হয় সুন্দর ও তরুণ প্রাণের আত্মাহুতি ঘটে। নিঃসন্দেহে এই ছেলেটিকে বলা যেতে পারে দ্বিতীয় ইউসুফ। মীর্জা রুস্তমের পুত্রের মৃত্যুতে আমি যারপর নাই শোক পেয়েছিলাম। কি গভীর শোক পেয়েছিলাম তার কিছুটা আভাস নীচের কটি লাইনে পাওয়া যেতে পারে।

'তোমার মুখের লালিমা হারিয়ে আমার কি আর্তি! তোমার মৃত্যু আমার বুকে বুঝি হাযার কাঁটা বিদ্ধ করেছে! তুমি যখন উপস্থিত ছিলে, হাসিঝলমল পৃথিবী মনে হত টিউলিপ ফুলের বাগান, কিন্তু তোমার মৃত্যু আমার হৃদয়ে বুঝি ঐ ফুলের রক্তরাঙ্গা আভা ছড়িয়ে দিয়েছে। চিরকালের মত আমার চোখের সামনে থেকে হারিয়ে গেছে তোমার গালের টোল ঐ চোখ, দুঃখ পানিতে টলটল করে উঠছে। তোমার সাহচর্যে যে সুখে আমি উজ্জ্বল হয়ে উঠতাম, তা এখন বদলে গেছে দুখে এবং নিদ্রাবিহীন যন্ত্রণায়। তোমাকে কেড়ে নিয়েছে আমার কাছ থেকে, কার কাছে আমি এখন মনের কথা বলব। হায়রে, আমার হৃদয়ে যে অশ্রু পুঞ্জীভূত তারই সঙ্গে এখন আমার কথা বলাবলি। নিয়তির নির্দেশেই মৃত্যু তোমাকে বিদ্ধ করেছে, কিন্তু সেই তীরে আমিও যে আহত। বাগানের কোন গোলাপ তোমার মত? হায়রে, মৃত্যুবাণ এসে সে ফুলের পাপড়ি ঝরিয়ে দিয়েছে–ইউসুফের পিতার চেয়েও আমি তোমাকে ভালবাসতাম; হায়রে, এই অল্প বয়সে তুমি মৃত্যুর করাল শিকারে পরিণত হলে। তোমার ভ্রুর যে সৌন্দর্য, সে গেছে হারিয়ে, হায়রে, তোমার নম্র ও বিনীত স্বভাব, তার দেখাও কোনদিন মিলবে না। বসন্ত এসেছে– বাগানের গোলাপের কুঁড়ি ফুটেছে কিন্তু আমার কাছে বসন্ত শুধু নিয়ে এসেছে দুঃখের তরু-শোকের তরু। আমার হৃদয়ে চিরকাল অমলিন থাকবে তোমার চিরসুন্দর স্বভাবঃ তোমার সৌন্দর্য চিরদিন জেগে থাকবে আমার চোখে। কুঁড়ি থেকে সবেমাত্র তোমার জীবন বিকশিত হতে শুরু করেছিল, হায়রে, কি অকালেই ঝরে গেল মৃত্যুর ঝাপটায়। দুঃখ হচ্ছে তোমার ভালবাসার কথা মনে করে, দুঃখ হচ্ছে তোমার যৌবনের জন্য, তোমার দীর্ঘতনু তোমার রক্তিম মুখাবয়বের জন্য! হায়রে, তোমার চোখের জ্বলজ্বলে চাউনি নিভে গেল মৃত্যুর হিম্‌স্পর্শে। তোমার রক্তিম গাল অনর্থক ঢেকে গেল মৃত্যুর চির অন্ধকারে!'

এই দুঃখজনক প্রসঙ্গের আর বিস্তৃতি না করে, আমি হাযার জন দক্ষ সাতারুকে পাঠিয়েছিলাম নদীতে, মীর্জার মৃতদেহ যদি পাওয়া যায় এই আশায়, কিন্তু সব প্রয়াসই ব্যর্থ হল। তার মৃতদেহের কী হল তার কোন খোঁজই পাওয়া যায়নি। এই সর্বনাশী নদী সম্পর্কে এই শেষ নয়। দেরীতে অস্থির হয়ে, ভাবনাচিন্তা না করেই অসংখ্য লোক ঝাঁপিয়ে পড়েছিল নদীতে এবং নদীর বুকে এইভাবে পঞ্চাশ হাযার লোক মৃত্যুকে আলিঙ্গন করেছিল। তাদের কারোর পানি কমে যাবার জন্য ধৈর্য ধরার মত সাধারণ বোধটুকু ছিল না। তাছাড়া, নদীর পাড়ে শীতও ছিল ভয়ানক। পরদিন সকালে শুনলাম, ঠাণ্ডায় শাহী আস্তাবলের প্রায় দশ হাযার হাতী, উট ও ঘোড়া প্রাণ হারিয়েছে। অবশ্য সেনাবাহিনীর কথা বাদ

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

দিয়েই। আল্লাহ মালিক, গরমকালে কখনও অমন মৃত্যু ঘটেনি। বয়োবৃদ্ধ ও অভিজ্ঞ লোকেরা বলে উঠল, কোন ঋতুতে এবারের মত অমন ভয়ানক ঠাণ্ডা পড়া তারা দেখেনি।

কাশ্মীরের পর্বতমালার পাদদেশে তুষারপাত হল সাত দিন সাত রাত একটানা। কোন জ্বালানি তাই সংগ্রহ করা গেল না। সেনাবাহিনীর সঙ্গে চলেছিল অসংখ্য ফকীর। কোন ত্বরিত ব্যবস্থা গ্রহণ না করলে তাদের মৃত্যু অনিবার্য, তাই আমি শাহী শিবিরের এক লক্ষ উট পাঠালাম যে ভাবেই হোক জ্বালানি সংগ্রহ করে নিয়ে আসার জন্য। জ্বালানি এলে সবার আগে ফকীরদের দেওয়ার কথা বললাম, নয়তো তাদের মৃত্যু অনিবার্য। তাছাড়া প্রত্যেক ফকীর যাতে একটি করে তুলার নিমা এবং ভেড়ার চামড়ার আবরণি পায় তারও নির্দেশ দিয়েছিলাম।

তুষারপাত বন্ধ হলে পর, যারা ইচ্ছুক সেই সব আমীর এবং বেসরকারী ব্যক্তিদের লাহোরে ফিরে যাওয়ার অনুমতি দিয়েছিলাম। শুধু শুধু লোকদের হয়রানি করা আমার স্বভাব বিরুদ্ধ। তারপর প্রয়োজনীয়। সাজসরঞ্জাম, জিনিসপত্র নিয়ে আমি যাত্রা করলাম কাশ্মীর অভিমুখে, সঙ্গে চলল আমার তিনশো পরিচারক এবং যারা সদাসর্বদা আমার কাছে থাকে। পার্বত্য এলাকা পেরোবার পরেই ঠাণ্ডা কমে এল। সেখানে সেই জাফরান ফোটা মাঠে পশু ও পাখি শিকার করে বেড়াতে লাগলাম, সুন্দর সেই উপত্যকার নানা জায়গা ঘুরে ঘুরে দেখলাম। এইভাবে কেটে গেল এক মাস, তারপর রাজধানীতে ফিরে যাওয়ার পথে লাহোর সফর করার ইচ্ছা মনে জাগল। সাত বছর কেটে গেছে ঐ শহর ছেড়ে আসার পর। সে সময় নির্দেশ দিয়েছিলাম প্রধান মিনারগুলি ভেঙ্গে ফেলে লালপাথরে তৈরী করতে, তাতে নানা পশুর ছবি খোদাই করে দিতে। তাছাড়া আমি রাভী নদীর পাশে শহরের কাছেই চার দেয়াল ঘেরা বাগান তৈরীর নির্দেশ দিয়েছিলাম।

কাশ্মীর থেকে একদিনের দূরত্বে যখন চলে এসেছি, চর এসে খবর দিল কাবুলের বিদ্রোহপ্রবণ চক্রী বাশিন্দারা ফের গণ্ডগোল শুরু করে দিয়েছে এবং অন্যান্য প্রজাবৃন্দের উপর শুরু করেছে সমূহ নির্যাতন। সেসব শুনে মহব্বত খানকে কাবুলের অভিমুখে তক্ষুণি রওয়ানা হতে নির্দেশ দিলাম। মুহব্বত খান আমার দরবারের পাঁচহাযারী মনসবদার। তার সঙ্গে গেল বিশ হাযার বিভিন্ন ধরনের অশ্বারোহী, দশ হাযার উষ্ট্রবাহিত বারুদী এবং দুহাযার ভীষণ প্রকৃতির হাতী। এই বিদ্রোহের মূল হচ্ছে আল্লাদাদ খান। তার সম্পর্কে আগেই বলা হয়েছে। আফগান গোত্রের মধ্যে সে প্রথম শ্রেণীর ব্যক্তি। কোন কারণ ছাড়াই সে আমার দরবার ছেড়ে চলে গেছে। এখন কাবুলের কাছে এসে আত্মপ্রকাশ করেছে। তার দরুন মহব্বত খানকে আমি নির্দেশ দিয়েছিলাম যদি জ্যান্ত আল্লাদাদ খানকে সে বন্দী করতে পারে, তাহলে তাকে যেন আমার দরবারে পাঠিয়ে দেয়, যাতে করে অকৃতজ্ঞতার শাস্তি আমার সামনেই ভোগ করতে পারে। যেমন তেমন ছলছুতা করে আমার সামনে থেকে যারা দূরে সরে যেতে চায়, তাদের উদ্দেশে এই উদাহরণমূলক শাস্তি, যা থেকে কেউ রেহাই পাবে না।

আকস্মিকভাবে এখানেই সম্রাট জাহাঙ্গীরের আত্মজীবনীর সমাপ্তি ঘটেছে।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~